তমোলুক পত্রিকা

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

] বৈশাখ ১২৮২। [প্রথম সংখ্যা।

তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।*

ইহা একখানি ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থে তমোলুকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহার স্থূল মর্ম্ম এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ পুস্তকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

গ্রন্থকার তমোলুকের প্রাচীনত্ব-প্রদর্শনে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সকল প্রকটিত করিয়াছেন।

১ম;—মহাভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসংরক্ষণে নিযুক্ত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই দেশে আগমন এবং এ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি তাম্রধ্বজের সহিত সংগ্রাম। কিম্বদন্তী যে, রণশ্রমে পরিক্লান্ত অর্জ্জুনের কপোল-বিনির্গত ঘর্ম্ম বিন্দু ভূতলে পতিত হইয়া নদরূপে পরিণত হইয়াছিল; তজ্জন্য সেই নদের নাম কপালমোচন হইয়াছিল, যাহা এক্ষণে রূপনারায়ণ নামে বিখ্যাত। তাম্রধ্বজের ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাত্মা অর্জ্জুন সেই নরবরস্থাপিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাহা এক্ষণে জিষ্ণুহরি নামে পরিচিত।

তাম্রধ্বজের সহিত যুদ্ধ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী

* শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ অধিকারী প্রণীত। কলিকাতা ভারতযন্ত্র।

রত্নাবতীপুরে ঘটিয়াছিল; মহাভারতে এরূপ দেখা যায়। গ্রন্থকর্ত্তা তমোলুকের প্রাচীন নাম রত্নাবতীপুর এবং তন্নিম্নবাহী নদের নাম নর্ম্মদা, এরূপ অনুমান করিয়া একরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না।

২য়;—পাণ্ডব-দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সহদেবের বঙ্গদেশের কতিপয় রাজার সহিত যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তাহাদের মধ্যে একের নাম 'তাম্রলিপ্ত' উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার তমোলুকের প্রাচীন নাম 'তাম্রলিপ্তী' দেখিয়া অনুমান করেন যে, উক্ত তাম্রলিপ্ত নরপতির নামানুসারে নগরের নাম তাম্রলিপ্তী ও তাহার অপভ্রংশে তমোলুক হইয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রকাশিত ভারতের মানচিত্রে এ দেশের নাম 'তাম্রলিপ্তী' বলিয়া অঙ্কিত আছে।

৩য়;—এদেশের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণগণের বাটীতে একখানি "তমোলুকমাহাত্ম্য" নামে সংস্কৃত ছন্দে নিবদ্ধ পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব ক্রোধ-পরবশ হইয়া যজ্ঞ বিনষ্ট ও দক্ষের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবধজনিত মহাপাপ বশতঃ সেই ছিন্ন-মস্তক হস্তভ্রষ্ট না হওয়ায় অনেক তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে ভগবান্ নারায়ণের আদেশ অনুসারে এখানে আগমন করিয়া পাপনাশক সরোবরে স্নান ও হরি এবং বর্গভীমা দেবী সন্দর্শন করিলে নৃমুণ্ড হস্তস্খলিত হইয়াছিল। এতদ্বর্ণিত ঘটনা সত্য হইলে এদেশটী মহাভারতেরও অতি প্রাচীনতম কালের বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত কিম্বদন্তী বা শাস্ত্রানুসারে বহুকাল হইতে পৌষ ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এবং অন্যান্য পুণ্যদাতিথিযোগে এখানে বহুসংখ্য যাত্রী আসিয়া রূপনারায়ণ নদে স্নান ও দেবদর্শনাদি করিয়া থাকে।

৪র্থ;—রেণল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তমোলুক বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান ছিল। চীনদেশীয় ভ্রমণকারিগণ এখানে সর্ব্ব [illegible] গমনাগমন করিতেন। তাঁহারা [illegible] গিয়াছেন যে, তমোলুক [illegible] বাণিজ্যস্থল ও সমুদ্রের উপকূলে [illegible] ছিল। শব্দকল্পদ্রুমেও 'বেলাকূলং তাম্রলিপ্তী—তমালিকা' এই প্রমাণ দ্বারা তমোলুকের সমুদ্রকূলবর্ত্তিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ২১৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে অশোক-নৃপতিপ্রেরিত দূত সিংহল যাত্রা কালে তমোলুকেই সমুদ্রযানে আরোহণ করেন। ইহা যে সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রাচীন নগর ছিল, তাহার এবং ইহার বাণিজ্য বিস্তারের অনেক গুলি প্রমাণ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।

এখানে জিষ্ণুহরি ও বর্গভীমা দেবী প্রধান। জিষ্ণুহরির মন্দিরটী তত প্রাচীনকালের বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরটী অতি প্রাচীন ও সুনির্ম্মিত। ইহা এক খণ্ড সমুন্নত ভূখণ্ডের উপর সংস্থিত। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী বৌদ্ধদিগের উপাসনামন্দিরের সদৃশ বোধ হয়।

এখানকার প্রাচীন মনুষ্যমাত্রেই বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালে এই নগরে সাতশত ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। তাহারা সকলেই বিশুদ্ধ সলিলের জন্য কূপখনন করিয়া রাখিতেন। এখনও নদীর ভাঙ্গনে এবং পুষ্করিণ্যাদি-খননকালে অনেক কূপ ও অট্টালিকাবশিষ্টভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তকে তাঁহারা নিজবাক্যের প্রমাণ-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'খাট পুকুর' নামে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী এই নগরের উত্তরাংশে রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর মধ্যে একটী মন্দির আছে। মন্দিরের চূড়াস্থিত কয়েকখানি প্রস্তর মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই, নরপতি তাম্রধ্বজ এই সরোবরটী খনন ও তন্মধ্যে সপ্রাচীর ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বারিরাশি সমুদ্গত হইয়া তাহাদিগকে নিমজ্জন করিয়া ফেলে।

তমোলুক কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ৩৬ মাইল এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রায় ৪০ মাইল। রূপনারায়ণনদ ইহার পূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আর্য্যকালের বিপর্য্যস্তের সহিত তমোলুকের অবস্থা অতি হীন হইয়া পড়ে। ইহার বাণিজ্য, শোভা, ঐশ্বর্য্যশালিতাদি সকলই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারসদৃশ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর এদেশে কতিপয় মুসলমান রাজার অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। তদনন্তর পুনরায় হিন্দুরাজ্যের আবির্ভাব হয়। সেই বংশের শেষ রাজা ৶ নারায়ণ রায়ের অপরিণাম-দর্শিতার জন্য রাজ্যলক্ষ্মী তাহার হস্তভ্রষ্টা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিতা হইয়াছেন।

বৃটিষাধিকারের প্রথম হইতে এতদ্দেশে যে লবণ উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহার প্রধান স্থান (Head Quarters) তমোলুক হওয়ায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তমোলুকের সৌভাগ্য সঞ্চার হইতে থাকে। লবণ আফিসের এজেন্ট মহাত্মা হেন্‌রী, চার্লশ, হ্যামিল্টন সাহেব মহোদয় ১৮৫২ খৃঃ অব্দের মে মাসে এখানে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং সেই অবধি এদেশে বিদ্যাচর্চ্চার আরম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়টী ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ভয়ানক জলপ্লাবন ও ঝটিকায় বিনষ্ট প্রায় হইয়াছিল; সহৃদয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষের অসীম যত্নে তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে এস্থলে বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকাবিদ্যালয় এই দুইটীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। শেষোক্তটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহোদয়ের স্থাপিত। গ্রন্থে একটী নৈশ বিদ্যালয়ের বিষয় উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে।

ধান্য ও রেশম এদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। বর্ত্তমানে ইহার বহির্বাণিজ্য ততদূর বিস্তৃত নহে।

এদেশে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ও কৈবর্ত্ত-(কৃষিকার) দিগের বাসই অধিক। সামবেদীয়-দিগের মধ্যে মধ্যশ্রেণীনামক ব্রাহ্মণও অনেক।

গুলিন আছেন। ইহাদের উৎপত্তিবিষয়ে গ্রন্থে যেরূপে বর্ণিত আছে, বিগত কোন সংখ্যক "বান্ধবের" বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ। আশা করি, শীঘ্রই একরূপ মীমাংসা দেখিতে পাইব। গ্রন্থকর্ত্তা কৈবর্ত্তজাতির উদ্ভব কোথা হইতে, এবং ইহাঁরা হিন্দু-জাতির অন্তর্গত কি না, এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। আশা করি সময়ে এ বিষয়েরও মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গৌরাঙ্গপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই এদেশের অধিকাংশ লোকের নিকট সমাদরণীয়। বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি তাহাদিগের নিকট অননুষ্ঠেয়।

পূর্ব্বে এদেশে 'রাজা' ইত্যভিধেয় অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার ছিলেন। বুদ্ধির গুণে তাঁহাদের অনেকেই ধ্বংস হইয়াছেন। এক্ষণে এই উপবিভাগান্তর্গত মহিষাদলাধিপতি রাজশ্রীলক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ মহাশয়ই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

এই জেলায় পূর্ব্বে "চণ্ডীমঙ্গল" ও শিব-সংকীর্ত্তন নামে দুই খানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে সাবিত্রীচরিত কাব্য, কাব্যকদম্ব ও বিজ্ঞান-শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধনামক তিন খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পিঙ্গলা-নিবাসী বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ে কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থের সার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে উহার দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পুস্তকখানি আর একটু বর্দ্ধিতকায় হইলে ভাল হইত। যাহারা তমোলুকের প্রাচীন বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকর্ত্তা ইতিবৃত্তমূলক বিবরণ সংগ্রহে বিশেষ যত্নবান না হইয়া গ্রন্থখানি শেষ করিয়াছেন। যত্ন করিলে (Asiatic Researches, Hunter's Orissa, Fa Hian's Travel in India ও East India Gazetteer) প্রভৃতি হইতে ময়ূরবংশের প্রথম রাজা ময়ূরধ্বজ ও শিখিধ্বজ প্রভৃতির ক্রমান্বয়ে ৩২ পুরুষ এবং তৎপরে উড়িষ্যাদেশ হইতে আগত মৎস্য-রাজবংশের প্রথম রাজা কালুভূঞা প্রভৃতির ২৫ পুরুষের বিবরণ, ১০০১ খৃঃ অব্দে তমো-লুকের নরপতি কর্ত্তৃক চীনদেশে দূত প্রেরণ ও তমোলুক বিষুব-রেখাদি হইতে কতদূরে অবস্থিত ইত্যাদি এইরূপ নানাপ্রকার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

যাহা হোক উল্লিখিত দোষসত্ত্বেও গ্রন্থ-খানি আদরের সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুসংখ্য অসার অনুবাদাপেক্ষা স্বশ্রমসংগৃহীত পুস্তক অধিক সমাদরণীয়। অতএব শ্রম ও অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ এই ক্ষুদ্র ইতিহাস গ্রন্থখানিকে বঙ্গভাষা প্রফুল্ল-মনে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন। যে সকল লোক স্ব স্ব দেশের ইতিবৃত্ত লিখিতে যত্ন করেন; তাঁহারা যে কেবল সাহিত্যের উন্নতিকাম, এরূপ নয়; তাহারা আপনাপন জন্মভূমীরও গৌরবাস্পদ। অতএব এই পুস্তকের প্রণেতা উমাচরণ বাবুকে

ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পুস্তকখানি সন্নামবিশিষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় মহাশয়কে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি অনেক দিন তমোলুকে অবস্থান করিয়া এই দেশের হিতচেষ্টায় সংরত ছিলেন। অতএব উপযুক্ত পাত্রেই ভক্তির উপহার অর্পিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা।

মহাত্মা মনু আর্য্যাবর্ত্তের যেরূপ সীমা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে দেখিতে গেলে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদদ্বয়ই যে তাহার পূর্ব্বাপর সীমা, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার মতে উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পূর্ব্বে পূর্ব্বসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র, এই সীমার অন্তর্গত পৃথ্বীখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে বিখ্যাত ছিল। (*) এই বাক্যের অর্থ ধরিয়া মীমাংসা করিতে হইলে, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসার এই দুই সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহই আর্য্যাবর্ত্ত নামে উল্লেখ হইত, এরূপ বোধ হয়। ঐ সমস্ত ভূভাগের অধিবাসীদিগকেই আর্য্যজাতি বলিত; এবং উক্ত মহাত্মারাই আমাদিগের ও অন্যান্য সুসভ্য জাতির আদিপুরুষ ছিলেন। যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই জাতীয় মনুষ্যেরা জীবনক্ষেপ করিতেন, সেই ধর্ম্মই আর্য্য-ধর্ম্ম নামে সুপরিচিত ছিল; এবং তাহাই-কালস্রোতে বাহিত ও রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতা বা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ আছে।

যে সুদূর-স্মরণ-বর্জ্জিকালে আর্য্যজাতি হিমাদ্রির অপরপার্শ্বস্থ কোন কোন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন; এবং বংশ ও পরিবার বৃদ্ধির সহিত নানা দিগ্‌দেশে বিস্তৃত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদেরই শাখাবিশেষ ভারতবর্ষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপনাদিগের জয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও ভাষা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীনতমকালে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি জীবনাতিবাহিত করিতেন সেই ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম। তাহার স্বরূপ ও যথার্থ প্রণালী কিরূপ ছিল, পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ তাহার সাক্ষী। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যজাতি প্রথমে অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান ভৌতিক ও জড়পদার্থের উপাসক ছিলেন। যে সমস্ত প্রাকৃতিক বা ভৌতিকপদার্থে মনকে বিস্ময়বিহ্বল করিত, তাঁহারা তাহাদিগকেই দেবতা বোধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

---

* আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥ ২অঃ।

ইহা তাঁহাদের সমাজের উপযুক্তই ছিল সন্দেহ নাই। অনন্তর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী আহরণের কষ্টসাধ্যতা অপগত হইলে, আর্য্য পণ্ডিতকুল কাব্য, সাহিত্য চিন্তনে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এবং তাঁহাদের সুপ্রশস্ত মনোবিহারিণী কল্পনাদেবীর অঞ্চল ধারণ করিয়া সুকুমার বিজ্ঞান দেবক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জড়পদার্থের প্রকৃতি আর্য্যাদিগের হৃদয়ায়ত্ত হইল। এবং তাহাদের দেবতা বোধ পরিত্যাগ করিয়া অধিষ্ঠিত দেবতার কল্পনারম্ভ হইতে লাগিল। আর্য্যবংশ এই সময়ে ধর্ম্মতত্বের একটী উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইল। আর্য্যপণ্ডিতগণ নিরন্তর চিন্তামগ্ন থাকিয়া ঈশ্বরের সত্তা ও প্রকৃতির বিষয় হৃদ্গত করিতে পারিলেন। ঈশ্বর একমাত্র স্রষ্টা, তদতিরিক্ত সমস্তই সৃষ্ট; তিনিই সকলের নিয়ন্তা ও সমস্তই তাঁহার নিয়ম্মিত, এই সমস্ত ভাব তাঁহাদের চিত্রপটে স্পষ্ট অঙ্কিত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা ইহাও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র তাঁহারই উপাসনাতে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধিত হয়। ইহার প্রচুর প্রমাণ উপনিষদাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে ধর্ম্মের এক অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়। ব্রহ্মতত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব এই সময়ে পণ্ডিত-সমাজের হৃদয় অধিকার করে। অতএব এই ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলে, দোষস্পর্শে না। আর্য্যসমাজে ধর্ম্মস্রোত এইরূপে প্রবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাহার অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। যে সময় ইহা ঘটিয়াছিল, তাহাকে ব্রাহ্মণকাল শব্দে পণ্ডিতেরা অভিহিত করেন।

একেশ্বরত্ব-চিন্তন অতি দুরূহ ব্যাপার। যাহাকে কখনও কোন চক্ষুঃ দর্শন করে নাই, যাহার বিষয় কোনকালে কোন শ্রবণে প্রতিঘাত হয় নাই, যিনি বাক্য, মন ও জ্ঞানের অতীত পদার্থ, এরূপ চৈতন্যের ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করা এবং তাঁহাকে প্রীতিবিকসিতচিত্তে ভক্তি করা যখন মুমুক্ষু যোগিগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে, সেই অনাদি পুরুষে জনসাধারণের বিশ্বাস এবং ভক্তি কিরূপে প্রধাবিত হইবে এই চিন্তায় আর্য্যপণ্ডিত ব্যূহ অনুদিন কাতর হইতে লাগিলেন। যাহাতে জনসাধারণের চিত্তপটে ঈশ্বরভাব সহজে প্রতিফলিত হইতে পারে, যাহাতে তাহাদের বিশ্বাস, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহজে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, মুকুলিত ও সুফলিত হইতে পারে, যাহাতে বিজ্ঞান-সম্মার্জ্জিত বুদ্ধিরও দুষ্প্রাপণীয় ধর্ম্মভাব সহজবুদ্ধি সাধারণ মানবমণ্ডলীর অনায়াসলভ্য হইতে পারে, তজ্জন্য আর্য্যকবিগণকে ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রতিপাদনে সযত্ন হইতে হইল। তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার কল্পনাদ্বারা নানাবিধ দেব ও দেবীর প্রতিমূর্ত্তির আবিষ্কার করিতে লাগিলেন এবং সহজবুদ্ধি মানবকুল সেই সমস্ত দেব ও দেবীর উপাসনায়

পরম সুখে কালযাপন করিতে থাকিলেন।

এই সময়ে যে সকল দেব ও দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা অনেক। প্রথমতঃ তাহাদের সংখ্যা অল্পই ছিল। এমন কি ঋগ্বেদাদিতে তেরটী দেবতার নামমাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* কিন্তু এক্ষণে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তেত্রিশকোটিতে থামিয়াছে। যাহা হউক, সেই সেই দেবমূর্ত্তি প্রকল্পনে আর্য্যকবিদিগের যে কতদূর পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। আমাদের বঙ্গদেশে প্রতিবর্ষে শরৎকালে যে মহাদেবীর পূজোপলক্ষে ঘরে ঘরে মহোৎসবের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বঙ্গবাসিগণের পরিক্লান্তচিত্তকে উৎপ্লাবিত করিয়া থাকে, সেই দুর্গাদেবীর আকার ও গুণাদি কল্পনায় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ব্বাচার্য্যগণের যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ভাবুকতা প্রকাশ পাইতেছে, এস্থলে কেবল তাহারই উল্লেখ করিব মানস করিয়াছি। বিষয়কোলাহলাকৃষ্টচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানানুশীলাসক্ত জন সাধারণের ধর্ম্মজ্ঞান উন্নত ও পাপপ্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা কেমন অনন্য সাধারণ কৌশলের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে কিরূপ প্রশংসনীয়রূপে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন, পাঠকবৃন্দ একবার মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ দেখুন, ঈশ্বরের কোন আকার কল্পনা করিতে গেলে, তাঁহাতে যে সমস্ত গুণ আছে সেই সাকার দেবেতে সেই সমস্ত গুণ অর্পণ করা চাই। তজ্জন্য ভগবতীর নিম্নলিখিত মতে রূপ কল্পনাদি হইয়াছে।— ঈশ্বরের দৃষ্টি কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল তিন লোকেই নিপতিত আছে; সুতরাং দেবীর তিনটী চক্ষুঃ। ঈশ্বরের হস্ত দশদিকেই প্রসারিত; তিনি দশদিকেই প্রাণিজগতের অন্ন বিতরণ করিয়া থাকেন; এই জন্য দেবীর দশটী বাহু। পরমেশ্বর দুরাচার দস্যু, তস্করাদির নানা উপায়ে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; তজ্জন্য অসুর-বিনাশের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি ও সিংহের কল্পনা। ধার্ম্মিক-জন-পুরস্কারক ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ সাধুলোকের অভয়প্রদ; এই হেতুতে দেবীও অভয়হস্তা। যথায় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, বিদ্যা ও অর্থের তথায় নিত্য সদ্ভাব; সুতরাং তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কল্পনা। রূপ এবং ধার্ম্মিকতা ধন ও বিদ্যার অনুগামী; এই জন্য কার্ত্তিক ও গণেশের ভাবনা। পাছে লোকে অজ্ঞতা নিবন্ধন রূপমদে মত্ত হইয়া অসৎপথানুবর্ত্তী হয় তজ্জন্য কার্ত্তিকের শিখী বাহন হইয়াছে। অর্থাৎ তদ্দ্বারা ইহাই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, মানব! সাবধান! রূপ চির দিনের জন্য নহে। পক্ষিজাতি যেমন এই আছে, এই নাই; যত যত্ন কর, পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া

* "বিশ্বেদেবাস্ত্রয়োদশাঃ।"

প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, এক দিন না এক দিন পলাইবেই; রূপ ও যৌবন অবিকল সেই রূপ। যোগিবর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ গজাননের বাহন কল্পনা-সম্বন্ধেও সেই রূপ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ধান্য আমাদের অতি যত্নের সামগ্রী। তাহার সংরক্ষণে যত্নের সামান্য মাত্র ত্রুটি হইলে তাহার পরম শত্রু মূষিকে তাবৎই প্রনষ্ট করিয়া ফেলে। বাহ্য জগৎ-সম্বন্ধে ধান্য আমাদের যে রূপ যত্নের বস্তু, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মও তদপেক্ষা কম নহে। বহু কষ্টে ও প্রাণপণে তাহা উপার্জ্জন ও সংরক্ষণ করিতে হয়। কিছু মাত্র শিথিলতা বা উপেক্ষা প্রদর্শিত হইলে রিপুগ্রামরূপ দুরন্ত মূষিক-দল তাহার সমুদয় প্রনষ্ট ও বিদূষিত করিয়া ফেলে। এই সুমিষ্ট উপদেশ প্রদান জন্য গজাননের বাহন মূষিকের কল্পনা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, আমাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষিগণ পরমেশ্বরের আকার চিন্তা করিয়া বহুতর অজ্ঞ বৈষয়িক লোকের ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণ পক্ষে বিশেষ বিজ্ঞতার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের সভ্যতম প্রদেশেও অসংখ্য ইতরশ্রেণীর অজ্ঞলোক যে রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত, আমাদের পুণ্যধাম ভারতবর্ষে যে সেই রূপ লোক তাহাপেক্ষাও সমধিক উন্নত, উক্ত মহাত্মা-গণের বিজ্ঞতাই কি তাহার মূল কারণ নহে? এবং এই রূপ দোষস্পর্শ-বিহীন পৌত্তলি-কতার অনুশীলন হইতে লোকের ধর্ম্মো-ন্নতির সম্ভাবনা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সুখ লাভের আশা কি নিতান্তই অলীক? বরঞ্চ ইহাও দেখা যাইতেছে যে, অনভিজ্ঞ-লোকের ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ দুষ্কর হইলেও এই রূপ সাকার ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে জ্ঞান ও মন এত সমুন্নত ভাব ধারণ করে যে তখন যোগিগণারাধ্য পরমাত্মজ্ঞানলাভ এক রূপ সম্ভবনীয় হইতে পারে। গীতা-দিতে এরূপ লিখিত আছে যে, নিরাকার, নিষ্কল সূক্ষ্ম রূপ প্রথমতঃ চিন্তন অতি দুরূহ কার্য্য; সুতরাং পণ্ডিতগণ অগ্রে পরমে-শ্বরের স্থূল রূপের ভাবনা করেন। তদ্দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান সুনির্ম্মলতা ও উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমে ঈশ্বরচিন্তনে সক্ষম হয়।

এ স্থলে অনেকে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, অবস্তুতে বস্তুর আরোপ অতিশয় অযৌক্তিক; অতএব ধার্ম্মিক লোকে কি রূপে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, যাঁহার তাদৃশ বস্তু ও অবস্তুজ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তিনি নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহার যদি পৌত্তলিকতায় বীতরাগ উপস্থিত হয়, তাহা দূষণীয় নহে। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তিনি তদপেক্ষা অল্পজ্ঞানী মনুষ্যের আচরিত ধর্ম্ম-প্রণালীকে বিদুষ্ট ও নিষ্ফল বলিবেন, তাহার কোন যুক্তিগর্ভ কারণ দেখিতে পাই না। তিনি কি ইহা আশা

করেন যে, সামান্যসংখ্যক তত্ত্বজ্ঞানীর আচরিত ধর্ম্মপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া অসংখ্য অজ্ঞ, বিষয়-কোলাহলাকৃষ্ট লোকে সুখী হইবেন? ঐরূপ আচরণে তাহাদের মন উন্নত হইবে; না ক্রমশঃ সারত্ব-বোধে অক্ষমতা-নিবন্ধন একটী ভণ্ড কপটাচারী জাতির সৃষ্টি হইবে? আমার সামান্য বোধে এরূপ একটী কপট ধর্ম্মাচারী মানব-সমাজ অপেক্ষা শ্রদ্ধাবান্, বিশ্বাসানুসারী ধর্ম্মাচরণে অনুরক্ত সমাজ সহস্র গুণে মঙ্গলকর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি বল, এরূপ মিথ্যাসংস্কারানুবর্ত্তী ধর্ম্মে মোক্ষের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহা মানব-সমাজের অননুষ্ঠেয়। তাহারও খণ্ডন অনায়াসে হইতে পারে।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তি। কেহ তাহার অর্থে—সাযুজ্যাদি, কেহ মায়াবন্ধনচ্ছেদ ও কেহ বা পাপস্পর্শ-বিহীনতা—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সমস্তই অনুমান-সিদ্ধ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্ভাবনাশূন্য। সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য লোকে ইহার তত্ত্বনিরূপণে প্রাণ বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, তথাচ তাহার নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। অতএব আমি স্বীকার করি না যে, মুক্তিই কেবলমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও তাহার আশা মানবজীবনের পরমসুখসম্পাদ্য; এবং সেই আশা না থাকিলে মানবজীবন অসারবৎ ও অসুখের বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাচ কেবলমাত্র তাহার উদ্দেশেই যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, এ কথায় স্বীকার করিতে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হই। আমার মতে, যাহাতে মনুষ্য-হৃদয় পাপাচরণে অননুরক্ত থাকে, যাহাতে মনোবৃত্তিসমূহ ক্রমোন্নত হইতে পারে, যাহাতে চিত্তের আত্মপ্রসাদ অর্জ্জিত হয় এবং যাহার অনুষ্ঠানে লোক-সমাজের শুভ ও উন্নতি সাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্য-সাধন পক্ষেই ধর্ম্ম অবশ্য অবলম্ব্য ও আচরিতব্য। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত ঈশ্বরারাধনার ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ঈশ্বরারাধনা—ঊনবিংশশতাব্দীর প্রচলিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুসারেই হউক—অথবা বহুকাল-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মানুসারেই হউক, করিলে বাধা নাই। ধর্ম্ম শব্দটী যত মধুর, ইহার স্বরূপনির্ণয় ততই কঠিন। এই সুবিশাল পৃথ্বীতলে, অসংখ্য সুসভ্য জনপদে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক মতামত লক্ষিত হয়। অতএব তাহার কোন্‌টী সত্য ও কোন্‌টী মিথ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। অতএব আমাদের প্রিয় ভারতবাসী আর্য্যবংশাবতংশ জনগণের পুরুষ-পরম্পরাচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী যে বিশেষ মঙ্গলজনক, তাহাতে কোন সংশয় দেখিতে পাই না। বরঞ্চ সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক যুবককে পরিণামে সন্তপ্ত ও মন-ক্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে।

অধিকন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের আর্য্য ধর্ম্মের সারাংশ। সেই আর্য্যধর্ম্মানুসারে

ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অবমাননা হইল, আমাদের আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা এরূপ মনে করেন না। তথাচ ইদানীন্তন কালের ব্রাহ্মেরা যে কিজন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রতি এতদূর বীতশ্রদ্ধ ও নিন্দুক, তাহার কারণ নিরূপণ করা সুকঠিন। বিশেষতঃ তাঁহারা উপাসনাকালে পরমেশ্বরের "হস্ত, পদ, মনাদির" কল্পনা করিয়া বাক্যে উচ্চারণ করেন; আমাদের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল বাক্যে নয়, সেই সেই বাক্য (স্তব) অনুসারী রূপ বিনির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মেরা 'ভক্তি-পুষ্প' 'শ্রদ্ধা-দীপ' ও 'ইন্দ্রিয়-বলি' ইত্যাদির মনে মনে কল্পনা করেন; হিন্দুরা উদ্যানস্থ পুষ্প, সুগন্ধঘৃতযুক্ত দীপ এবং নানাবিধ বলির দ্বারা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। এমতে এই উভয় সম্প্রদায়ের যে কিরূপ ইতর বিশেষ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র দেখা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনেক লোক সুস্থ শরীরে অবস্থান করেন; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ব্রাহ্মেরা তাহাতে বঞ্চিত থাকিয়া নানাবিধ ক্লেশ ও যাতনা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এস্থলে প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মদিগের কথা বর্জ্জিত মনে করিতে হইবে। সেরূপ ব্রাহ্ম আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মেরও আদরের বস্তু, সন্দেহ নাই।

কার্য্য।

কারলাইল বলেন, "কার্য্যই জগদীশ্বরের পূজা"। "Work is Worship." বাস্তবিক এই মহার্ঘ বাক্যের সদৃশ উপদেশবাক্য জগতে কোন মহাজন কখন উচ্চারণ করেন নাই। পূজার ফল আন্তরিক তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উপাস্য দেবতার প্রীতি তৎসমুদায়ই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন দরিদ্র ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তির যন্ত্রণা-শান্তির উপায় করুন এখনই জানিতে পারিবেন, উহাতে কত আমোদ ও কত বিশুদ্ধ সুখ। ঐ সুখ বিশুদ্ধতা-অংশে প্রকৃত বিজ্ঞানানন্দ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন বিষয়ে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। মহামনা পণ্ডিতগণ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত সুখকে জীবনের মুখ্য সুখ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যিনি জীবনের মধ্যে জন-সমাজের হিতকর কোন স্থায়ী কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারেন, তিনি, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রীতিসংকল্পে উচ্চ-মন্দির-নির্ম্মাণ ও চিরস্থায়ী পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। মহাত্মা ওয়াট্স্ বাষ্পযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া জন-সমাজের উপকার

সাধন করিয়াছেন। উহাতে দৈনন্দিন বাণিজ্যকার্য্যের উন্নতি হইতেছে। ভীষণ-তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রতরণ অনায়াসে সম্পাদিত হইতেছে। এবং পরস্পর বহুদূরব্যবহিত জনগণ ও জনপদসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন সংমিলন সাধিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের অধিকতর প্রীতিকর কার্য্য কি হইতে পারে? তিনি যে উৎকলাধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অথবা সলোমন অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান্, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। সলোমনের মন্দির অতীত কালের উদর-কন্দরে নিহিত, ঐতিহাসিক অদ্ভুত পদার্থের মধ্যে পরিগণিত ও বিস্মৃত প্রায় হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তিও পৃথিবীর প্রাপ্তবর্ত্তী কয়েক ব্যক্তির ধর্ম্মলালসা চরিতার্থ করিতেছে। উহার ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল উপকারিতা বা ব্যবহারোপযোগিতা নাই। পক্ষান্তরে ওয়াট্সের উদ্ভাবিত বাষ্পযন্ত্র নানা রূপ ও নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সভ্য জগতের অসীম উপকার করিতেছে ও ভূমণ্ডলে সভ্যতার নূতন সোপান সংঘটন ও ভূলোকের অপরিজ্ঞাত কোণে সভ্যতার নূতন জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিতেছে। মানবজাতির বয়োবৃদ্ধি-সহকারে উহার উপযোগিতার বৃদ্ধি হইবে এবং জ্ঞানের উন্নতি-সহকারে উহার উপকারিতার উন্নতি হইবেক।

পূজাতে চিত্তের সুখ ও আত্মার প্রসাদ হয়। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেও তাহাই হইয়া থাকে।

কার্য্যেই সুখ, কার্য্যের উপরমেই অসুখের প্রারম্ভ। একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিৎ কহিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানের অনুসরণেই সুখ, অধিকারে তাদৃশ সুখ নাই। যদি কেহ আমাকে বলে তুমি জ্ঞানের অনুসন্ধান চাহ, কি অধিকার চাহ? আমি নিঃসংশয়ে বলি যে, আমি অনুসন্ধান চাহি। ফলতঃ এইরূপে তিনি জ্ঞানের অনুসন্ধানে ও বিজ্ঞানের অনুসরণে কার্য্যে সুখ, কার্য্যের অভাবে দুঃখ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। যিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী তত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দর্শনে সমালোচনা করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে
ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে
ভিক্ষাটনঙ্কারিতঃ
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে
তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥

এই শ্লোকটীর অভ্যন্তরে কি সুন্দর ও নির্ম্মল তাৎপর্য্যস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণ কর্ম্মের উপকারিতা ও উপযোগিতা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এবং প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া রূপকস্থলে ঐ তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই কার্য্য-প্রিয়তা ও আলস্যের অবজ্ঞা প্রাচীন আর্য্যগণের প্রকৃতির প্রধান পরিচায়ক ছিল, এবং এই

গুণই তাঁহাদের তৎকালীন মহতী উন্নতির ও অলোকসাধারণ কৃতকার্য্যতার নিদান। ফলতঃ যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অসভ্য ম্লেচ্ছগণকে দূরীকৃত করিয়া তরবারি দ্বারা কাঞ্চনগঙ্গার পাদদেশ হইতে বনরাজি-বিরাজিত বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমী করতলস্থ করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুনদ ও গঙ্গাতীরে আর্য্যধর্ম্ম ও বৈদিক অনুষ্ঠানের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন বিষয়ে অলস বা উদাসীন ছিলেন না। পাঠক মহাশয়! একবার মনে মনে কল্পনা করিয়া দেখুন, মধ্য আসিয়ার প্রান্তর হইতে দীর্ঘকায় দীর্ঘবাহু আর্য্যবৃদ্ধেরা হিন্দু-কুলের অসহনীয় ঝঞ্ঝাবাত ও সিন্ধুনদের ভীমনাদিপ্রবাহ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া সম্মুখপতিত ম্লেচ্ছগণকে প্রতাপা-নলে দগ্ধ করিয়া অনিবার্য্য বেগে বাড়বা-নলের ন্যায়, সাগরতরঙ্গের ন্যায়, সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপ্ত করিতেছেন। এখনই বুঝিতে পারিবেন কারলাইলের উপদেশ-বাক্যের কি মর্ম্ম। পৃথিবীতে যে জাতি অথবা যে মনুষ্য যখন মহত্ত্ব লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহারা তখন ঐ বাক্যের অনুসরণ করিয়াছেন।

জোয়ার-ভাটা।

ঐ যে নদীটী দেখা যাইতেছে; এক্ষণে ঐ নদীতে জোয়ার আসিয়াছে;—পূর্ণিমার জোয়ার— বড় বেগবান্। দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে নদীটী সলিলপূর্ণা হইয়া উঠিল—জলে থই থই করিতে লাগিল— কলঙ্ক স্বরূপ উন্নত চড়াগুলি ঢাকিয়া গেল—আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল জল। নদীবক্ষে লহরীলীলা দেখা দিল—একটীর পর একটী সুদৃশ্য পর্য্যায় বদ্ধ হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিল। নৌকা সকল ভাসিয়া উঠিল—নাবিকেরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযোজিত,—কেহ ক্ষেপণীকর্ষণে, কেহ কর্ণধারণে, কেহ গুণবৃক্ষ উত্তোলনে—ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে সকলেই শশব্যস্ত। নৌকাগুলি গতিশালিনী,—আরোহিগণের লক্ষ্যানুসারিণী। ক্রমেই বায়ুর মৃদু ভাব পরিবর্ত্ত হইল—ইহাকে এক্ষণে ঝড় বলে। জোয়ারের বেগ বহুগুণিত হইয়া উঠিল—তরঙ্গকুলের মনোহর পর্য্যায় ভঙ্গ হইয়া তালপ্রমাণ উচ্চতা অধিকার করিল—জলোদ্বেগ আর কূলে সামঞ্জস্য হয় না,—উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল। নৌকা সকল বিপন্ন ও ভ্রান্তলক্ষ্য—নাবিকেরা ললাটনিহিত-হস্ত, নৌকা যায় যায়, আর থাকে না, দেখিতে দেখিতে কতকগুলি ডুবিয়া গেল, নাবিকেরা কেহ ভাসিয়া গেল, কেহ কষ্টে বাঁচিল। কোন

কোন সুনিপুণ নাবিকের নৌকা লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইল। জোয়ার বায়ুবেগে সবিক্রম হইয়া উপকূল সেতুতে আস্ফালন করিতে লাগিল, সেতু বুঝি আর টেকেনা— তীরস্থ মানবেরা বলিতে লাগিল, উঃ কি জোয়ারের তেজ!

ঐ যে যৌবন-মদ-গর্ব্বিতা যুবতীটী দেখিতেছ—যিনি আপনার ভ্রমরকৃষ্ণ-কবরীমণ্ডলে ফুলের বাগান সাজাইয়া অর্দ্ধ-বিকসিত গোলাপ ফুল ফুটাইয়াছেন,—যিনি আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনযুগলে সচটুল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন—যিনি সুগঠিত পদতলে হংসযুগল বন্ধন করিয়াছেন—যিনি আপনার গুরুভার নিতম্বফলকে সায়ন্তন সমুদিত চন্দ্রমালা ঝুলাইয়া দিয়াছেন—তাঁহারও শরীরে লাবণ্যের জোয়ার উদয় হইয়াছে—যৌবনের প্রভাতবায়ু মৃদু ভাবে প্রবাহিত হইয়া লাবণ্যলহরী উৎপাদন করিতেছে। ক্রমেই বায়ু বর্দ্ধমান—বীচিকুল পর্ব্বত-সমুন্নত—কে তাকাইয়া দেখে—কাহার সাধ্য—চোখে ধাঁধাঁ লাগে—চোখ খরিয়া যায়—মাথা ঘুরিয়া পড়ে। লহরীলীলা গৃহচত্বরে নিবদ্ধ রহিল—কিন্তু প্রতিঘাতকোলাহল দিগন্তব্যাপী—ইহাতেই কত জনের কত বিপদ—কত জনে জীবন হারাইলেন—কত জনে মান হারাইলেন—কত জনে কুল হারাইলেন—এই রূপে কতক দিন কাটিয়া গেল।

এক্ষণে নদীতে ভাটা আসিল জোয়ারের জল ক্রমে উপকূল হইতে কূলে, কূল হইতে গর্ভে সরিয়া গেল, এক্ষণে নদীর হীনাবস্থা, আর সে বিক্রমও নাই, সে তেজস্বিতাও নাই, সে প্রচণ্ডতাও নাই, সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত, জোয়ার জল সরিয়া গেল,—মনোহারিতাও গেল—আবার নদীবক্ষে সেই কলঙ্কস্বরূপ চড়া দেখা দিল—জোয়ারে কত কি ভাসিয়া আসিয়াছিল সে গুলি সরিয়া যাইতে পারে নাই, নদী সে গুলিকে নিজবক্ষে—নিজ-কূলে—নিজ উপকূলে—স্থান দিয়া স্বয়ং সৌন্দর্য্য-বিহীন হইল—এটী নদীর শোচনীয় অবস্থা—এটী ভাটার সময়। যুবতীদেহেও লাবণ্যের ভাটা আসিল. যৌবনের বায়ুপ্রভাব ক্রমে অস্তমিত হইল—এখন যুবতীদেহে ভাটা, পাঠকগণ! ক্ষমা করুন, এখনকার অবস্থা আর বলিব না, নদী জীবনহীনা তাই পরিত্রাণ, ইহাতে তাহার যো নাই, দ্বারদেশে অধৌত সম্মার্জ্জনী প্রলম্বিত, পাঠিকা সকল! আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন কি?

ঐ যে স্বর্ণসিংহাসনারূঢ়, শিরোধৃত অমূল্য ছত্র, ঐ যে অমিততেজা শরীর-রক্ষি-দল-পরিবেষ্টিত,— ঐ অগাধধীশক্তি-সম্পন্ন অমাত্যদল-পরিপুষ্ট,— মহারাজ শোভা পাইতেছেন—এক্ষণে উঁহার আধিপত্যের জোয়ার চলিতেছে, কতদেশ জয় করিতেছেন, কত জনের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিতেছেন, কত জনকে আজীবন কারারুদ্ধ করিতেছেন, অধিক কি বাঘ ও গরু এক ঘাটে জল খাইতেছে। আধিপত্যের চড়ান্ত

সীমা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সহসা একটী বিগ্রহ উপস্থিত, মহারাজ বিশেষ রণ-নৈপুণ্য দেখাইলেন, সুশিক্ষিত সৈন্য-দলকে অগ্রসর করিলেন, নানাবিধ কৌশল অবলম্বিত হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মহারাজ পরাজিত ও সস্ত্রীক কারারুদ্ধ হইলেন, এখন অধীনতা—এটী ভাটার সময়। অধিক দিনের কথা নহে—যখন প্রসিয়া ফ্রান্সকে পরাজয় করিয়াছিল—এখন প্রসিয়ার আধিপত্যে জোয়ার, ফরাসী-আধিপত্যে ভাটা।

ঐ যে কোট্ পেন্টুলন ধারী, উষ্ণীষ-মস্তক, চেইন-বক্ষ, অধর-স্পৃষ্ট-করধৃত-হংসপুচ্ছ, যাঁহার ললাটফলকে গভীর মনোহভিনিবেশব্যঞ্জক চিন্তা-সমুদিত রেখা-বলী উদিত হইয়াছে, যিনি চেয়ারাসনে উপবেশন করিয়া ন্যায় বিতরণ করিতে-ছেন; উনি ধর্ম্মাবতার—বিচারক। সম্মুখ-ভাগে কত কত দক্ষ উকীল—কত মোক্তার—কত ব্যারিষ্টার মহাকোলাহল বাধাইয়া দিয়াছেন, বিচারক একতান মনে সেই গুলি শুনিয়া কাহাকে রাজা করিতেছেন, কাহাকে ভিকারী, কাহারও ভিটা বেচা-ইতেছেন, কাহাকে দ্বীপান্তরিত করিতে-ছেন। উঁহার ন্যায়বিচারজ্যোতিঃপ্রভাবে অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইতে সমর্থ হইতেছে না, জটিল বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তন্ন তন্ন হইয়া যাইতেছে, কত মুদ্রার লাক্ষা দ্রব হইয়া যাইতেছে। উঁহার প্রতাপের নিকট দাঁড়ায় কাহার সাধ্য; সকলেই দণ্ডায়মান, উনিই কেবল উচ্চাসনে উপবিষ্ট। যদিও উনি পরাধীন, তথাচ উঁহার সৌভাগ্যে জোয়ার খেলিতেছে, সহসা কোন গুরুতর অপরাধ-নিবন্ধন অধোনীত হইলেন, তখন তাঁহার আর তাদৃশ প্রতাপ কোথায়? তখন আর তাঁহার নিকট কে দাঁড়ায়; তখন তাঁহার সৌভাগ্যে ভাটা পড়া, সে ভাটার কখন পরিবর্ত্তন হইবে কি না কে বলিবে? তাহাতে আর কখন জোয়ার তরঙ্গ উঠা-ইবে কি না তাহা কে জানে?

তবে কিসের অধিকার? কিসের মান? কিসের অভিমান? পুরাণ পাঠ কর, ইতি-হাস পাঠ কর, যদি লেখা পড়া না জান, বৃদ্ধপরম্পরাগত গল্প শুন, যদি তাহাতে অনিচ্ছা হয়, তবে নিজ জীবৎকালমধ্যে প্রত্যক্ষ কর, দেখিবে, এই সংসারে অতীত কালে জোয়ার ভাটা খেলিয়াছে, এক্ষণে খেলিতেছে, ভবিষ্যতে অনন্ত কাল খেলিবে, পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যাহার সৌভাগ্য বা অবস্থা জোয়ার ভাটাকে অতিক্রম করিতে পারে, সকলেই ইহার আয়ত্ত, তবে অহমিকা কেন?

পাঠক! তুমি ইহা পাঠ করিয়া অব-শ্যই মনে করিতেছ, যে আমার সৌভাগ্যে বা অবস্থায় তবে জোয়ার খেলুক না কেন? তুমি অবশ্যই মনে করিতে পার, এবং কে না প্রার্থনা করে? দুই দিনের জোয়ার বড় প্রবল, একটী অমাবস্যার—অপরটী পূর্ণিমার—তুমি কোন্ দিনের জোয়ার আপনার সৌভাগ্যে বা অবস্থায় খেলাইতে

চাও? তুমি জোয়ারের জন্য যেরূপ ব্যগ্র, তাহাতে তুমি এইরূপ উত্তর দিবে যে, যে দিনের হউক, জোয়ার হইলেই হইল. আমার মতে ওরূপ বিবেচনা সমীচীন নহে, অমাবস্যার জোয়ার বড় প্রবল হইলে কি হয়, এই জোয়ারে নৌকা ভাসাইয়া দেও, দিবসে পথ ঠিক করিয়া লক্ষ্য স্থানে যাইতে পারিবে, কিন্তু রাত্রিতে বড় অন্ধকার, তখন নৌকা ঠিক চালাইতে পারিবে না, বারম্বার লক্ষ্য চ্যুত হইবে, হয়ত ঠিক সময়, ঠিক জায়গায় পৌঁছিতে পারিবে না। তবেই ত সকল সময় এক সমান কাটাইতে পারিলে না, তবে উহাতে ফল কি? তবে এক্ষণে উহার অসময়—পূর্ণিমার জোয়ার অবশ্যই প্রার্থনীয়—দিবায় সুস্পষ্ট সূর্য্যালোক—রাত্রিতে সুস্নিগ্ধ সমীরণ—পূর্ণচন্দ্র—কেমন এ যুক্তিটী কি মন্দ?

বিরহীর স্বপ্ন।

১

কেন জাগাইলে সখে! এমন সময়?
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর;
সুখের স্বপন মোর,
আকাশে চপলা যেন পাইল বিলয়!

২

যে সুখে বিগত নিশা করেছি যাপন;
মিলে না তুলনা তার,
স্বরগের সুখ ছার,
আবার বাসনা মনে ঘুমাই তেমন।

৩

আমি যেন আছি নিজ শয়নে শয়ান,
নীরবে শিয়রে বসি
প্রিয়তমা—পূর্ণশশী—
কপোলে লোচনধারা কলঙ্কনিশান।

৪

সুধা বরষিল তায় কতক্ষণ পরে,
জাগিল চকোর মন,
অনিমিক বিলোচন,
অথবা অর্পিত বীণা সুবাদক করে।

৫

সাদরে কহিল প্রিয়া "নাথ, কি কারণ
বল আমা পাশরিয়া,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
বিদেশে সুদীর্ঘকাল করিলে যাপন।

৬

কতবার স্বপনেতে হেরিয়া তোমায়
ছিলাম প্রণয় রঙ্গে,
সহসা স্বপন-ভঙ্গে,
কাঁদিয়া কেটেছি কত সুখদ নিশায়।

৭

কতবার বিরলেতে মূরতি তোমার
এঁকেছি মানস-পটে,
যথা যেটী চারু ঘটে,
না শুনি মধুরবাণী মুছেছি আবার।

৮

করেছি বাসনা কত প্রেম ভুলিবারে,
ভুলিবারে যত চাই,
দ্বিগুণ যাতনা পাই,
জ্বলে যেন তুষানল হৃদয় মাঝারে।

৯

কি অনলে দিবানিশি পুড়েছে হৃদয়!
আশা নীরোচ্ছাস তায়,
যদি না থাকিত হায়!
এতদিনে কোন কালে হ'ত ভস্মময়।

১০

একদিন প্রাণনাথ! পড়ে কি হে মনে?
রঞ্জিয়া তাম্বূল রাগে
ওষ্ঠযুগ অনুরাগে,
দেখিতেছিলাম মুখ বিমল দর্পণে।

১১

নীরবে পেছনে তুমি এমন সময়,
হেরি তব প্রতিছায়া,
শিহরিল মম কায়া,
ফিরিলাম তোমা পানে সপ্রেমহৃদয়।

১২

হাসিয়া গলাটী পেঁচে অমনি আমার
বলেছিলে সেই দিন;—
"তোমারই এ অধীন,
তোমা ছাড়া এ জীবন বিফল আমার"।

১৩

সেই মধুমাখা কথা আজিও শ্রবণে
করে মৃদু প্রতিঘাত,
কিবা দিবা কিবা রাত,
মরিলেও চিরদিন থাকিবে স্মরণে।

১৪

বিরহে যাতনা যত কি বলিব আর,
বার বার কেঁদে হেসে,
দুখের সাগরে ভেসে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস নাথ! করিয়াছি সার।"

১৫

নীরবিল বীণাবাদ্য আমি ত নীরব;
বাজিল হৃদয়-তন্ত্র,
প্রতিঘাত-পরতন্ত্র,
কি বাজে বুঝিনা তবু শুনিতে সুরব।

১৬

লোচনে নিমেষ ফেলি বলিলাম প্রিয়ে!
কেঁদনা কেঁদনা আর,
যাবনা কোথাও আর,
তাপিত করিয়া তব সুকোমল হিয়ে।

১৭

যেমন বাড়ানু কর প্রফুল্ল হৃদয়ে,
ধরিতে চিবুক তার,
মুছাতে লোচনধার,
অমনি পাইল লোপ স্বপ্ন সুখময়।
কি অনল পুন হৃদে হইল উদয়।

শ্রীগঃ

একতা।

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ

শীর্ষলিখিত বিষয়টী, আধুনিক অনেক কবির লেখনীর আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয়ের পুনরান্দোলন কর না হইতে পারে। পূর্ব্বতনকালে ভারতভূমি, যত দিন স্বাধীনাবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, তত দিন, ভারতীয় একতা বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। একতাই স্বাধীনতার মূল, একতাই সমবেত বলবীর্য্যের পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ, একতাবিহীন হইলে সামাজিক দৃঢ়বন্ধন, শিথিল হইয়া তৃণের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হয়। মনোবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষসাধনের চরম কালই একতা। এক জন গৃহী বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত ও বিভিন্নস্বভাব পরিজন-সমূহ লইয়া যে কালাতিপাত করেন তাহাও একতামূলক সহিষ্ণুভাবের পরিচায়ক। সামাজিক, মানসিক ও পারিবারিক প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়িণী উন্নতি একতা হইতে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, সহানুভূতি একটী উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি-মধ্যে পরিগণিত, তাহাও একতা দ্বারা জীবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যদি স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় তবে প্রতীতি হইবে। সহানুভূতি একতারূপ পর্ব্বতের উৎপাদক পরমাণুস্বরূপ যে হৃদয়ে জ্ঞান আছে সেই হৃদয়েই দয়া আছে সুতরাং সহানুভূতিও আছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। সহানুভূতি, জাতীয় স্বাধীনতা ও গৌরবরক্ষার একমাত্র প্রশান্ত উপায়, যে কারণে একজন অনক্ষর স্বজাতীয়কে অন্যজাতিকর্ত্তৃক অনর্থ উৎপীড়িত হইতে দেখিলে সহানুভূতি উপস্থিত হইয়া নিপীড়িতকে রক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করে, সেই কারণেই আবার স্বজাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ব্যগ্র হওয়া যায়। অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে একতা সর্ব্বশরীরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত, তখন ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের, দ্বিজবর্গ দ্বিজদিগের জাতীয় গুরুতা রক্ষা করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না এই কারণেই তখন উন্নতি পশ্চাদ্গতি না হইয়া বর্দ্ধনশীলা হইয়াছিল, পূর্ব্বতন সময়ের প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা এ বিষয় প্রতিপন্ন করা বৃথা। কারণ তাহা কাহারই অজ্ঞাত বা অশ্রুত নাই। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশ সভ্যতা-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ফলতঃ এই গর্ব্বের সমূলকতা ও অন্বর্থতা প্রতিপাদন করিতে হইলে একতা-বিষয়ে আমরা পূর্ব্বতনকালের সমান হইয়াছি কি ন্যূন আছি দেখা আবশ্যক। সুশিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইতেছে, সুতরাং আশা করা যায় যে নিদ্রিত মনোবৃত্তিসমূহ জাগরিত হইবে, তাহা হইলে একতাও যে সকলকে আকর্ষণ করিয়া মিলিত, একচিত্ত করিবে বিচিত্র কি? কিন্তু ফলে তাহার

কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হইতেছে না বরং মূর্খদিগের মধ্যে একতা অনেকাংশে রক্ষিত হইয়া থাকে, যেখানে ৫ জন পশ্চিমদেশীয় প্রহরী থাকে, সেখানে সেই নিরক্ষরদিগের মধ্যে একতা সম্যক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে, একের জন্য অন্যেরা প্রাণ-বিসর্জ্জনে সম্মত কিন্তু যেখানে ৫ জন বঙ্গদেশীয় থাকেন, তথায় একতার সম্যক্ অসদ্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা-প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিসমূহ যে সমাজের চালক, তথায় উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তি কি প্রাপ্ত হইতে পারেন? এই জন্য বঙ্গীয় সামাজিক অবস্থার অস্থিতে দুরপনেয় কলঙ্ক-রাশি প্রবেশ করিয়া সমাজকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, উপচীয়মান সমাজের অবনতি এইরূপেই ক্রমে ক্রমে সাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গসমাজ শিক্ষার গর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই বিষয়ের পরি-পুষ্টতা লাভ করিতে পারেন, তবেই কখনও না কখন হতশ্রীক দেশের বিনয়দশানীত শোভা বর্দ্ধিত হইতে পারে। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনগরে হিংসা দ্বেষের প্রাচুর্য্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাঁহা-দিগের আমোদ ও অবকাশসময় স্বজাতী-য়ের দ্বেষে ও নিন্দায় যাপিত হয়, তাঁহারা কি মিলিত বলের জন্য গর্ব্বিত হইতে পারেন!! তাঁহাদিগের হৃদয়াস্থিতে যে বিষম ঘুণ প্রবেশ করিয়াছে, সেই ঘুণই ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য-ঘৃণ্য-পদার্থ-মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। আমরা অনেক বিষয়ে ইংরেজজাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাই, কিন্তু ইংরেজজাতির যে সকল সদগুণ আছে তদ্বিষয়ে আমরা অঙ্কিতদৃষ্টি হই, একতা-বিষয়ে ইংরেজজাতি কেমন দৃঢ়যত্ন, তাহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা আড়ম্বর করা বৃথা। সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন কার্য্য সুফল-প্রসূ হইতে পারে না। যদি ইহা সাম্যতন্ত্রের ও বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের অনুমোদিত হয়, তবে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একতারও বৃদ্ধি হওয়া অন্ততঃ সমভাবে থাকা নিতান্ত প্রার্থনীয় বোধ হয়। কি বাণিজ্য, কি কৃষি, কি শিল্প, কি রাজনীতি, কি স্বদেশ-রক্ষা একতা ব্যতীত কিছুই হইবার নয়, মরুদেশে রোপিত বীজ হইতে ফলপ্রত্যাশা ও বিচ্ছিন্ন ঐক্যসমাজ হইতে মঙ্গলকামনা উভয়ই তুল্য। শারীরিক বলবৃদ্ধি করিয়া কি হইবে, যদি চিত্তক্ষেত্রমধ্যে একতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়? আমরা স্বজাতীয়ের অবমাননা ও নিন্দার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই, প্রকৃত পক্ষে একতার অসদ্ভাবে আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ নিতান্ত শোচনীয় দশায় অবস্থাপিত আছে মানসিক ঐক্য ব্যতীত, সুকঠিন সামান্য তন্ত্রের সুমহান্ অভিপ্রায় সকল কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। আমরা এবিষয়ে অতি হীন আছি, বিশেষতঃ বাঙ্গালি জাতির মধ্যে প্রক্রান্ত বিষয়ের যত অসমীচীনতা এমন আর কোন জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয় না। ধনাঢ্য মহাশয়গণ ভোগ-

বিলাসের দাসত্বে জীবন বিক্রয় করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্ধনদিগের পরিপোষক না হইয়া কেবল পুঞ্জীকৃত অর্থরাশি দুরোদর ব্যসনের উদরে আহুতি প্রদান করিতেছেন। যদি ধনী মহাশয়গণ সহানুভূতি-প্রযোজিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তবে নির্ধন অথচ কৃতবিদ্যশ্রেণীর অবস্থা এত হীন হইত না। শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া দেশের অভূতপূর্ব্বশ্রীবৃদ্ধি হইত। মনুষ্যসমাজ অন্যান্যের নিতান্ত সাহায্যসাপেক্ষ, কিন্তু সাহায্য করে কে? ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাই তাহার পথপ্রদর্শক মাত্র। তাঁহারা যদি নিদ্রিত থাকেন, তবে কে তাঁহাদিগকে উদ্বোধিত করে? এ বিষয়ের উদ্বোধন আবশ্যক নাই। রাজধানীস্থ ঐশ্বর্য্যশালী মহাশয়েরা কি শিল্প কি বাণিজ্য কোন্ বিষয়ে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন? ফলতঃ ধনীদিগের বিলাস-বিজৃম্ভিত অন্তঃকরণে এ বিষয়ের এক বর্ণও স্থান প্রাপ্ত হইবে বোধ হয় না, কিন্তু নব্য শিক্ষিতদলে একতার অসদ্ভাব দৃষ্ট হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয় একীভাব সাম্রাজ্যের জীবন বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মানসিক ক্ষুদ্রতা হইতে নানাবিধ অনৈসর্গিক ঘটনা উপস্থিত হইয়া সংসারকে ব্যাকুল ও অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলে। এই সকল নিরাকরণ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রাবল্য একান্ত আবশ্যক। আজ কাল, বঙ্গদেশে জ্ঞানবিষয়িণী উন্নতি বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে সুতরাং সমবেত চেষ্টাও যে, সময়ে একীভাব ধারণ করিবে আশা করা যায়। কিন্তু এইরূপ বিষয়-পরম্পরায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সহানুভূতি ও একতার সম্যক্ সদ্ভাব নিতান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। যদি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিসমূহ দ্বেষ, হিংসাদি দ্বয়ে আচ্ছন্ন থাকে, তবে সুফলপ্রত্যাশা দুরাশায় পরিণত হয়। একজন ঘোরতর মূর্খ-স্বজাতীয়, যেজন্য স্বজাতীয়লোকসমূহের নিকট একোদরজাত বলিয়া সমাদৃত হয়, সেই জন্য গভীর বিদ্বান্ ও অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতিও আদৃত হন। এইরূপ একীভাব জাতীয়-সম্মানরক্ষাবিষয়ে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারে। পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কর, বিশদরূপে অবগত হইতে পারিবে যে, জাতীয় উন্নতিসমূহের একতাই নিদান। সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়সংগ্রাম কি কারণে সমুপস্থিত হয়? এক জন স্বদেশীয়ের অবমাননায় প্রায় লক্ষাধিক বীরপুরুষ সমুত্তেজিত হইয়া দশবার্ষিক ভীষণ সংগ্রামের পর ট্রয়নগর বিধ্বংসিত করিয়া প্রত্যাগমন করেন, কত বীর-পুরুষ উক্ত হৃৎকম্পকর সমর-যজ্ঞে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া অতুল্য যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ধন্য একতা! ধন্য সহানুভূতি! একতাবিহীন জাতি পশুযূথের ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে কালযাপন করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে কোন উন্নতভাবের চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না, বর্ব্বরজাতি একতাকে বিশেষরূপে জানিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে এই ভাবের আকুঞ্চন, প্রসারণ দৃষ্ট হয় না, তুল্যভাবে একতাবিষয়ক নিয়ম রক্ষিত হইয়া

থাকে। অতি সুসভ্য পৃথিবীর বর্ত্তমান জাতি-সমূহ কি একতা-প্রভাবে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন না? এক জন স্বদেশীয়ের অঙ্গ অন্যজাতিকর্ত্তৃক অযথাস্পৃষ্ট হইলে, তাঁহারা বিনা বিলম্বে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া কি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না? এই কারণে কি স্বল্পদিনবিগত ফরাশিবিদ্রোহ সমুপস্থিত হয় নাই? ইউ-রোপখণ্ডের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে এই বিষয়ের শত শত সুস্পষ্ট প্রমাণ অবগত হওয়া যায়। আমরা যে সুসভ্য ইংরাজ-জাতির প্রসাদে আশানুরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিয়া পরম সুখলাভ করিতেছি, তাঁহা-দিগের মধ্যে একতা কেমন উপাদেয়রূপে রক্ষিত হইয়া থাকে? তাঁহাদিগের মধ্যে স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের দ্বেষভাব আদৌ মনে স্থান পায় না, এজন্য তাঁহারা নিরন্তর গর্ব্বী হইয়া থাকেন। আমাদিগের মধ্যে সে ভাবের কত অভাব দৃষ্ট হয়? ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ বিষম অনর্থের মূল, জ্ঞান-জনিত উৎকর্ষ তাহার নিবারক, মনে করিলে অনেক অসুন্দর গর্হিতভাব সহজেই নিরাকৃত হইয়া থাকে। একতা দ্বারা সামাজিক উৎকর্ষ-সাধন বিনাপ্রযত্নেই হয় বলিলে শিল্প, সাহিত্যের সমীচীন উন্নতি কি এত আয়াস-লভ্য হইয়া থাকে? বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা কেন প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুযোজ্য হইয়া থাকেন, তাহার কারণ কি আপনারাই নন? অনেক সুবিজ্ঞ কৃতবিদ্য লোক বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষে নানাবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় লোক-মণ্ডলীর মনের ভাবও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, তথাপি দেখা আবশ্যক যে ঐ সকল পৃথক্‌ধর্ম্মাবলম্বীরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষ মাত্র। অব-হিত চিত্তে সবিশেষ অনুসন্ধিৎসু হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে হিন্দু ধর্ম্মের নীতি মূল হইতেই উক্ত প্রকার বহুবিধ ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইয়াছে, বিশদরূপে বলিতে হইলে এ বিষয়টী আরও বহুলতা-যুক্ত হইয়া থাকে। এক জন কলিকাতা-বাসী সুসভ্য ব্যক্তি যশোহরপল্লীনিবাসী লোককে নিতান্ত ঘৃণ্য অসভ্য মনে করিয়া তাহার সহিত একত্র উপবেশনাদি পরিত্যাগ করিবেন এবং আপনাকে স্বর্গীয় দেবপুরুষ মনে করিয়া কতই আত্মগরিমা প্রকাশ করিতে থাকেন, যদি উভয়স্থানবাসীই কৃতবিদ্য হন তথাপি তাঁহারা পরস্পরের প্রতি একটুকু পৃথক্ ভাব ব্যক্ত বা মনে ধারণা করিতে অনুকূল হইবেন না লেখা বাহুল্যমাত্র। যদি এক জন বঙ্গদেশীয় কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে পতিত হন, তাহা হইলে বঙ্গদেশবাসী-মাত্রই তজ্জন্য নিরতিশয় দুঃখিত হইবেন, বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সহানুভূতির আস্পদ হইবেক, এ বিষয়ে বঙ্গদেশীয় ভ্রাতারা যতই অগ্রসর হইবেন, ততই বঙ্গদেশের অবস্থাগত মঙ্গল-সমূহ উপচিত হইতে থাকিবে। যদি ভারত-বর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি হয়, এক গৃহ-স্বরূপ হয়, তবে সকলেই কি আমরা সহোদর-

সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহি? আমরা কি আমাদিগের পরস্পরের সাহায্য জন্য দায়িক নহি? দাসপ্রথা উন্মূলন জন্য ইংরাজজাতি কত অর্থ কত বাহুবল প্রদর্শন করিয়া অবিলোপনীয় যশোরাশি ক্রয় করিয়া মর্ত্ত্যলোকবাসীদিগের পরম হিতকর মিত্রস্বরূপ হইয়া আছেন? তাঁহারা নরজাতি মাত্রেরই মহোপকারক বলিয়া অবশ্যই সমূলক গর্ব্ব করিতে পারেন। আমরা পরস্পরের সাহায্যকারী হইলে এতদ্দ্বারা স্বদেশেরই পরম মঙ্গল, সন্দেহ নাই, ধনী সকল যদি স্ব স্ব সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি কোষাগারে চিরনিক্ষিপ্ত না করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়িণী সুবিধা প্রদর্শন করেন, তবে দাসত্বপ্রথা বহুল পরিমাণে নিবারিত হয়। এই সকল বিষয় কি একতা ও সহানুভূতি ব্যতীত কখনও সংঘটিত হইতে পারে? যদি সমাজের ও দেশের অভ্যন্তরীণ মঙ্গল সকলের প্রার্থনীয় হয়, যদি জ্ঞানের গৌরব স্বীকার্য্য হয়, তবে পরস্পরের হিতৈষণা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ সাধারণের গৃহস্বরূপ, এতদ্দেশবাসী সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়, এরূপ সুখপ্রদ তত্ত্ব মনে উদিত হইলে মানসিক ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য কখনই অনপনেয় থাকে না। এই বিষয়ে উন্নতি দর্শনেচ্ছু হইতে হইলে নৈতিকবন্ধন আরও দৃঢ় করা আবশ্যক, সমদর্শিতা-প্রভৃতিকে সমধিক উত্তেজিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উদ্দীপনাবৃত্তিকে অলীক উপাখ্যান দ্বারা আচ্ছাদিত না করিয়া যাহাতে উদ্দীপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তাহারও যত্ন আবশ্যক। ধর্ম্মনীতি বহুল-পরিমাণে প্রসৃত হইলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের অবিশুদ্ধ নৈতিক স্রোতঃ পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। মানসিক হিংসা-দ্বেষ-বিজৃম্ভিত জুগুপ্সিত ভাব সমুদায় স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তখন আর উড়িষ্যাবাসীদিগকে ঘোরতর অসভ্য মূর্খ বোধে একত্রোপবেশন করিতে ঘৃণা হইবে না, তাহাদিগের অবস্থাগত উৎকর্ষ সাধন করিয়া একাবস্থ করিতে যত্নপর হওয়া জ্ঞানাভিমানী কৃতবিদ্যের অবশ্যই কর্ত্তব্য কার্য্য সন্দেহ নাই। দয়াশীল খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক মিশনরিগণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কত কত অসভ্যাবস্থদেশের মহোন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের কি স্বার্থ আছে? যদি কেহ কেহ মনে করেন যে তত্তৎ কার্য্যসমূহ দ্বারা অভিপ্রেত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহারা কি দেশ শুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছেন? আপাতত দেশের মহোপকার কত পরিমাণে তাঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে? এ জন্য তাঁহারা কি সাম্যতন্ত্রের ও পরোপকারের নিকট চিরকাল ধন্যবাদার্হ হইবেন না? কিন্তু আমরা পরস্পরের জ্ঞানের ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দ্বেষ হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকি মাত্র। কুপ্রবৃত্তি আমাদিগের চালক হইলে আর কি নিস্তার

আছে? একদিনেই কি আমরা জড়তা প্রাপ্ত হইব না? পৃথিবীতে যত অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহার অধিকাংশই মানসিক দৌর্ব্বল্য হইতে জন্মে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বক্তৃতা দ্বারা চিত্তাকর্ষণ ও আর্দ্র করা অপেক্ষা কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করাই অধিক প্রয়োজনীয়। এখন আর কেবল বাবদূকতা দ্বারা কার্য্যসাধনের প্রত্যাশী হইলে প্রবঞ্চিত হইতে হইবে। সকল ক্ষুদ্র সমাজ যদি একতাবিষয়ক অনুষ্ঠান, সহানুভূতিপ্রযোজিত হইয়া করেন, তবে সুবৃহৎ সমাজও ঐ বিষয়ে ফললাভ করিবে। পল্লীসমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমবেত বলের আবশ্যক। সমবেত বল একতা ব্যতীত কখনই সাধিত হইবেক নাই, এক জন দরিদ্র কুটীরীর প্রতি সহানুভূতি যে স্বজাতীয় বোধ হইবে ইহাই সহজ বিশ্বাসের ফল, এ বিষয়ে অধিক প্ররোচনাগর্ভবাক্য নিঃসারণের আবশ্যক বিরহ। স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিসমূহ, জননীতুল্য জন্মভূমি সন্তানগণের প্রতিই অধিক পরিমাণে কার্য্যকর হইয়া থাকে। প্রস্তাবের উপসংহারকালে বক্তব্য এই, যাঁহারা কৃতবিদ্য, বহু সুসভ্য দেশের পুরাবৃত্ত যাঁহাদিগের স্মৃতিদর্পণে নিরন্তর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একতার বীজস্বরূপ সহানুভূতি উপস্থিত হইয়া যে অধিক কার্য্যকরী হইবে, এ আশা কখনই দুরাশা নয়। যদি এবম্বিধ আশাবৃত্তি এমন সময়ে চরিতার্থতা না প্রাপ্ত হয় তবে বৃথা জ্ঞানাভিমান ফলপ্রদ হইবে না।

যমুনা।

১

যামিনীর কহিনুর ডুবিল যখন
অদৃশ্য সাগর মাঝে যে দিনের তরে
উদয় অচল হতে কাঞ্চন তপন
ক্রমে দিল দরশন ভুবনভিতরে।

২

আকাশবিহারী যত গায়ক-মণ্ডল,
গাইয়া মহেশগুণ মুক্তকণ্ঠে মরি,
ছুটিল আমোদ-ভরে শোভি নভঃস্থল;
জাগিল প্রকৃতি-দেবী চারুহাস ধরি।

৩

নিদ্রা শয্যা পরিহরি পর্য্যটনতরে
গেলাম বাহিরে যবে, নেহারে নয়ন
কতই নূতন শোভা জগত ভিতরে;
কি ক'রে বিশেষ তার করিব বর্ণন?

৪

কবির কল্পনা কবে কোথায় কেমন
কি লাগি করিব কাজ কে পারে কহিতে?
মন্দ মন্দ পদচারে দিনু দরশন,
যমুনে, তোমার হরষিততীরে চিতে।

৫

যেমন বসিনু আমি ভাবের সাগর
অমনি উথলি উঠি লেখনী বাহিয়া
পড়িল কাগজ ক্ষেত্রে বেগ খরতর
কি জানি কি হ'ল তার না পাই ভাবিয়া?

৬

তপনতনয়ে তুমি পাপী তরিবারে
জগতে যমুনা-দেবী আর্য্যগণে গণে;
সুনীল সুচারু রূপ সুভগে সংসারে
গাইতে মহিমা তব বড় সাধ মনে।

৭

শৈলনাথসুতা সতী সুধীর দর্শন
তব তীরে বেণীঘাট তীর্থ পুরাতন;
জাহ্নবী সঙ্গমা তায় কিবা মনোহরা
তুলিলে তুলনা তার নাহি ধরে ধরা।

৮

পতিতপাবনী দেবী জাহ্নবী ভুবনে;
হিমাদ্রিভবনে জন্ম যখন তাঁহার
সহোদরা হও তুমি তাঁর সে কারণে
যদিও পুরাণে ভিন্ন জনম দোঁহার।

৯

ভুলাতে ভাবুকে ভবে ভাবের ভাণ্ডার
মরি মরি তব রূপ কিবা দরশনে!
যাঁহার পবিত্র নামে পুরিত সংসার
কি ক'রে ঘুষিব তায় সামান্য লিখনে?

১০

সঙ্গমনিকটে কিবা চারু দরশন,—
এক দিকে স্বচ্ছ নীর যেন দরপণ—
আর দিকে নীল নীর করে বিরাজন
হরিহরভ্রমে ভাবে ভাবুকের মন।

১১

মাঘ মাসে কল্পবাসে কত হিন্দুগণ—
দেশ দেশান্তর হতে আগমন করে;
তেমনি আবার আসি হইলে গ্রহণ—
সঙ্গমে করিয়া স্নান সর্ব্ব পাপ হরে।

১২

অন্তর্নীরা সরস্বতী বহিয়া হেথায়
(হেন জনশ্রুতি বটে) না হেরি নয়নে
গোপনে গোপনে নিত্য ভেটিছে তোমায়
মহামান্যা রাজকন্যা তুমি গো ধরায়।

১৩

চঞ্চল সে জলদল নহেক তোমার
গম্ভীর আননে শুধু মারুতহিল্লোল
খেলিয়া হাসায় কভু নহে অনিবার;
বরিষা বিহনে তব নাহিক কল্লোল।

১৪

নিমের বিটপিরাজি নয়নরঞ্জন
তোমার উত্তর পার শোভে অনুক্ষণ;
নাইনীর কারাগার অপূর্ব্ব গঠন
আলো করি পরপার শোভিছে তোমার।

১৫

হরিষে বিষাদ কিন্তু ঘটিল আমার
যখন হেরিনু তব বক্ষের উপরে
যবনরচিত এক সেতুর আকার
দলিতেছে ত্রয়োদশ ভীমপদ ভরে।

১৬

এ দিকে সঙ্গম কাছে প্রান্তর উপরে
তোমার উত্তর তীরে শোভে অনুক্ষণ—
দুরন্তদলন দুর্গ গরবের ভরে
বিজয়কেতন তার উড়ায় পবন।

১৭

ভগ্ন দেবালয়খণ্ডে গরভে তোমার
বসিয়া মানব কত মীনের কারণে ;
তীর হতে হেরিলেই তাদের আকার
ঠেকিবে অতীব ক্ষুদ্র সবার নয়নে।

১৮

প্রমোদ তরণী* কত চারু দরশন
শোভিছে তোমার বক্ষে কাতারে কাতার;
বেড়াতে বাসনা করি হইলে কখন
তাহায় চড়িয়া ফেরে তোমার মাঝার।

১৯

শীতাগমে তব কূলে যত কৃষিচয়
ধরি হল কুতূহল সব চাস করে ;
প্রাবৃটে পুলিন তব সদা নীরময় ;
ভীষণ মূরতি তব কলেবর ধরে।

২০

সুন্দর উন্নতচূড় কত দেবালয়
যাত্রীর সুযোগ্য স্থান ভারত ভিতরে
বিরাজে তোমার তীরে কিবা শোভাময়!
হেরিলে ভক্তির ভাব উদয়ে অন্তরে।

২১

তাপিলে তপনতাপে সুতট তোমার
তাহার বালুকা-রাশি হেন রূপ ধরে
কোথায় সুচূর্ণ হীরা নিকটে তাহার
না ধরে উপমা কভু জগত ভিতরে।

২২

বৈরাগ ছাড়িয়া চল যথা বৃন্দাবন
মরি মরি কি মাধুরী হেরিব তথায়!
কিন্তু কৈ পূর্ব্বের কিছু না হেরি এখন
সকলি কালার সাথে চলে গেছে হায়!

২৩

শ্যাম-সোহাগিনী-ধনী যমুনে সুন্দরি
কতই করেছ মজা লইয়া কালায় :
রাসের বিহারী হরি তোমার উপরি
কতই করেছে মজা লইয়া রাধায়।

২৪

দৈনন্দিন দিননাথ দিলে অদর্শন
কুলাঙ্গনা যত মিলি যমুনাপুলিনে
একতান গান সনে জলের কারণ
যাইয়া পথিকমন সদা লয় কিনে।

২৫

তাই বুঝি ব্রজরাজ রাধার রমণ
অধরে মধুর বীণা ধরিয়া কৌশলে
মজাইত ব্রজবালা ব্রজের রতন
লভিয়া সুযোগ হেন কদম্বের তলে?

২৬

নাহি সে কদম্বমূল শঠের আলয় ;
নাহি সে বংশীর ধ্বনি গোকুলমোহন ;
পীতধড়া পীতাম্বর নাহি আর রয় :
শুধুই ব্রজের বালা জলের কারণ।

২৭

শূন্যময় বৃন্দাবন নিধুবন আর
হারায়ে কালার খেলা করিছে রোদন ;
হাম্বারবে গাভীগণ ডাকে অনিবার
না দেখে তাদের রাজা গোপালরতন।

২৮

মোগলেশ সাজাহান বিখ্যাত ভুবনে
প্রণয়-প্রতিমা লাগি তাজের সৃজন
করিয়া গেছেন মরি রাখিয়া স্মরণে
তাও গো তোমার তীরে শোভিছে এখন।

শ্রীভুঃ

* প্রমোদ তরণী—Pleasure-boat.

মহিষাদলরাজ।

কোন দেশের সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত তদ্দেশের ভাষা পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তাহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন, ইতিহাসাদির সম্পূর্ণ সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং তাহাদেরও উন্নতি সংসাধিত হইতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে ভাষাও সর্ব্বাবয়বসম্পন্না হইতে থাকে। এবং দেশের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর বিশেষ পরিচয় ও কীর্ত্তি সমূহ প্রকাশিত হইয়া সাধারণের সুপরিজ্ঞাত হইতে থাকে। আমরা উপরিলিখিত নীতিমার্গানুসারী হইয়া এই পত্রিকায় তমোলুক উপবিভাগের অন্তর্গত মহিষাদল নামে যে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে, তাহার সুবিখ্যাত রাজবংশের বিশেষ বিবরণ প্রকাশে যত্নবান্ হইলাম। আশা করি, প্রাচীন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহাত্মগণের ইহা কথঞ্চিৎ তৃপ্তিকর হইবেক।

এই রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা জনার্দ্দন উপাধ্যায়। ইনি পশ্চিমদেশীয় সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কার্য্যান্তর ব্যপদেশে এ প্রদেশে আগমন করিয়া মুসলমান নবাব সরকার হইতে সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির জমিদারী গ্রহণ করেন। তিনি কোন্ সময়ে তাহার বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, এক্ষণে তাহার নিরূপণ করিবার উপায় নাই। অনন্তর বহুতর যত্নে প্রজা সংস্থিতি করিয়া রাজোপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার পর দুর্য্যোধন, রামশরণ, রাজারাম, শুকলাল, এবং আনন্দলাল ক্রমান্বয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত রাজার ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণী রাণী জানকী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যালোচনার পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলিন দেবতা ও মন্দিরাদি এবং অতিথিশালা এপর্য্যন্তও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতি সুনিয়মেই ঐ সমস্ত দেবসেবা নির্ব্বাহ হইয়া আসিত।

ইঁহারই রাজত্বকালে কোম্পানি বাহাদুরের দশসালা বন্দোবস্ত হয়, এবং সেই বন্দোবস্তকালীন তাঁহার নামের সহিত রাণী উপাধি সংযুক্ত ছিল। শুনিতে পাই, তমোলুকস্থ সল্ট এজেন্ট মেঃ উইলিয়ম ডেন্ট সাহেবের প্রেরিত গবর্ণমেন্ট রিপোর্টে তাহার প্রমাণ আছে। এই পুণ্যবতী রাণীর লোকান্তর হইলে, তাঁহার স্বামীর পোষ্যপুত্র রাজা মতিলাল তৎপরে উক্ত মতিলালের সেবা সূত্রে রাজা গুরুপ্রসাদ গর্গ রাজপদাভিষিক্ত হয়েন। ইনি লোকান্তর গমন করিলে ইঁহার মাতা রাণী মন্থরা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অনন্তর গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে রাজা জগন্নাথ গর্গ, তৎপরে রাজা রামনাথ গর্গ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যান। শেষোক্ত

নৃপতির উইলসূত্রে বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ গর্গ বাহাদুর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই নৃপতির রাজত্বকালে তাঁহার জমীদারির সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইনি একটী বহুব্যয়নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ সেতু (Bridge) এবং একখানি প্রকাণ্ড রথ প্রস্তুত করিয়া বহু-ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। পুলটী রাজবাটীর সম্মুখস্থ শোভার প্রধান কারণ; এবং রথ-খানি এরূপ বৃহৎ যে সচরাচর তাহার সমতুল দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে ইনি নিজ ব্যয়ে একটী মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশে বিদ্যাচর্চ্চার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। তাঁহার সমুদায় ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন এবং বালকদিগকেও কোন রূপ বেতন প্রদান করিতে হয় না। বিদ্যাদান পক্ষে কেবল ঐ বিদ্যালয়-স্থাপন ইঁহার এককার্য্য নহে। বহুদিন হইতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের বিদ্যোৎসাহিতা প্রবর্দ্ধন-মানসে তাঁহাদিগকে প্রচুর বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অল্পদিন হইল ভাটপাড়ার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নকে ৫ বিসি (১০০৲ টাকা মূল্যের) ধান্যের বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন। যৎকালে আমাদের দেশে আর্য্যজাতির অধিকার ছিল, তখন বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ-দানের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। মুসলমান অধিকারেও রাজা, জমীদার ও ধনশালী মহাত্মারা তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল আমাদের দেশের ধনশালী মহাত্মাদিগের সে পথে পদার্পণের বড় একটা অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন সময়ে রাজা বাহাদুর যেরূপ বিদ্যোৎসাহিতা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ও তাঁহার উপযুক্ত দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র দাস মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এই রাজা বাহাদুর নিজব্যয়ে একটী ইংরেজী ডিস্পেন্সারি ও হস্পিটাল এবং একটী দেশীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দুঃস্থ প্রজাগণের জীবন-সম্বন্ধেও মহান্ উপকার সাধন করিতেছেন। ডিস্পেন্সারিতে একজন উপযুক্ত সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জন চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে ইঁহার আরও কয়েকটী কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

ই° ১৮৫২ সালে তমোলুকে যে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে ইনি মাসিক ১৬৲ টাকার হিসাবে চাঁদা প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং এখানকার চিকিৎসালয়েও মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কাঁথির ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাসিক ২০৲ টাকা, পাঁশকুড়ার ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাসিক

৮, টাকা ও গেঁওখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে মাসিক ৬, টাকার হিসাবে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। এবং গত বৎসর যে ছাত্রটী তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে মাসিক ২, টাকা করিয়া বৃত্তিদান করিতেছেন। মেদিনীপুরে হাই-স্কুল স্থাপন জন্যও এককালীন ৫০০০, হাজার টাকা প্রদান করেন।

বিগত দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ সাহায্যদান-কালে রাজা বাহাদুর মেদিনীপুর রিলিপ কমিটীতে ১০০০, টাকা ও তমোলুকে ১০০, টাকা, একুনে ১১০০, টাকা প্রদান করেন। এই সকল প্রকাশিত দান ভিন্ন তাঁহার গোপনীয় দানও অনেক আছে।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজশ্রীলক্ষ্মণ প্রসাদগর্গ বাহাদুরের কীর্ত্তি অবিনাশিনী এবং তাঁহার বদান্যতা প্রশংসনীয়া। সুতরাং তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন সাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বল আর্য্যসুতের আক্ষেপ।

১

কেন বা বাজে না আর সে শঙ্খপ্রবর?
ধনঞ্জয়-কর-শোভা রব ঘোরতর।
দেখিতেছি যথা তথা;
কত শঙ্খ, কিন্তু কথা
নাহি কহে, মূক ভাব করেছে ধারণ,
কে আর ' ফুঁ ' দিবে তায় মধুর তেমন?

২

কোথা সে গাণ্ডীব ধনু? টঙ্কারে কঠোর
কাঁপিত মেদিনী ধরে; বিপদ বিঘোর
গণিত অরাতিদল,
হয়ে অতি হীন বল,
বীরপদে প্রাণ ভয়ে মাগিত শরণ;
এবে কোন বিদেশীর করসুশোভন?

৩

কোথায় সে সহিষ্ণুতা? গুণের ভূষণ,
যাতে হয় অনায়াসে অসাধ্য সাধন;
যার বলে ধর্ম্মরাজে
বহু ক্লেশে বন মাঝে,
রাজ্যলাভ অবশেষে হইল সুলভ;
ভারতের দুরদৃষ্ট তরে সে দুর্লভ!

৪

কোথা সে অধ্যবসায়? করিল প্রস্থান,
ভারত আছিল যার প্রিয় বাসস্থান,
যার বলে আর্য্যকুল,
উতরি গিরিসঙ্কুল
স্থান; ভয়ঙ্কর দস্যু, অসুর বিনাশি
হরিলেন সুখে কাল আর্য্যাবর্ত্তে আসি।

৫

কোথা বা একতা ? যার প্রসাদে, অতুল
লভিল গৌরবরাশি, পূজ্যদেবকুল।
মধ্যে মধ্যে কি ভীষণ
অসুরের আক্রমণ
সহিলেন—করিলেন সবংশে বিনাশ,
একতা বিহীন হলে, হতো সর্ব্বনাশ।

৬

কোথায় সে ধর্ম্মভীতি, প্রবৃত্তি রতন ?
নশ্বর মানব হৃদে দেব-প্রিয় ধন।
যে রতনে কণ্ঠহার,
করি আর্য্যসুকুমার
আজীবন মন সুখে করিত যাপন;
রোগ, শোক, অপমৃত্যু না জানি কেমন।

৭

আর কি বাল্মীকি, মাঘ, কালিদাস, ব্যাস,
ভারত সাহিত্যাকাশে হবেন প্রকাশ ?
আর্য্যভট্ট, লীলাবতী,
ভাস্কর সুমহামতি,
জয়দেব-গীতিকাব্যকর সুললিত,
যাঁর গানে চরাচর হয়েছে মোহিত।

৮

বিরাজিত যেই দেশে বীর অগণন,
নিরন্তর যোদ্ধ,বেশে শঙ্কাহীন মন।
এবে কেন সেই দেশে
আর্য্যসুত হীন বেশে
ম্লানমুখ, ক্ষীণতনু, করিছেন বাস;
স্বাধীনতা হীনতার এই কি আভাস ?

৯

কোথা ভারতের পূর্ব্ব পাণ্ডিত্য এখন ?
স্বাধীনতা সহ কি তা হয়েছে যবন ?
কোথা মনু মিতাক্ষরা,
বেদ, স্মৃতি মধুভরা
কোথায় রয়েছে পড়ে কে করে যতন ?
'পাতড়ায়' আজ কাল সুখী নহে মন।

১০

মাকুনাটন, কাউপার, পীর মিণ্টন,
করেছেন অধিকার তাঁদের আসন।
মন্দবেশে ক্ষীণকায়,
প্রবেশি পল্লীসভায়,
আর্য্যশাস্ত্র হীনবেশে কাটিছেন কাল,
কে জানিত এইরূপে ভাঙ্গিবে কপাল ?

১১

ঘটেছে ভারতে এবে কাল আবর্ত্তন;
পূর্ব্বভাব কিছু নাহি হয় দরশন।
চষিছে কৃষক মাঠে,
রবি করে বুক ফাটে,
তথাচ না ফলিতেছে শস্য সুপ্রচুর,
দারুণ অভাব রাশি নাহি হয় দূর!

১২

জানু বিলম্বিত বাস উত্তরীয় হীন,
গিয়াছে ত্যজিয়া দেশে; এসেছে নবীন
বেশ নানা, হ্যাট ক্যাপ
রেলওয়ে টেলিগ্রাপ
কত মত সুখসেব্য দ্রব্য অগণন,
তথাচ লোকের কেন মলিন আনন ?

১৩

বুঝেছি মরম তার এখন নিশ্চয়,
ভারতের স্বাধীনতা হইয়াছে লয়।
যে ধন বিহনে রবি
ধরে না মোহন ছবি
পাখিকুল শাখি পরে ডাকে না সুন্দর
উদয়ে উজ্জলে যার পর্ব্বত কন্দর।

১৪

যাঁর বরে বনবাসী অসভ্য বর্ব্বর,
নিবসে সঙ্গিনী সহ সুখে নিরন্তর;
তুষার আবৃত দেশে
সন্তোষ সলিলে ভেসে
মহাসুখে দিন কাটে পোলাণ্ডারগণ;
স্বরগ নরক সম বিহীনে যে ধন।

১৫

ভারতের দুরদৃষ্ট ঘটেছে এখন,
অধীনতা নিগড়েতে দারুণ বন্ধন!
নিরুদ্যম ভগ্ন মন
একতা-বিহীন জন
দুর্ব্বল, সাহসহীন হয়েছে সকলে;
আর্য্য-কুল-ভাগ্য-রবি গেছে অস্তাচলে!!!

শ্রীউমাচরণ অধিকারী।

ঐতিহাসিক সন্দর্ভ।

ভূত ঘটনাবলীর পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনাকে ইতিহাস বলে। বিশ্বসনীয় লিখিত বৃত্তান্ত ব্যতীত ইহার উপকরণ সংগ্রহের আরও কতিপয় উপায় আছে। যথা—

১ম, লোকপরম্পরাগত বার্ত্তা। লিপি কার্য্যের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে মনুষ্য পিতা, মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরুর নিকট সমস্ত বিষয়ের উপদেশ লাভ করিতেন। সেই সমস্ত উপদেশরত্ন লিপিকার্য্যের আবিষ্ক্রিয়ার পর একত্র সম্বদ্ধ হয়। তৎসমস্ত আমাদের দেশে 'শ্রুতি' শব্দে অভিহিত।

২য়, ঐতিহাসিক মহাকাব্য। আমাদের সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত এবং উরুপাখণ্ডের 'ইলিয়দ' ও 'ঔদিসি' এই প্রকৃতির গ্রন্থ।

৩য়, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও প্রাচীন নগরাদির ধ্বংসাবশেষ। যথা—অশোক নৃপতিকৃত স্তম্ভাবলী, 'ইলোরা' ও এলিফ্যাণ্টার বৌদ্ধ-মন্দির, মিসরের পিরামিড্ এবং অযোধ্যা, হস্তিনা, কার্থেজ, ট্রয় ও ব্যাবিলনাদির ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি।

৪র্থ, মুদ্রা। ইতিহাস সংরচনে ইহার বিশেষ উপযোগিতা।

৫ম, তাম্র ও প্রস্তর ফলকাদি। ইহাও প্রাচীন কালের প্রাচীন বৃত্তান্ত সংকলন-পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর। আর্য্য নৃপতি-

বৃন্দ ব্রাহ্মণাদিকে ভূসম্পত্ত্যাদি দানকালে অগ্রে তাঁহাদের পিতৃপিতামহ পশ্চাৎ তাঁহাদের সবিশেষ বৃত্তান্ত খোদিত করিয়া ঐরূপ তাম্র বা প্রস্তরফলকাদি ভূগর্ভে নিহিত করিতেন. কালে সেই সমস্তই আমাদের হস্তগত হইয়া ইতিহাস প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতেছে। এবম্বিধ বিবিধ উপায় ইতিহাস প্রণয়নে প্রধান উপযোগী এবং পৃথিবীর অনেক স্থলেই পাওয়া গিয়া থাকে।

ইতিহাস, প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; প্রাচীন ও আধুনিক। পৃথিবী সৃষ্টি হইতে খৃষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত কাল প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্গত। তাহার পর সমস্তকাল আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্ভূত। ইহা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মত। ইহাদের মধ্যেও এ বিষয়ে মত-ভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, (৪৭৬ খৃঃ পূঃ) রোমরাজ্যধ্বংসের পর হইতে আধুনিক ইতিহাসের কাল গণনা করিতে হইবে, এবং কাহারও মতে (৮০০খৃঃ) চারল্‌মেইন নৃপতি কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য দেশে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন হইতে ইহার গণনা করা আবশ্যক।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ইতিহাস রচনার প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ দুর্লভ। যদিও এরূপ অনুমান করা যায় যে, পূর্ব্বে একরূপ না একরূপ ইতিহাস গ্রন্থাদি এ দেশে ছিল, এবং সেই সমস্ত যবনজাতির নিষ্ঠুর উপদ্রবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এরূপ অনুমান কতদূর সম্ভব পর, স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস একরূপ দুষ্প্রাপ্য। পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি যে সমস্ত গ্রন্থে ইতিহাসের আভাস পাওয়া গিয়া থাকে, তৎসমস্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও কবিতাদেবীর আরাধনা মানসে সংরচিত। সুতরাং তদুল্লিখিত ঘটনা ও বর্ণনাবলী যে অত্যুক্তি ও অলঙ্কারদোষবিশিষ্ট হইবে, বিচিত্র কি? অতএব ঐ সমস্ত গ্রন্থ ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শনে, নিতান্ত না হউক, অনেকাংশে অনুপযুক্ত। ভুবনবিজেতা আলেক্‌জাণ্ডারের সময় হইতে এ দেশে গ্রীক্‌জাতির গতিবিধি আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে ইহার প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকল কোন না কোন জাতির ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাপার অনুশীলন করিয়া আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি। যথা—প্রথম ভাগ, মধ্য ভাগ ও বর্ত্তমান ভাগ।

কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি কাল্পনিক উপাখ্যানাদি সমস্তই জ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া থাকে যে, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কোন এক মহাপুরুষের ইচ্ছাতে সংসৃষ্ট হইয়াছিল। যদি এ কথায় কোনমতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে সেই উৎপত্তির পরবর্ত্তী সময় পৃথিবীর শৈশবকাল। মানবজীবনের আদি কালটী যেমন তাৎকালিক অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আমাদের অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া

যায়, পৃথিবীর আদি বা প্রথম ভাগের সকল বিষয়ই সেইরূপ আমাদের বুদ্ধির অগম্য; আমরা বিজ্ঞান ও যুক্তিবলে যতই অনুসন্ধান করি না কেন বর্ত্তমান সময় হইতে ইহার ৩০০০ বা ৪০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বৃত্তান্তমাত্র যথাকথঞ্চিদ্রূপে জানিতে সক্ষম হই; তাহার পূর্ব্বের বিষয় সমস্ত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পরে ইহাতে মানব-জাতির আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাহাও যে কবে ঘটিয়াছিল, তাহা ঠিক নিরূপিত হয় নাই। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, দেখিতে পাই। কেহ বলেন কেবল ৮৮০০ বৎসর হইল মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও মতে ৫৩০০ বৎসর। ইউরোপে যে মহাত্মার মত সমাদরণীয়, তাঁহার মতে ৫৮৬১ বৎসর মাত্র মানবোৎপত্তির কাল। আমাদের শাস্ত্রাদিতে মানব সৃষ্টির কাল নিরূপণ কিছুই দেখিতে পাই না। সুতরাং উপরোক্ত মত গ্রাহ্য করিলে, সেই সৃষ্টিকাল হইতে বিশ্বব্যাপী জলপ্লাবন পর্য্যন্ত সমস্তকাল ইতিহাসের প্রথম ভাগ। সকল দেশের এই কালের ইতিহাস এরূপ নানাবিধ জল্পনা ও অলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ যে সেই সমস্ত ইতিহাস শব্দের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এবং সেই সমস্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে আমাদের বর্ত্তমান মানবসমাজের কোনই উপকারের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পৃথিবীর,—ভারতের ইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন ভাগটীকে পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধ্যভাগ হইতে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা করা একরূপ যুক্তিযুক্ত। ইউরোপীয় ইতিহাসানুসারে সৃষ্টির ১৬৫৬ বৎসর পরে একটী বিশ্বব্যাপী প্লাবন হইয়াছিল। সেই সময়ে কেবল একটী মাত্র পরিবার ঈশ্বরাদেশে নৌকারোহণে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারাই পৃথিবী জনাকীর্ণ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন। এই এই জলবিস্তৃতিরূপ কাল হইতে মুসলমানদিগের দ্বারা ভারতবিজয় পর্য্যন্ত সমস্ত কালটী ভারতেতিহাসের মধ্যভাগ। এই কালের প্রধান ঘটনাবলী ভারতবর্ষে আর্য্যবংশের উপনিবেশ সংস্থাপন, সুপ্রসিদ্ধ দেবাসুরের যুদ্ধরূপ অনার্য্য জাতির সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদা বিগ্রহ, বৈদিক ও মানবধর্ম্ম প্রচার, দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি, রামায়ণ ও মহাভারত প্রচার, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আবিষ্কার।

মুসলমানদিগের ভারত বিজয় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কালটী ভারতেতিহাসের বর্ত্তমান ভাগ। এই কাল মধ্যে আর্য্য স্বাধীনতা বিলোপের সূত্রপাত হয়, যবনরাজপতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীন হইতে আরম্ভ হয়, মহাত্মা চৈতন্য নূতন প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়, ইউরোপীয় বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়ক যবনরাজ্য বিধ্বংস ও ইংরেজাধিকার সংস্থাপিত হয়,

এবং ইহাদের সুশাসনে গঙ্গাসাগরে সন্তান প্রক্ষেপ ও সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজী উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের সহিত বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক পুস্তক, সাহিত্য ও সংবাদপত্রের প্রচার, সকল প্রদেশে বাষ্পীয়শকট ও তাড়িদ্বার্ত্তাবহের সুবিস্তার, বৈদিক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন, বিধবাবিবাহ প্রচলনে উদ্যোগ, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদানে অসাময়িক ব্যাকুলতা, এবং চিহ্নিত রাজপদ লাভ কামনায় সাগর বক্ষঃ ভেদ করিয়া ম্লেচ্ছদেশে গমন ও অবস্থানাদি এই ভাগের প্রধান কার্য্যাবলী।

শ্রীউ:—

আর্য্যেতিহাস।

৮ম পরিচ্ছেদ।

(১ম পর্ব্বের ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

নীতি বিষয়ক।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু। ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও মনুষ্যের অনুগামী হয়, অন্য সকলই শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর্য্য জাতি ধর্ম্মনীতির একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন। কোন অলঙ্ঘনীয় কারণেও ধর্ম্মনীতি বিগর্হিত কার্য্য তাঁহারা করিতে ভাল বাসিতেন না। ধর্ম্মনীতি তাঁহাদিগের সময়ে যেরূপ লব্ধপ্রসর ও উপচীয়মান হইয়াছিল, এমন কাহারই সময়ে ঘটে নাই। বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি আর্য্যজাতির একমাত্র চালক ছিল। তাঁহারা নীতির অনুরোধে অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতেন, তথাপি নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সাহসপর হইতেন না। তাঁহারা কহিতেন, (১) পরলোকে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি কেহই সহায় হয়েন না, কেবল ধর্ম্মই সহায় হইয়া থাকেন। এই বাক্য নিতান্ত গভীরার্থ পূর্ণ ও বহুমূল্য, সন্দেহ নাই। স্ত্রীপুত্রাদির অনুরোধে ধর্ম্মনীতিনিন্দিত কার্য্য করিলে পরিত্রাণ নাই। মহাত্মা মনু একস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, (২) পিতা মাতা বৃদ্ধ হইলে এবং ভার্য্যা সাধ্বী ও পুত্র শিশু হইলে তাঁহাদিগের ভরণপোষণার্থ শত শত অসৎকার্য্য করিবে, তথাপি তাহাদিগের প্রতি প্রতিপালকতা ভাবের ব্যত্যয় করিবে না। এই স্থানে অন্য প্রতি প্রসব বচন দ্বারা এবং টীকাকার প্রভৃতির যথার্থ ব্যাখ্যায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের কার্য্যরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াও পরিবার প্রতিপালন করিবেক। ফলতঃ আর্য্যজাতির ধর্ম্মবন্ধন কোনক্রমেই শিথিল হইত না। অন্য এক স্থানে আছে, (৩) জীব একাকী উৎপন্ন হয়, একাকী লয় প্রাপ্ত হয়, একাকীই আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল-

---

(১) "নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥"

(২) "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥"

(৩) "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতং॥"

ভোগ করে। এই জন্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। বিনা ধর্ম্ম সঞ্চয়ে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। (৪) অতএব আপনার সাহায্যের জন্য স্তোকশ, ধর্ম্ম অবশ্যই সঞ্চয় করিবেক। কেবল ধর্ম্মরূপ সহায় দ্বারাই পাপরূপ ঘোর অন্ধকার পার হওয়া যায়। চিন্তাশীলতার বিশুদ্ধ ফল আর্য্যজাতি বিশেষ অবগত ছিলেন। যে ব্যক্তি বিবিক্তে দীর্ঘকাল চিন্তা দ্বারা কোন বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই মহান্ ব্যক্তি। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, (৫) একাকী নিভৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বকীয় হিত চিন্তা করিবেক। একাকী চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্য শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়। ক্ষণিক পার্থিব সুখে চিরকাল মগ্ন থাকা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চিরকাল মায়ার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহকে দুর্ব্বল করা কখনই ন্যায়োপেত নহে। অবিনশ্বর আত্মার নিত্যতা নাই ভাবিয়া মায়াবিহ্বল হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। কথিত হইয়াছে (৬) যাদৃশ কোন পথিক বৃক্ষের ছায়া অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিয়া থাকে এবং শ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে, প্রাণীদিগের সমাগমও তদ্রূপ। তাঁহারা জানিতেন যে, (৭) যৌবন, রূপ, জীবন, ধনসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়সম্ভাষ সকলই শারদজলধরচ্ছায়াতুল্য অস্থির। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতে কখনই মুগ্ধ হয় না। ধর্ম্ম নাই, এই কথা যাহাদিগের বিশ্বাসের চালক, ও যাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগের কখনই সুখলাভ হয় না। কোন মহাত্মা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, (৮) ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা মহাধর্ম্মশীল লোকদিগকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা ধর্ম্মে বদ্ধমৎসর, ধর্ম্মের মহোচ্চভাব যাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না, তাহারাও বিশেষ পাপী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। (৯) যে সকল মায়াবিভ্রান্ত-চিত্ত ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর-

(৪) "তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥"

(৫) "একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ। একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥"

(৬) "যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্বদ্‌ভূতসমাগমঃ॥"

(৭) "অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ। ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সম্ভাষো মুহ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ।"

(৮) "ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে। অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"

(৯) "যে তু ধর্ম্মা ন সূয়ন্তে বুদ্ধি-

বশ হয়, তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে। এবঞ্চ যাহারা তাহাদিগের অনুগামী হয়, তাহারাও পীড্যমান হইয়া থাকে। আরও কথিত হইয়াছে যে, (১০) যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরের বিরোধী, তাহা কখনই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা কখনই অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় না। (১১) এই সকলের মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ: যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ; আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম এবং অন্ধকার। ধর্ম্মের ভিত্তি সত্যরূপ পত্তনের উপরি স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ব্যতীত যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত হইতে পারে না। ধর্ম্মের গৌরব সত্যের জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশমান হয়। ধর্ম্মের গুরুভার সত্য-তুলাদণ্ডের পরিমেয় না হইলে তাহা কখনই উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাবের সহচর হইতে পারে না। পৃথিবীতে আর্য্যজাতি যতদূর সত্যের আদর বুঝিতে পারিতেন, এমন কোন জাতিই পূর্ব্বকালে পারিত কি না, সন্দেহ। আর্য্যজাতি সত্যপ্রকাশ, সত্যাশ্রয়, সত্যরূপ তরণি দ্বারা সংসার-সমুদ্র পার হইতেন। তাঁহারা দৃঢ়শ্রদ্ধাপ্রযোজিত হইয়া সত্যকে সকল কর্ত্তব্য বিষয়ে পরিচালক মনে করিতেন। এই জন্য ঋষিগণ কহিয়াছেন যে, (১২) মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটী দেহমধ্যে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মানবগণ মোহ পরিচালিত হইয়া মৃত্যু ও সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে।

সময় প্রতীক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সত্য লাভ করিবে, ইহা অতি ঘৃণ্য কথা। তদ্দ্বারা অভিলষিত সিদ্ধি হওয়া দূরে যাউক, বরং সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। কারণ (১৩) মৃত্যু মনুষ্যকে প্রতীক্ষা করে না। অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মসাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল কালেই শোভা পায়। যাহা কর্ত্তব্য থাকে অদ্যই সাধন করিবে, কাল প্রতীক্ষা করিবে না। কাল প্রতীক্ষা দ্বারা কার্য্যসাধন আকাশ কুসুমের ন্যায় বিফল হইয়া

মোহান্বিতা নরাঃ। অপথা গচ্ছতাং তেষামনুগন্তাপি পীড্যতে।"

(১০) "ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ। অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রমঃ।"

(১১) "তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মঃ যো ধর্ম্মস্তৎ সুখমিতি তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যোঽধর্ম্মস্তত্তমো যত্তমস্তদ্দুঃখমিতি।"

(১২) "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতং। মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতং।"

(১৩) "ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষ্যতে। সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে।"

থাকে। (১৪) রিপু সকলকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে। নতুবা অবিজিতরিপু ব্যক্তিরা সকল বিষয়ে অনুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। (১৫) যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ, কপটতারূপ প্রসক্তি বশীভূত করিয়া, ইহা ধর্ম্ম, এইরূপ জ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়, তাঁহারাই শিষ্টগণের সম্মত শিষ্ট লোক। ইন্দ্রিয়জয় ব্যতিরেকে কখনই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, (১৬) তুমি ইন্দ্রিয় জয় কর, অবশ্যই পৃথিবী লাভ করিবে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, (১৭) আপনি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশ করিলে, কাহা কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে হয় না। বস্তুতঃ ইহা অতি সসার বাক্য। যিনি ইন্দ্রিয়বশীকরণে অসমর্থ, তিনি প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য নাম ধারণের অযোগ্য।

অধ্যবসায়।

আর্য্যজাতি অতিশয় অধ্যবসায়শীল ও উদ্যোগপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা অধ্যবসায় দ্বারা সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। অধ্যবসায়শীলতা তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যের অমোঘ শস্ত্র স্বরূপ ছিল। এইজন্য কথিত হইয়াছে যে, (১৮) কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও তথাপি কার্য্য করিতে বিমুখ হইবেক নাই। কারণ যে পুরুষ নিত্য কর্ম্মারম্ভশালী তাহাকে শ্রী সেবা করিয়া থাকে। চাণক্য কহিয়াছেন যে, (১৯) মনুষ্য অজর ও অমরের ন্যায় বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক। এই কথা একান্ত অধ্যবসায়শীল আর্য্যজাতির মুখেই শোভা পাইত। প্রকৃত পক্ষে দুরূহ করিতে হইলে অধ্যবসায় ব্যতীত কখনই কার্য্য সাধন হয় না। নিরন্তর চেষ্টা ও অধ্যবসায় জনিত অশ্রান্তিই কার্য্য সাধনের অনুকূল উপায়। যদিও চিরকাল চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ দুষ্কর হয়, তথাপি চেষ্টা করিবেক। প্রথমে ধনসম্পত্তির নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে আপনাকে অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। চেষ্টা সাধীয়সী না হইলে কখনই সুফল প্রত্যাশা করা যায়

---

(১৪) "অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো মা ত্বাং কালোঽত্যগাদয়ং। অকৃতেষ্বেব কার্য্যেষু মৃত্যুর্বৈ সম্প্রকর্ষতি॥"

(১৫) "কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা দম্ভং লোভমনার্জ্জবং। ধর্ম্ম ইত্যেব সন্তুষ্টাস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ॥"

(১৬) "জিতেন্দ্রিয়শ্চ বসুধাং প্রাপ্স্যসীতি চ মেঽব্রবীৎ॥"

(১৭) "আত্মনা চাত্মনঃ পঞ্চ পীড়য়ন্নানুপীড্যতে॥"

(১৮) "আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ। কর্ম্মাণ্যারভমানং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে॥"

(১৯) "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

না। এজন্য বিজ্ঞ বুধমণ্ডলী তারস্বরে কহিয়াছেন যে, (২০) কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কোন কারণে শ্রমজনিত কার্য্যের ফলপ্রাপ্তি না হয়, তবে নির্ব্বিণ্ণ হইবার আবশ্যক নাই। আর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, (২১) যিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে কার্য্য সাধনের ইচ্ছা ও তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন ও কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, তিনিই যথার্থ কার্য্য ভাবজ্ঞ পণ্ডিত। সর্ব্বদা অবহিতচিত্তে কার্য্য সাধনের জন্য ব্যগ্র হইবে। সুসময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া যাহাতে শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন হয়, তাহার উপায় চিন্তা করিবেক। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষিপ্র হস্ততা প্রদর্শন না করিলে কোন কালেই অভীপ্সিত সিদ্ধি হয় না। (২২) উত্থিত হইবে, জাগরিত হইবে, এই রূপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবেক। এতাদৃশ স্থির করিয়া অব্যর্থচিত্তে মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে। মহানীতি বিশারদ চাণক্য পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে, উদ্যোগকর, অবশ্যই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। নতুবা আলস্য প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া নীরব থাকা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। (২৩) উদ্যোগ দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয়, কেবল, করিব, এরূপ মনন করিলে কার্য্যসাধন হয় না। মৃগ কিছু প্রসুপ্ত সিংহের মুখে আহার স্বরূপে উপস্থিত হয় না। অন্যত্র এক স্থানে কথিত হইয়াছে যে, (২৪) যিনি পৃথিবীতে সম্পত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী অর্থাৎ নিরন্তর নিদ্রা পারবশ্য, কার্য্যবৈমুখ্য, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পার্থিব উন্নতি ও বাহ্য সম্পদ্ পুরুষকারবিহীন মানবকে কখনই আশ্রয় করে না। এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। পঞ্চতন্ত্রকার ও হিতোপদেশকর্ত্তা কহিয়াছেন যে, (২৫) যিনি উদ্যোগবান্ তিনিই পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাকেই শ্রী নিঃসংশয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া

(২০) "অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো দৃশ্যতে ফলং। নহি নির্ব্বেদমাগম্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি শোভনা॥"

(২১) "যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্ব্বতে। ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥"

(২২) উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতিকর্ম্মসু। ভবিষ্যতীত্যেব মনঃ কৃত্বা সততমব্যথৈঃ॥"

(২৩) "উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ। নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

(২৪) "ষড়্দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা। নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥"

(২৫) "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দ্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

থাকে। পুরুষকারবিহীন কাপুরুষেরাই বলে যে, সকলই দৈব দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৈবপ্রাপ্তি আলস্যপর নিষ্কর্ম্মাদিগের প্ররোচন বাক্য। অতএব দৈবকে বিনাশ করিয়া, নিজ যত্ন প্রকাশ কর, যত্নের দ্বারা অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক, সন্দেহ নাই। যদি কোন বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াও কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তবে কোন বিষয়ে দোষ নাই। অন্যত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, (২৬) সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়, আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। মঙ্গল ও বিদ্যা কেবল দক্ষ ব্যক্তিতেই চিরাবস্থান করে। (২৭) যিনি সর্ব্বদা আলস্যদাস হইয়া জীবন যাপন করিতে অধিক প্রীতি প্রাপ্ত হন, লক্ষ্মী কখনই তাঁহাকে অনুকূল দৃষ্টিপাত দ্বারা সুখিত করেন না। দক্ষ ব্যক্তি আপনার কার্য্যের সুনিশ্চিত ফল লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন। (২৮) এই শ্লোকটী অধ্যবসায়ের প্রচুর শক্তির দৃঢ়ীকরণ পক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আত্মহিতজনক অপরাহ্ণ-কর্ত্তব্য কার্য্য অদ্যই পূর্ব্বাহ্ণে সম্পাদন কর। কারণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি না, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না। (২৯) আর কার্য্যসিদ্ধ হউক বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমুদায় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ হয়। (৩০) কার্য্যের প্রধান অঙ্গের অভাব থাকিলে কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল হয় না। হয় ত একবারেই কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু কর্ম্ম আরব্ধ না হইলে ফল বা শৌর্য্যাদি কোন গুণই দৃষ্ট হয় না। অধুনা অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন শ্রুত হওয়া যাইতেছে। (৩১) যিনি অগ্রে নিশ্চয় করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, কার্য্য সম্পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, মুহূর্ত্তকালও যাঁহার বৃথায় যায় না, তিনিই পণ্ডিত।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মযত্নং যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

(২৬) "সুখং দুঃখান্তমালস্যং দুঃখং দাক্ষ্যং সুখোদয়ং। ভূতিস্ত্বেবং শ্রিয়া সার্দ্ধং দক্ষে বসতি নালসে॥"

(২৭) "অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরং। নিঃসংশয়ং ফলং লব্ধা দক্ষো ভূতিমবাপ্নুতে॥"

(২৮) "স্বকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং॥"

(২৯) "সিদ্ধির্ব্বাপ্যথবা সিদ্ধিরপ্রবৃত্তিরতোঽন্যথা। বহূনাং সমবায়ে হি ভাবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ঃ॥

(৩০) "গুণাভাবে ফলং ন্যূনং ভবত্যফলমেব চ। অনারম্ভে তু ন ফলং ন গুণো দৃশ্যতে ক্বচিৎ॥"

(৩১) "নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্বসতি কর্ম্মণঃ। অবন্ধ্যকালো বশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥"

দান।

বেদে কথিত হইয়াছে যে, "দাতা শতং জীবতু" দাতা ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকুন। অন্যত্র কথিত আছে যে, (৩২) যে ব্যক্তি জীবিত থাকিলে বহু ব্যক্তি জীবিত থাকে, তিনিই জীবিত থাকুন। নতুবা কাকও কি চঞ্চু দ্বারা আপনার উদরপূরণ করিতে পারে না? অন্যত্র কথিত হইতেছে যে, (৩৩) হে যুধিষ্ঠির! দরিদ্রদিগকে পোষণ কর। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকে ধন দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরই ঔষধ পথ্য, নীরোগ ব্যক্তির ঔষধেতে প্রয়োজন কি? (৩৪) কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে উহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া যথাশক্তি দান করিবে। ইহা হইলে দাতার নিকট কখন যথার্থ দানের পাত্র উপস্থিত হইতে পারে। যাহাকে দান করিলে দাতা যথার্থ দানজনিত পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন। অধুনা দানের অবস্থা ভেদে ভিন্নত্ব উক্ত হইতেছে। কাহারও নিকটে গিয়া তাহার প্রীতির নিমিত্ত যে দান, তাহাকে শ্রেষ্ঠদান কহা যায়। কেহ প্রার্থনা করিলে যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে মধ্যম দান কহে। অপর মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, (৩৫) পানীয়ই সকল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বত্র পানীয় সৌলভার্থে তড়াগাদি খনন করা উচিত। হিতোপদেশকর্ত্তা কহিয়াছেন যে, (৩৬) যাঁহারা সকল লোকের আশ্রয়ভূত তাঁহারাই স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যিনি দানজনিত তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, দান কি অপূর্ব্ব মনস্তুষ্টিকর। জীবনের মধ্যে দানই প্রথম কর্ত্তব্য।

(৩২) "যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতু। কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণং॥"

(৩৩) "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং। ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

(৩৪) "যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতে নানুসূয়য়া। উৎপৎস্যতে হি তৎ পাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ॥"

(৩৫) "পানীয়ং প্রথমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ। তস্মাৎ কূপাংশ্চ বাপীশ্চ তড়াগানি চ খাতয়েৎ॥"

(৩৬) "সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥"

গোঁড়া।

সমাজের অবস্থা ভেদে ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে লোকের মনের ভাব ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রকাশক শব্দসমূহের অর্থের পরিবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে

গোঁড়া শব্দে গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমান বুঝাইত অর্থাৎ যাঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বিত ধর্ম্মনীতিতে আস্থা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, প্রত্যুত অন্যাকে স্ববিরুদ্ধ-মতাবলম্বন হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার অত্যাচার করিতেন। নব্য শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী হিন্দু বৃদ্ধদিগকে গোঁড়া বলিতেন। এখন গোঁড়ামীর ভাব-পরিবর্ত্ত হইয়াছে। শিক্ষিতগণ দলে পুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের মান ও ক্ষমতা এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক প্রাধান্য লাভ দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতেছে। পক্ষান্তরে প্রাচীনের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। তাহারা স্বগৃহে ও পরগৃহে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আচার ব্যবহারের প্রভাব দেখিয়া কেহ হতাশ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লইয়াছেন, কেহ বা উহার উৎকর্ষ অনুধাবন করিয়া সম্পূর্ণরূপে উহার অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে সাবেক গোঁড়াগণ আর গোঁড়া নহেন। কিন্তু এক্ষণে অপর একদল গোঁড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা আপনাদিগের অবলম্বিত মতের একান্ত বশবর্ত্তী অর্থাৎ সময় বুঝিয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিস্তার করিতে পারে না, তাহাদিগকে বর্ত্তমান সময়ে গোঁড়া কহে। ভাব, হরিদাস শর্ম্মা মদ খান না, কিন্তু দলে মিশিয়া এক আধ গেলাসে আপত্তি করিল না, তবে তিনি গোঁড়া নহেন। কিন্তু যদি ইয়ারকির সময়ে নবরত্নের অন্যতম রত্ন না হইতে পারিলেন, তবে তিনি গোঁড়া, তিনি ভট্চাযিৎর অধম। এটী উদাহরণ স্বরূপ বলিলাম। এমন অনেক আছে। বিবেচনা করুন রামভদ্র বিধবাবিবাহের সপক্ষ। কিন্তু দৈববশাৎ তাঁহার কন্যা বিধবা হইল। তিনি যদি উহার বিবাহ দিলেন, তবে তিনি গোঁড়া; যদি তাহা না করিয়া কোন অলীক বা সামান্য কারণ প্রদর্শন করিয়া আপন অন্তরাত্মাকে প্রতারণা করিতে ও বন্ধুগণকে শান্ত রাখিতে পারিলেন, তবে তিনি একজন চালাক লোক ও সংসারের মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া সুখ্যাতি লাভের যোগ্য।

এরূপ ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশ নিতান্ত ক্লেশ সাধ্য নহে। বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলী অতি অল্পকাল মাত্র আহার বিহার বিষয়ে চিরাগত আচার ব্যবহারের শৃঙ্খল ভেদ করিয়াছেন। এমন কি যে শিক্ষাবান্, তাহারা এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহা এখনও সমাজের অধোগত স্তর সকলে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং উপরিতম স্তরেও উহার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রবেশ সংসাধিত হইয়া উঠে নাই। এখনও পিতা, মাতা ও কুটুম্বগণের বিলক্ষণ খাতির রাখিয়া চলিতে হয়। আহার বিহারাদি বিষয়েও সকলে সকল সময়ে আপনার রুচির অনুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং দুই একজন ঈশ্বরের বিশেষানুগৃহীত পুরুষ ব্যতিরেকে সকলকেই এক প্রকার কপট ব্যবহার শিক্ষা করিতে হয়।

ফলতঃ পিতা মাতার নিকট একরূপ, স্ত্রীর নিকট একরূপ, কলেজ সঙ্গিগণের নিকট একরূপ; এইরূপে এক ব্যক্তিকে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হয়। এই বহুরূপীর সংখ্যা যে সমাজে অধিক সেখানে যথার্থ সরলতা সমুচিত সম্মান ও পুরস্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ যেখানে সামাজিক কোন প্রকাশ্য ও আশুভাবী অশুভের আশঙ্কা নাই, সেইখানেই লোকে সরল ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই, বিবেচনা করেন। সে যাহা হউক, অনায়াসে কারণ নির্দ্দেশ করা যায় বলিয়া দোষের দোষত্ব যায় না। যে দোষ সে দোষ। তাহার কারণ যতই প্রবল হউক ও যতই সমাজের অন্তর্বাহীন অবস্থার সহিত নিত্য সম্বন্ধ হউক না কেন, যাঁহার ব্যবহার ঐ দোষে আক্রান্ত হইবে, তিনি দোষী। এই সামান্য বিষয় এত অধিক লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লোক মনে করেন, সামাজিক দোষের কারণ দর্শাইতে পারিলেই তদ্দোষাবলম্বিগণ আর নিন্দা বা অপযশের ভাগী হইতে পারেন না। ফলতঃ এটী বিষম ভ্রম।

আমি প্রকৃত লক্ষ্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুতঃ এই প্রস্তাবের উল্লিখিত গোঁড়াগণ নিন্দার পাত্র না হইয়া প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র হওয়া উচিত। সরল ব্যবহার ও সত্যপরায়ণতা সামান্য বিষয় সম্বন্ধেই হউক আর গুরুতর বিষয় সম্বন্ধেই হউক প্রশংসার বিষয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে যিনি কোন গুরুতর বিষয়ে সত্যের অনুরোধে ও সরল ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাত বশতঃ গুরুতর স্বার্থ ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি বিশেষ আদরের ও সম্মানের পাত্র, সন্দেহ নাই। মতের স্থিরতা ও গুরুতর প্রমাণ বিরহে মতের সঙ্কোচ না করা পুরুষত্বের লক্ষণ। আমাদের জাতীয় স্বভাবে ঐ পুরুষত্বের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। যাহাতে ঐ অভাব দূরীভূত হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় স্বভাব সম্পূর্ণাবয়ব. প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ চেষ্টা থাকা উচিত। ঐ পুরুষত্বের অভাবে আমরা স্বর্ণগর্ভা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে বসিয়া নানা দুঃখভোগ করিতেছি। ঐ পুরুষত্বের অভাবে আমরা বাঁদরের ন্যায় বিদেশীয় প্রভুদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের উদার গুণরাশির গ্রহণে অশক্ত হইয়া দোষসমষ্টি পরিগ্রহ করিতেছি। এই পুরুষত্বের অভাবে আমরা উন্নতিশীল সভ্য জগতের অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাতসার থাকিয়া অসারের ন্যায়, জড়ের ন্যায় সকলের পশ্চাৎ পতিত রহিয়াছি। ফলতঃ ভোগলালসা দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। সুবুদ্ধি সুশিক্ষিত কত কত ব্যক্তি সংসারে প্রবেশ করিয়া মতের স্থিরতা ও চরিত্রের দৃঢ়তাবিরহে অসার অলীক আমোদে মত্ত হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষিত শরীর ব্যয়ে উপার্জ্জিত পবিত্র ভাব সকল একেবারে উৎসর্গ দিতেছেন। এক্ষণে আমাদের সমাজে যত

গোঁড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, ততই মঙ্গল। যখন বঙ্গবাসিগণ আমাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া দুর্ব্বল ভাবুকতায় বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের নামে সরলতার নামে উন্মত্ত হইবেক, যখন "ওপিনিয়ন ও প্রিন্সিপল্" বাড় মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া লেক্চর, স্পীচ্ বা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিধুনিত না হইয়া বঙ্গবাসিগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইবে, জীবনের অভ্যন্তরীণ মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবেশ ও পরিব্যাপ্ত করিবে, তখনই বঙ্গদেশের যথার্থ উন্নতির সোপান পরিষ্কৃত হইবে, তখনই ইংরাজী শিক্ষার ও ইংরাজ সঙ্গের সুফল ফলিবে। এ সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। খৃঃ ১৫০০ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে "পিউরিটান" নামক এক দল লোকের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা প্রাণান্তে ও আপনাদের মতের বা ধর্ম্মের সঙ্কোচ করিতেন না। দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত, তথাপি ধর্ম্মজ্ঞানের বা কর্ত্তব্য বুদ্ধির বিপরীত কোন কার্য্য করিতেন না। ক্রমওএল হম্পোডন প্রভৃতি ঐ দলের অলঙ্কার ছিলেন। ইংলণ্ডীয় স্বাধীনতা ও ইংরেজদিগের রাজনৈতিক প্রাধান্য ঐ সকল লোক দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এবং এই শ্রেণী সুজনগণের বংশধরেরা উত্তরকালে তদীয় ধর্ম্মনৈতিক মতসমূহের উত্তরাধিকারী হইয়া আমেরিকার নিবিড় অরণ্যানি ও বিস্তীর্ণ প্রেরী সমূহকে মনুষ্যের আবাসযোগ্য ও সভ্যতা ও স্বাধীনতার সুখের নিকেতন করিয়া তুলিয়াছেন।

মহাত্মা মনুর গুণাবলী

"মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্ভেষজতায়াঃ"

'মনু' এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্রই অনেকগুলি মহাজনকে বুঝায়। তন্মধ্যে মানবধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহার প্রণীত, তিনিই এই প্রস্তাবের অভিধেয়। উপরিভাগে যে সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোক লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ এই 'মহাত্মা মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বৈদ্যের ঔষধ স্বরূপ।, বস্তুতঃ এই মহার্হ বাক্য মহামনা মনু সম্পূর্ণরূপে অন্বর্থ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অশেষজ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ, ঋষিগণ নানাবিধ দুরবগাহ বিষয় মনুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনিও স্বীয় অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে সকল বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানগর্ভ সদুত্তর প্রদান করিয়া জগতের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। পারমার্থিক বিষয়ে ঋষিদিগের জ্ঞান, চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে বটে, কিন্তু কুটিল রাজনীতি শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। রাজনীতি শাস্ত্রে প্রাচীনতমকালে

মনুর ন্যায় লোক ছিল কি না, সন্দেহস্থল। মনু যথার্থতঃই সতেজ বুদ্ধির বীজ লইয়া অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মানব-ধর্ম্ম শাস্ত্রে মানবকুলের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। এই ধর্ম্মশাস্ত্র বিস্তীর্ণ সমুদ্রের সহিত তুলনীয়, ইহাতে অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে। এমন অনেক রত্ন আছে, যাহার মূল্য নির্ণয় সুসভ্যতম ঊনবিংশশতাব্দীতেও হওয়া সহজ নয়। ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞতার গৌরব কেবল মনুর দ্বারাই সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজনীতিবিশারদ মহাশয়গণ মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রের রাজনীতি প্রকরণের নিকট বহুধা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এই মানব-ধর্ম্ম শাস্ত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক অধ্যায় এক এক বিষয়ের প্রশ্নোত্তর ও মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায় মুনি সকল, সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মনুকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম জলসৃষ্টিবিষয়ে মনু যাহা কহিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান প্রাকৃতভূগোলবেত্তাদিগের মতের অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না, বরং সর্ব্বথা সামঞ্জস্য ভাবই প্রতীত হয়। মনু বলিয়াছেন অগ্রে জলই সৃষ্ট হয়। অনন্তর জল হইতে অন্যান্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের সৃষ্টিবিষয়ে জলই বীজস্বরূপ বলিতে হইবেক। এই পরিশুদ্ধ ভবিষ্যমত, কত আদরণীয়, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। ধর্ম্ম বিষয়ে অদ্বৈতবাদ মনুর মতানুসারী ছিল। তিনি এক মাত্র পরব্রহ্মকেই প্রকৃত ঈশ্বরশব্দে নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনুর মত এই, যিনি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের অগোচর, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন সর্ব্বভূত-ব্যাপী ও অচিন্ত্য, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহাকে জানিলে কোন ক্লেশ থাকে না, এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন জীবের জ্ঞেয়। মনুকৃত 'নারায়ণ, শব্দের অর্থও বড় প্রীতিকর। তিনি 'নার' শব্দে জল ও 'অয়ন' শব্দে আশ্রয়। সুতরাং যিনি প্রথমে জল মাত্র আশ্রয় করিয়া বিশাল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্রষ্টা ও ঈশ্বরপদবাচ্য।

যুগধর্ম্মাদিবিষয়ে মনুর বহুজ্ঞতা বিশেষ আনন্দদায়িনী। প্রথমাধ্যায়ে এতদ্ভিন্ন যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ব বিষয়ের সম্যক্ উপযোগিতা না থাকায় পরিত্যক্ত হইল। দ্বিতীয়াধ্যায়ে বেদমূলক ধর্ম্মই ধর্ম্ম। এই বিষয়ে মনু যাহা অভিপ্রায় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মনু মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, মনূক্ত ধর্ম্ম বেদের অনুগামী। বেদমূলক সনাতন ধর্ম্মে মনুর প্রকৃত শ্রদ্ধা ছিল। নাস্তিক্যবিষয়ে মনু নিতান্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। এজন্য দ্বিতীয়া-ধ্যায়ে নাস্তিকনিন্দানামক একটী প্রকরণ আছে। যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র (তর্ক শাস্ত্র) অবলম্বন দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ সমুদ্ভাবন করেন, তাঁহাকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিবে। সমাজবন্ধন, ইহা দ্বারা শিথিলীভূত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অপর এই অধ্যায়ে অন্য এক স্থানে কহিয়াছেন

যে স্মৃতির সহিত শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গুরুতর জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কারণ স্মৃতি, বেদের অর্থগ্রাহী মুনিসমূহ দ্বারা নিজ নিজ রুচির আদর্শে গঠিত হইয়াছে। রুচির বিভিন্নতায় মতের অনৈক্য হইবে, বিচিত্র কি? বস্তুতঃ যে বেদ ভারতের সমস্ত শাস্ত্রের অস্থিভূত, যাহা হইতে প্রাচীনতম, অদ্যাপিও পরিদৃষ্ট হয় নাই, অথচ যাহাতে মনুষ্যবুদ্ধির বিকাশাবস্থা হইতে উন্নতাবস্থা পর্য্যন্ত সপ্রমাণ হয়, তাহার সহিত সমাদরবিষয়ে তুল্যতা লাভ স্মৃতির ভাগ্যে না ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ স্মৃতি শাস্ত্রে অস্বাভাবিক ও অবিচারিত অনেক বিষয়ের শাসন ও উল্লেখ আছে। তাহাতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা উপকারিতা লাভ সম্বন্ধে প্রত্যাশা অতি অল্পই করা যাইতে পারে। যে সময়ে স্মৃতি ভারতসমাজে অতি প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, তখন সমাজ নিতান্ত নির্বীর্য্য ও হতশ্রীক ছিল। স্মৃতিতে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, সমাজ কখনই তাহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেক নাই। অযথা আক্রমণ দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র, সমাজে হস্তক্ষেপণ করিলে সমাজের কত উন্নতি তিরোহিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ স্মৃতিমীমাংসাকারক মহাশয়েরা অনেকে অন্ধিতদৃষ্টি হইয়া প্রলাপ বাক্যে বিস্তর অশ্রদ্ধেয় বিষয় স্মৃতির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বহু অনুসন্ধান করিলেও তন্মধ্যে বৈদিক রীতি নীতির বা বৈদিক আচার ব্যবহারের কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ স্মৃতির ভাগ্য আবার এমন মন্দ যে, তিনি সর্ব্বদেশে সমানরূপে আদর প্রাপ্ত হন নাই। কোন দেশে রুচিভেদে তিরস্কৃত কোন দেশে বা আদৌ আদর প্রাপ্ত হন নাই। পৌরাণিকদিগের অনুসৃত ভাব বহন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র নিতান্ত অকর্ম্মণ্যতা প্রাপ্ত হইবে, বিচিত্র কি? মহাত্মা মনু, ভৌগলিক গবেষণায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ, মধ্যদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত, প্রভৃতি দেশ বিভাগবিষয়ে মনুর বিশেষ দূরদর্শন ছিল। তৎকৃত ভারতীয় দেশ বিভাগ-ই অন্যান্য মহর্ষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মনু, সর্ব্ববিষয়ে সুবিচক্ষণতা প্রদর্শন দ্বারা ভারত রাজ্যে অতুল্য সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম বিষয়েও মনুর অভিপ্রায় মহান্ বলিয়া গণ্য করা উচিত। প্রকৃত সিদ্ধিলাভ ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারাই হইয়া থাকে। তৃতীয়াধ্যায়ে বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মনু যে কয়েক প্রকার বিবাহের বিষয় স্বপ্রণীত সংহিতায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই সাধারণ্যে অনুসৃত হইতেছে। বিবাহবিষয়ক মত অনুদার পদ্ধতি দ্বারা ঘৃণিত না হইয়া অনেকাংশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আসুর, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, প্রভৃতি যে সকল বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা মনু বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যে বিবাহসমাজে বিশেষ ফলপ্রদ, তাহাই

মনু অনুসরণীয় মনে করিয়াছেন। ফলতঃ বিচক্ষণতা ও ধৈর্য্য-বিমিশ্রিত উদারতা মনুর হৃদয়ে চিরাধিবাস করিয়াছিল। তিনি তৃতীয়াধ্যায়ে অনেক সামাজিক বিষয়ের সুব্যবস্থার সংবিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহার সকল অংশই বিশদ, এ কথা বলা অভিপ্রায় নয়। কিন্তু অধিকাংশ বিষয় যে সামাজিক অবস্থা সংশোধনের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র। তৃতীয়াধ্যায়ের স্থানবিশেষে জলে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিচারচক্ষে দর্শন ও বিশেষ তলস্পর্শী হইলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে মানবকুলের নিতান্ত স্বাস্থ্যকর জল কখনই বিকৃত করা উচিত নয়, সাধারণ গম্য পথে পুরীষ ত্যাগ বিষয়ে অনেক দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মানবধর্ম্মশাস্ত্র সামাজিক অবস্থাকে বিশেষ উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা বর্ত্তমান সময়ে রাজবিধির দ্বারা প্রতিনিষিদ্ধ হইতেছে, অতি প্রাচীনকালে তাহা সমাজ শাসনের অন্তর্গত ছিল। স্বাস্থ্য-বিষয়ে মনুর অতি দূর দর্শন সম্যক্ পরিস্ফুট ভাবাপন্ন ছিল। এই অধ্যায়ে অতি-ভোজননিষেধনামক একটী প্রসঙ্গ আছে, উহাতে লিখিত আছে যে, অতিভোজনই অব্যাহত স্বাস্থ্য ভঙ্গের মূল। অতিভোজন দ্বারা পাকস্থলী দূষিত হয়, পাকক্রিয়া প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হয় না। এজন্য মনু বলিয়াছেন বরং অর্দ্ধাশন ভাল, তথাপি যেন অতিভোজনে পাকস্থলী বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য না হয়। স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ইহা হইতে সুকর নিয়ম আর কি হইতে পারে? অধুনা চিকিৎসাশাস্ত্র সময়-স্রোতে পতিত হইয়া বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইতেছে। মনু ব্যসন বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। মনু নিজে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল রাজ্য পালন ও রাজনীতির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এজন্য ব্যসন বিষয়ে মনুর মত আদরণীয়। মনু অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামজ আট ও ক্রোধজ দশ। মৃগয়া, পাশাক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, অসূয়া, অর্থ দূষণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা অমিত ধনশালী ব্যক্তিও দুরোদর ব্যসন অনলে সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। রাজা ব্যসনপর হইলে, রাশীকৃত অর্থ, অল্পদিন মধ্যেই ব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। দিবা-নিদ্রাদ্বারা শরীরে জরা প্রবেশ করিয়া একেবারে কর্ম্মের অযোগ্য করিয়া তোলে। যত কিছু অনিষ্ট আছে, তন্মধ্যে দিবানিদ্রাই সকল অনর্থের মূল। মহাত্মা মনু দিবা-নিদ্রাকে অচিকিৎস্য রোগের আকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নৃত্যাদি বিষয়েও তাঁহার মত অবিশুদ্ধ ছিল না। যে বিলাসিতা-প্রভাবে গ্রীশ ও রোম উৎসন্ন হইয়াছে, যাহার অনিবার সাহচর্য্যে যবন সম্রাটেরা ক্ষীণবীর্য্য হইয়া অধঃপাতে গমন করিয়াছেন, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গীয় মহাশয়গণ পরপীড়ন যন্ত্রণা নিরন্তর অনুভব করিয়া

থাকেন, সেই বিলাস বিজৃম্ভিত অতি নৃত্যাদি মনুর তুল্য পরিণামদর্শী মহাজনের নিকট যে অনাদরণীয় হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। এতদ্ভিন্ন তৃতীয়াধ্যায়ে অন্যান্য যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ গুণের সহিত প্রদর্শন করা আবশ্যক। মানসিক অনেক বিষয়ে মানব-শাস্ত্র উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মনোবৃত্তি পরিষ্কৃত হইলে বাহ্য জগতের মধ্যে যাহা কিছু দর্শনীয় ও মনোরম্য থাকে, তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতে পারে। মনোজগৎ একটী স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ। উহাতে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে প্রতি-ফলিত হইয়া থাকে, মনুর ন্যায় অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন লোকের মস্তিষ্ক-সম্ভূত মনোবৃত্তি বিষয়ক প্রস্তাব অনেক আদরণীয় হইবে। রাজনীতির সম্যক্ আলোচনা দ্বারা মনুর হৃদয় বহুল পরিমাণে উন্নত হইয়া-ছিল। নতুবা ঋষিসমাজে, পণ্ডিতসমাজে, মেধাবিসমাজে তাঁহার এত অত্যাদর কেন হইবে? আমরা ক্রমে ক্রমে মনু-প্রণীত সদর্থ-গর্ভ বিষয়-পরম্পরা যথারীতি বঙ্গীয় কৃতবিদ্য-সমাজে উপহার প্রদান করিতে থাকিব।

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

১

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে,—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

২

যদি বল, কেন বল হে এমন ?
কেন বলি ?—তার আছে যে কারণ,
কোন্ জাতি, বল, এদের মতন
অলসতা-পাঁকে ডুবিয়া রয় ?
কোন্ জাতি ছাড়ি বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা ?
কাজেতে অলস—অকাজে বচসা,
শির পাতি পর পাদুকা বয় ?

৩

শত্রু দেয় গালি,—লয় কর পাতি,
শত্রু মারে লাথি,—পেতে দেয় ছাতি !
পর পদসেবা করি দিবা রাতি,
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয় ?
কোন্ জাতি, বল, বাঙ্গালীর মত
ভাল বাসে হ'তে পর পদানত,
কলুষিত ক'রে জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?

৪

বনের বরাহ, সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু ;

নবজিলণ্ডের অসভ্য জাতিরা,
(অসভ্য কে বলে ? সুসভ্য তাহারা।)
তাদেরো জীবনে স্বাধীনতা-হীরা,
পর-পদ-পূজা করে না কভু।

৫

কিন্তু হায় হায়, কি লজ্জার কথা !
বাঙ্গালীরি সুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালীরি সুধু মনের হীনতা,
বাঙ্গালী-জীবনি কলঙ্কময় !
বাঙ্গালী জাতিরা বিহীন ভরসা,
তাই ইহাদের এত দুরদশা ;
এদের মতন কুকাজে লালসা
কাদের ? এ হেতু বলিতে হয় ;—

৬

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি ;
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

৭

একতা এদের অণুমাত্র নাই ;
তা যদি থাকিত, তা হ'লে সদাই
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত ?
একতা নহিলে কিছুই হয় না,
একতা নহিলে শকতি রয় না,
একতা হইলে হৃদয় সয় না
শত্রু পদাঘাত হইয়া নত !

৮

একটা যবন যদি রেগে ওঠে,
শতটা বাঙ্গালী প্রাণ-ভয়ে ছোটে ;
ঘুঁষির প্রহারে ভূমিতলে লোটে,
'দে রে জল' বলি কাতর হয় !
জনেক বাঙ্গালী যদি মার খায়,
শতেক বাঙ্গালী দেখি হাসে তায়,
শত্রু গালিগুলো লাগে সুধা প্রায় ;
চোকে, কাণে মনে অনাসে সয় !

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায় !
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে যায় !
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায় :—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে ?
এরাই আবার লেখনী চালায় !
এরাই আবার সুসভ্য বলায় !
এরাই আবার হুমুরি ফলায় !
গরবে ভূতল কাঁপায়ে চলে ?

১০

সাধে কি বলি ?—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে ;
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

১১

গিয়ে দেখ দেখি অর্ণবের কূলে,
কত জলযানে শ্বেত পাশ তুলে,
সাহসিক চিতে ভয় ডর ভুলে,
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে।
অন্য দূরে যাক্ ; ভারত-গরিমা
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা,
বাঙ্গালীরা তার ঘেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নতি গরব করে !!

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালীর আছে,
অবিদ্যা এবে তা বাণিজ্যের কাছে ;
অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তার পাছে,
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তার।
তবুও বাঙ্গালী—অসার বাঙ্গালী!—
(সাধে নিন্দা করি?—সাধে দেই গালি?)
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বৃথায় বহিয়া আলস্য-ভার!

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে ;
জয়ধ্বনি উঠে গগন-বিতানে,
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে ;
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরাপ্রবাহিত
বিজয় নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ, জান তো সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খেত, পূজিত ভুত!
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যেরি বলে, কে না জানে বল?
করেছে ভারতে নিজ পদতল!
বাণিজ্যেরি বলে বাঙ্গালী সকল
'নেটিব নিগর' ওদের কাছে!
বাণিজ্য প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
'রুল ব্রিটনীয়া' গগন ছাইয়া,
ছাড়িছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া ;
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে?

১৬

কিন্তু—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

১৭

অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালী না কি?
'না কি' কেন?—তার কি আছে বাকী?
পিতৃ পিতামহে দিয়াছে ফাঁকি,
বিলাতী ব্যভারে উঠেছে মাতি!
বিলাতী আসন, বিলাতী বাসন,
বিলাতী অশন, বিলাতী বসন,
সকলি বিলাতী, বাঙ্গালী এখন,
খেতে ভালবাসে বিলাতী লাথি!!

১৮

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বার মাস ;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস
বাঙ্গালী জাতির গিয়াছে মিশে!
তবে কেন আ'জো আছে ঘুমাইয়া?
আলস্য-শয়ন এখনি ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকট যাইয়া,
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে?

১৯

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালী, অনুকৃতি ছার
ভালবাসে! ছি ছি, এ কি রে বিচার!
বাঙ্গালীর এ কি বিচিত্র মতি!
বিদ্যা শিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি মজ্জা আলোড়ন করে
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি?

২০

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

২১

বাঙ্গালী ভায়ারা! করি নিবেদন,
যোড় করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ!
যা কিছু বলিনু,—ভালরি কারণ,
ভাবি দেখ মনে; করো না রাগ!
রাগ তো কর না দাসত্ব করিতে!
রাগ তো কর না পাদুকা বহিতে!
রাগ তো কর না অধীন রহিতে,
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক দাগ!

২২

এ সব করিতে রাগ যদি নাই!
আমার কথায় রেগো না—দোহাই!
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হলে!
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
নির্জ্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মন-বিহগেরে একতা পড়াও,
তা হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,—
গণনীয় হবে ধরণীতলে।

২৩

নতুবা—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

সঙ্গীত ও সদ্বক্তৃতা।

বোধ হয় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীত বিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য মনোহারিণী শক্তি আছে। সুশ্রাব্য সঙ্গীত-ধ্বনি কর্ণকুহর স্পর্শ করিয়া হৃদয় দ্বারে প্রবেশ করিবা মাত্র হৃদয় আনন্দরসে সিক্ত হইতে থাকে, অন্তরাত্মা পরম প্রীতি লাভ করিতে করিতে পরমানন্দ নীরে নিমগ্ন হইতে থাকে, ও অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম তন্তুমালা হর্ষে নৃত্য করিতে থাকে। শোক-সন্তপ্ত, ব্যাধি-নিপীড়িত এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত

মনের এমত প্রীতি-প্রদ মহৌষধ জগতে অতি বিরল। পুত্র-কলত্র-বিয়োগবিধুর ব্যক্তি মধুর সংগীতালাপ শ্রবণ করিতে করিতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত দারুণ শোকাবেগ বিস্মৃত হয়। চিররুগ্ন ব্যক্তি সংগীতামৃতরসে আপ্লুত হইয়া ক্ষণেক কাল ব্যাধির উপর প্রভুত্বলাভে সক্ষম হয়। অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ব্যক্তিও অত্যল্পকাল দুঃখাবসান—তাহার সুখ স্বপ্ন—উপভোগ করতঃ আনন্দানুভব করিতে থাকে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সংগীতের মনোহারিত্ব গুণ অত্যন্ত অধিক, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সংগীত শ্রবণকালে যে সকল মানসিক ভাবের আবির্ভাব হয়, সে সমস্ত ক্ষণকাল মধ্যে তিরোহিত হয়। যত ক্ষণ সঙ্গীত শ্রবণ করা যায়, ততক্ষণই ইহার মনোহারিত্ব গুণ হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। পরন্তু সদ্বক্তার মুখ-বিনির্গত তানলয়বিহীন বাক্যনিচয় শ্রবণ করিলে মনে যে সমুদায় ভাবের উদয় হয়, সেই সমুদায় ভাবের স্থায়িত্ব এবং তন্নিবন্ধন বিচিত্র কার্য্য-পরম্পরা অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুমধুর কোকিল-কাকলী এবং কর্ণে পিযূষবর্ষী সুকোমল বামাকণ্ঠনিঃসৃত তানলয়বিশুদ্ধ কলস্বনও মনোহারিত্ব-বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

বক্তৃতা ও কবিত্ব এই উভয়ের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। পদ্যে যাহা লিখিত হয় তাহাতেই যে কবিত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে, এমত নহে। কবিত্বের সহিত পদ্যের ও গদ্যের উভয়েরই সমান সম্পর্ক আছে। যে কোন প্রকারে মনোভাব সুচারুরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাতে কবিত্ব আছে। কবিত্ব দুই প্রকার।

১। স্বাভাবিক কবিত্ব।

২। অভ্যস্ত কবিত্ব।

স্বাভাবিক কবি সহজেই মানসিক ভাব সমুদায় প্রকটিত করিতে পারেন এবং তাঁহার কবিতা হৃদয়গ্রাহিণী হয়। মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অধিক মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয় না। অভ্যস্ত কবি যদিও কষ্টে তাঁহার মনোভাবসমূহ প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার এই গুণটী প্রাকৃতিক না হওয়াতে অনেক সময়ে অনেক স্থলেই তিনি যাবতীয় মনোভাব সমুদায় স্পষ্ট বিবৃত করিতে অক্ষম। কারণ সদা সর্ব্বদা তাঁহাকে স্বীয় প্রকৃতির সহিত এক প্রকার যুদ্ধ করিতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকারে, বক্তৃতাও প্রথমতঃ দুই প্রকারে—আবার সেই দুইটী প্রত্যেকেই দুই প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে।—

১। আইনসম্বন্ধীয় বক্তৃতা।

এই বিষয়ে আমার বলিবার অধিকার নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, শান্তি ও স্বত্ব নির্দ্ধারণ ও রক্ষার নিমিত্ত ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

২। সাধারণী বক্তৃতা।

ইহা দুই প্রকারে বিভক্ত। যথা—স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত।

স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত কবিত্বের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, স্বাভাবিক ও ও অভ্যস্ত বক্তৃতার বিষয়েও ঠিক সেই মত বিবেচনা করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক বক্তা স্বীয় মনোগত ভাবসমূহ সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিতে পারেন। সুতরাং অনায়াসেই অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, এবং যেমন সৎ কবির সুগাঢ় ভাবব্যঞ্জক বাক্য বিন্যাস চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার নয়, সেই প্রকার সদ্বক্তার মুখনিঃসৃতভাবপরিপূর্ণ কথা গুলিও মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। সৎ কবির কবিত্বপরিচায়ক প্রবন্ধ পাঠে সমুদায় মানসিক বৃত্তির চরিতার্থতা এবং ক্রমশঃ যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে, সদ্বক্তার বক্তৃতা শ্রবণেও তাহাই হয়।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীস দেশীয় মহাকবি হোমরের ইলিয়ড ও উদিসী (Homer's Iliad and odyssey) নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে কখন একটী স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ ট্রয় নগরের ধ্বংস মনে করিয়া আকুলিত, কখন বা একিলিসের (Achilles) অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তপ্ত শোণিত, কখন বা এণ্ড্রোমেকির (Andromachie) সুকুমার গোলাপ ফুলের ন্যায় হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হইয়া হেক্টরের (Hector) যুদ্ধপ্রয়াণ সময়ে স্ত্রীস্বভাবসুলভা ব্যাকুলতার অধীন, কখন বা ইউলিসিসের (Ulysses) পরাক্রম চিন্তা করিতে করিতে স্তম্ভিত হইতে হয়। আবার মহাভারত পাঠ করিতে করিতে কখন দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কপট অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট, কখন বা যুধিষ্ঠিরের সুবিস্তীর্ণ মানসক্ষেত্রের শুভ্রকান্তিতে শুভ্রীকৃতান্তঃকরণ, কখন বা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালীন কাতরোক্তিতে বিদীর্ণহৃদয়, কখন বা রাজনীতিবিশারদ শ্রীকৃষ্ণের চাতুরিতে সবিস্ময়োল্লাস, কখন বা বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্তাপ বাক্যে ব্যথিত হৃদয় হইতে হয়। রামায়ণ পাঠেও রামের পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠায় পরম প্রীত, লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান্, সচ্চরিত্রা পতিপরায়ণা সতী কামিনীর আদর্শ স্বরূপ সীতার দুঃখে দুঃখী, এবং স্ত্রৈণ দশরথের বীভৎস ব্যাপার মনে করিয়া লজ্জিত হইতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সৎ কবি মানসিক প্রবৃত্তির, রাজনৈতিক প্রণালীর ও সামাজিক নিয়মপরম্পরার উন্নতি সাধন পক্ষে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। সদ্বক্তাও সৎ কবি অপেক্ষা উন্নতি সাধন পক্ষে কোন অংশে ন্যূন নহেন।

পুরাবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, সদ্বক্তৃতা কি প্রকারে জাতীয় সমস্ত লোকের চিত্ত হরণ করিয়া কত কত মহৎ ব্যাপারের অধিনায়িকা হইয়াছে। ইহা কুসংস্কাররূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন মানবহৃদয় হইতে অত্যল্পাবসর মধ্যেই কুসংস্কার সমূহের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে, সুষুপ্ত হৃদয়ের

তদবস্থ বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া দেয়, এবং মানবহৃদয়ে সাহসকে ক্রমশঃ উপচীয়মান করিতে থাকে। দুর্ব্বল হীন-সাহস ব্যক্তিও উৎসাহিত হইয়া যোদ্ধৃ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সাহসিক ব্যক্তির সাহস দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইতে থাকে। কর্ম্মঠ ব্যক্তিরা একবারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সদ্বক্তার অভাব থাকিলে সামাজিক উন্নতি সাধন অতি আয়াসসাধ্য হইয়া উঠে। যে সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সমাজ প্রকৃত উন্নতিপদে অধিরোহণ করিতে পারে, সেই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানপ্রণালী সুচারু-রূপে লোকের মনোমধ্যে নিহিত করিতে না পারিলে কোন মতেই সমাজ শীঘ্র উন্নত হইতে পারে না। প্রকৃত, সামাজিক সভ্যেরা দেশের উন্নতি-বিষয়ক ব্যাপারের অনু-ষ্ঠানে বিশেষ তৎপর এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে, দেশের আপামর সাধারণ সকলেই স্বস্বত্বাবধারণে ক্ষমবান্ হইবে, এবং সকলেরই মনে 'আমি একজন সভ্য' এই বলিয়া অভিমান থাকিবে। কিন্তু আপামর সাধারণ সকলকেই উন্নতি পথে লইয়া যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। হয়ত এমনও হইতে পারে যে, সভ্যেরা উন্নতি-বিষয়ক তত্ত্বাবৎ কার্য্য-নিচয় বিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু কার্য্যদক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পরিচালক ব্যতিরেকে সফলমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। এখন দেখা যাক্ কি প্রয়োজন হইতেছে। অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন দেশকালোচিত সুবিবেচক সদ্বক্তার আব-শ্যক। এবম্ভূত ব্যক্তি পরিচালক না হইলে ঈপ্সিত ফল লাভ অতি সুকঠিন। কারণ যাহাদের উন্নতিতে দেশ উন্নত হইবে, তাহাদের মন হইতে অজ্ঞানান্ধকার অপ-সারিত করিতে না পারিলে কি প্রকারে মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে? আমরা এত-দ্দ্বারা এ প্রকার বলিতে প্রস্তুত নহি যে, সদ্বক্তা ব্যতিরেকে একবারেই সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।—তবে দেখা উচিত যে, কি প্রকারে অল্প সময়-মধ্যে এবং অনায়াসে উন্নতি সাধন হইতে পারে। প্রায় অনেক সময়ে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে যে, উন্নতি বিষয়ে বিলক্ষণ চেষ্টা থাকিলেও অনেক সভ্যকেই মৌনাব-লম্বন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রবর্ত্তনা দিবার লোক বিরহ—যদ্যপি একবারেই লোক বিরহ না হউক উপযুক্ত লোক বিরহ বলিতে হইবে। পাঠক! এক্ষণে দেখুন, এমন স্থলে উল্লিখিত গুণ-সম্পন্ন সদ্বক্তার কতদূর আবশ্যকীয়তা। তিনি যাবতীয় লোককে প্রবর্ত্তনা মার্গে অবতরণ করাইয়া কাজের কথা গুলি ধীরে ধীরে তাঁহাদের মনোমন্দিরে এমন প্রবিষ্ট করিয়া দেন যে, তাঁহার সদ্বক্তৃতাপ্রভাবে তাঁহাদের মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং মালিন্য ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তাহাদের চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট ও মোহিত হয় যে, তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই অমানসিক বলে উৎসাহিত হইয়াই যেন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

সমাজের উন্নতি ও রক্ষার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, তন্মধ্যে প্রথমতঃই সদ্‌বক্তার কার্য্য। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সদ্‌বক্তার বক্তৃতা পাঠ করিলেও যে মনে কি প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। গ্রীস দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ডেমস্থিনিসের ফিলিপিক্‌স্, (Philippics of Demosthenes) এবং ইটালীয় সিসিরো, (Cicero) ইংলণ্ডীয় বার্ক, (Burke) সেরিদান, (Sheridun) ফক্‌স, (Fox) ওয়ালপোল, (Walpole) পিট, (Pit) প্রভৃতির বক্তৃতা পাঠ করিলে মনে কতই যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব একে একে আসিতে থাকে, তাহা লেখনী—বিশেষতঃ মাদৃশ লোকের—লিখিতে অক্ষম। যখন পাঠ করিলেই এই প্রকার ভাবসমূহ ক্রমান্বয়ে মনে উদিত হইতে থাকে, তখন যাঁহারা তত্তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে যে কি প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাঁহারাই জানেন। বক্তার মুখ হইতে শ্রবণ ও তাহার বক্তৃতা পাঠ এই উভয়ের হৃদয়গ্রাহিত্ব বিষয়ে বিশেষ তারতম্য আছে। কারণ পুস্তকমধ্যে বক্তার সাময়িক স্বরক্রম ও স্থানোপযোগী অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি কিছুই লিখিত নাই। এবং এই গুলিই আবার শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণের প্রধান উপকরণ।

ইতিপূর্ব্বে লর্ড ব্রোহাম (Lord Brougham) সাহেব ইংলণ্ডের প্রধান সদ্‌বক্তা ছিলেন। এক্ষণে ব্রাইট (Bright) সাহেবের খ্যাতিও কম নহে। ফসেট (Fawcett) সাহেবও উত্তম ন্যায়গর্ভ বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

আমরা লাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় সদ্বক্তাদিগের বক্তৃতা পুস্তকাকারে দেখিতে পাই। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে ঈদৃশ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ব্বে পরিপুষ্ট ছিল না। এক্ষণেও সম্পূর্ণরূপ হয় না। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সদ্বক্তারও আবির্ভাব হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইদানীন্তন সদ্‌বক্তা। ইঁহা দ্বারা প্রভূত পরিমাণে বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন হইতেছে। অতএব পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সদ্বক্তা দ্বারা মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধন হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। সুতরাং একথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, 'উন্নতিসাধন পক্ষে ইঁহাদের কার্য্যাবলীর গুরুত্ব সমধিক, তাহার সন্দেহ নাই।'

সঙ্গীতে কি এ প্রকার ফল ফলিতে পারে? বোধ হয় কখনই সম্ভব নয়। সঙ্গীত আশু চিত্তরঞ্জক মাত্র। সদ্বক্তার মুখনিঃসৃত বাক্য চিত্তাকর্ষক, ফলপ্রসূ ও সমাজের এবং জগতের উন্নতিসাধক। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, আমরা

সদ্বক্তার আসন গায়কের উপর নির্দ্দেশ করি। ফলতঃ পাঠক! ভালই বলুন আর মন্দই বলুন আমরা সদ্বক্তার পক্ষপাতী রহিলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংসার চিত্র।

১

বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড, বিচিত্র মেদিনী!
বিচিত্র সাগর, বিচিত্র তটিনী!
বিচিত্র ভূধর, বিচিত্র গগন!
বিচিত্র মানব প্রকৃতি রচন!

২

মানব স্বভাব করিতে তুলনা
শুন মন, ভবে, কে পারে বলনা?
আবার হৃদয় মাঝারে হে তার
প্রবেশিতে বল, সাধ্য আছে কার?

৩

কখন হাঁসিছে, কখন কাঁদিছে,
কভু সুখ হ্রদে সানন্দে ভাসিছে;
কখন শোকের অনলে হৃদয়
জ্বলিছে—কিছুতে শীতল না হয়।

৪

কোথাও ধাৰ্ম্মিক পুরুষ প্রধান
এক চিতে করি বিভু গুণ-গান,
স্বর্গীয় আনন্দ সুবিমল সুধা
পান করি, নিবারিছে মনঃক্ষুধা।

৫

কোথাও বিধৰ্ম্মী পাষণ্ডের দল,
সুরাপানে মাতি, করি কোলাহল,
প্রতিবেশী জনে করে জ্বালাতন;
বৃথায় কাটিছে দুখের জীবন!

৬

কোথাও সধন, সুরম্য ভবনে
সুসজ্জিত করি, প্রিয় জনসনে
মনের সুখেতে করিছেন বাস,
ভাসি মনোসুখে সদা বারমাস।

৭

কোথাও দারিদ্র্য-নিপীড়িত জন,
শীর্ণ দেহ সার, সদা অনশন,
দুখিনী প্রেয়সী সহিত সতত
জীর্ণ কুটীরেতে করে কাল গত।

৮

কোথাও ললিত সঙ্গীত মাধুরি,
ঢালিছে শ্রবণে সুধার লহরী,
বাজিছে তবলা, বাজিতেছে বীণ,
নাচে মন, কিবা নবীন প্রবীণ!

কোথাও অপত্য-বিয়োগ বিধুর—
জনক জননী বর্ষিছে প্রচুর
নয়ন আসারে, ভাসায়ে মেদিনী,
কে শুনে তাদের রোদনের ধ্বনি ?

১০

হরিষ, বিষাদ, শোক, তাপ আর
জগতে সদাই করিছে বিহার ;
সুখ বা দুখের প্রকৃতি রে মন !
বুঝিতে নারিনু জগতে কেমন !!

শ্রীউঃ———

অদৃষ্টবাদ।

পাঠক! আপনারা সকলেই ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন—দেখিয়াছেন, কত সময়ে বিস্তীর্ণ সমর ক্ষেত্রে অগণিত ক্ষত্রিয় বীর পুরুষ শুভ অদৃষ্টের উদয় কামনায় কর-পুটে মহাকালের বা মহাকালীর স্তব করিতে নিযুক্ত আছেন; কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই যবন বা ইংরেজ তরবারি ও অগ্ন্যস্ত্রে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সম্পাদন করিয়া তুলিল। এখন আর সে কাল নাই—অতীত কালের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে; সে সকল লোক নাই—মৃতের সংখ্যা বিবর্দ্ধন করিয়াছেন; তথাচ কি তাঁহাদের সেই সংস্কার দেশ কি, তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছে ? যদি কেহ সেরূপ ভাবিয়া থাকেন, তিনি ভ্রান্ত—তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। যদিও দেশে এক্ষণে যুদ্ধ বিগ্রহ বিচরণ করিতেছে না, সত্য—তথাচ বর্ত্তমান ভারত-বাসী জনগণ নিত্য সাংসারিক কার্য্যে কি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সংস্কার ভুলিয়া গিয়াছেন? সেই মহানর্থকর সংস্কার কি তাহার প্রিয় ভারতকে ছাড়িয়া যাইবে ?—এমন দিন কি উদয় হইবার সম্ভব ?—

সেই সংস্কারটী কি, পাঠক! তাহা কি বলিয়া দিতে হইবেক ?—প্রতিগৃহে—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল কার্য্যে যে কথার উল্লেখ করিয়া থাকে—ইহা তাহাই—অর্থাৎ "অদৃষ্ট"। কোন ব্যক্তি আপনার ইন্দ্রিয় ব্যাসক্তি প্রযুক্ত সুরাপানে সংরত থাকিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল—অমনি সকলে বলিয়া উঠিলেন—"অদৃষ্ট"। কেহ আজীবন স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উত্তমরূপে পালন করিয়া সবল দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করি-লেন—তাহাও "অদৃষ্ট"। কেহ আপনার বুদ্ধিদোষে পিতৃপিতামহের সঞ্চিত বহুল অর্থরাশি অমিত ব্যয়িতার নিকট উৎসর্গ করিয়া নিজে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন—ইহাও তাঁহার "অদৃষ্ট"। এবং কেহ বা আপনার বুদ্ধি বলে নিরন্তর মিতব্যয়িতার সাধনা করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা হইতে উন্নতি লাভ করিলেন—পরিবারকে সুখে সচ্ছন্দে

রাখিতে পারিলেন—তাহাও তাঁহার সেই

পাঠক! এই অদৃষ্টবাদ আমাদের দেশে অসংখ্যলোককে নিত্য বিভ্রান্ত করিতেছে—এবং সংসারে আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আমাদের দেশের পণ্ডিত ও নীতিবিদেরা আবার সেই রূপ সংস্কার বিবর্দ্ধনে নিতান্ত কম প্রয়াসী নন। এইরূপ অদৃষ্টবাদীর নিরুদ্যম মনোভাবকে তাঁহারা কখন "সন্তোষ"—কখন বা "বৈরাগ্য"—ইত্যাদি মধুর শব্দে অভিহিত করিয়া সাধারণ অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণের বাঞ্ছিত উপাদেয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। গিল্টির গহনা যেমন অকৃতির অবশ্য গ্রহীতব্য ও চিত্তরঞ্জক—প্রোক্তরূপ "সন্তোষ" বা "বৈরাগ্য" অভিহিত নিশ্চেষ্টতাপূর্ণ অদৃষ্টবাদ—আমাদের সমাজের—অক্ষম, সাহসহীন দুর্ব্বল চিত্তের সেইরূপ প্রীতি ও সুখপ্রদ। ইহা যে সমাজের কতদূর অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে—মানবজীবনকে অন্তঃসারবিহীন করিয়া তুলিতেছে—তাহার গণনা করে, কাহার সাধ্য? এতদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে—আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। অনেকেই বৃদ্ধ পিতামহীর নিকট শুনিয়া থাকিবেন—"অমুকেদের আমের বাগানে একটা ব্রহ্মদৈত্য চিরকাল বাস করে।" অথবা "অমুকের বংশবাগানে বা গ্রামের সীমান্তবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে পিশাচী বা প্রেতগণের দর্শন প্রতি রজনীতে পাওয়া যায়।" কিন্তু এরূপ বিশ্বাসে বালক বালিকা বা কৃষকদিগকেই ভয়ের বশীভূত করিয়া থাকে—অন্য কোনরূপ সামাজিক অনিষ্টের উৎপাদন করে না। কিন্তু অদৃষ্ট-বাদিত্ব-রূপ অন্ধতম সংস্কারে আলস্যের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব করিয়া দেয়—সমাজকে হস্ত পদাদি থাকিতেও শ্রমকাতর করিয়া তুলে—এবং পরিশ্রম রূপ সহজ উপায় দ্বারা যাহা অনায়াস-লভ্য, তাহার উপার্জ্জনে দৈবের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেয়। অর্থ, মান, সুখ প্রভৃতি সমস্ত কামনীয় পদার্থই যে পরিশ্রম দ্বারা সকলেই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম—এবং দুঃখ ও ক্লেশ রূপ অসুখের কারণ যে আলস্য ও অসদাচরণ, একথা ওরূপ ভ্রান্ত সমাজকে সহজে বুঝাইয়া দেয়, সাধ্য কার? বরং ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে আপন আলস্য পরতন্ত্রতা দোষের পরিহারার্থ স্বীয় অদৃষ্টের নিষ্করুণতা; ও অন্যের সুখ সম্পদের হেতু তাহার সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—সুখ, সম্পৎ, পরিশ্রম ও সদাচরণের এবং দুঃখ ও ক্লেশ আলস্য ও অসদাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। সুখসম্ভোগ মানব হৃদয়ের প্রধানা ও বলবতী কামনা। প্রতি সমাজ—প্রত্যেক মানব হৃদয় সেই একমাত্র কামনার উপাসনায় সংযতমনা হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহার প্রত্যক্ষ-

সিদ্ধ প্রমাণ জগতে দুর্লভ নহে।

দুঃখের বিষয়—সকলের হৃদয়ে উক্ত কামনা বলবতী থাকিলেও, যাঁহাদের চিত্তের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই—যাঁহারা বর্ত্তমান আমোদ আহ্লাদের জন্য ব্যতিব্যস্ত—তাঁহারা প্রায়ই অকৃতমনোরথ হইয়া থাকেন। এবং যাঁহাদের শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতাদি গুণসদ্ভাব অথবা যাঁহারা ভবিষ্যতের প্রতি সর্ব্বদা সাবধান—তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হন। পোপ বলিয়াছেন—

> "Fortune a goddess is to fools alone,
> The wise are always masters of their own—"

> সৌভাগ্যেরে বলে দেব মূর্খেই কেবল,
> নিজ সৌভাগ্যের পতি পণ্ডিত সকল।

অতএব আপনার দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপযুক্ত ও অন্যের সৌভাগ্যোদয়ে হিংসানুরত না হইয়া সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কি কি কারণে আপনাদের এরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা কি কারণে অন্যের তাদৃশ সুখলাভ সুসিদ্ধ হইল। মধ্যে মধ্যে এইরূপ চিন্তানুরত হইলে অবশ্যই কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। যদি প্রোক্ত জিজ্ঞাসার অনুবর্ত্তী,—ও তদনুবর্ত্তী সিদ্ধান্তের ভ্রান্তিশূন্যতা দেখিয়া তদনুসারিণী যুক্তির অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হওয়া যায়, জগতে অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা বা পক্ষপাতিতা নিবন্ধন আক্ষেপোক্তি শ্রবণপথে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; এবং ধনশালিতা বা দরিদ্রতার কায়বৃদ্ধি সন্দর্শনে হিংসাকুলিতচিত্ত বা ক্লিষ্ট হইতে হয়না। কিন্তু এরূপ কার্য্যে অনুরক্ত লোক জগতে কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? যদিও কোনও সময়ে হিতাহিতজ্ঞান কাণে কাণে তাহা করিতে উপদেশ দেয়—কিন্তু আত্মগরিমারূপ মহতী ঝঞ্ঝার উদয়ে তাহা শ্রবণপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্টের মাহাত্ম্য অখণ্ডনীয়ভাবে জগতে বিরাজিত থাকে এবং সেই সঙ্গে সমাজের উন্নতির পথ চিরনিরুদ্ধ থাকিয়া যায়। এবং তাহার সহিত আলস্য—দরিদ্রতা—দুঃখ—ক্লেশ—প্রভৃতি—মহানর্থকর পিশাচেরা নিরন্তর সংসারে বিচরণ করিয়া মানব সমাজকে বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া তুলে। সামাজিক অবস্থা, গিরিগহ্বর-নিঃসৃতা কল্লোলিনীর ন্যায় অসংখ্য দূষিত পদার্থ বহন করিয়া শোচনীয় ভাবে প্রকাশমান থাকে। কতদূর গমন করিলে তাহার কুসংস্কাররূপ দুষ্ট পদার্থ-নিবহ তলনিমগ্ন হইবে ও তাহা সত্যজ্ঞানরূপ নির্ম্মলতা প্রাপ্তে জগতের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের ভারত সমাজের সেরূপ অবস্থা সন্দর্শনের আশা যে কতদূরে অবস্থিত আছে বলিতে পারি না।

শ্রী উঃ——

পতি ও পত্নী।

আমরা ফাল্গুন ও চৈত্রমাসের বান্ধবে, "মুখরা ভার্য্যা বা গৃহিণীরোগ" ও "মুখরার প্রত্যুত্তর" নামক দুই খানি প্রবন্ধ-পাঠে অতিশয় দুঃখিত আছি। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গরাজ্য ইংরেজাধিকার ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া বঙ্গ-সমাজ যে এরূপ বিকৃতিভাবাপন্ন হইবে, কাহারও বিশ্বাস ছিল না। বরং সকল হৃদয়েই এরূপ আশা প্রধূমিত ছিল যে, সভ্যতা, উন্নতি, সুখ সাচ্ছন্দ্য দেশমধ্যে—প্রতিনগরে—প্রতিগ্রামে—প্রতিগৃহেই বিরাজিত দেখিয়া আমরা নিরন্তর সুখসাগরে সাঁতার দিতে থাকিব। কিন্তু উক্ত দুই খানি প্রবন্ধ পাঠে হৃদয়ের সকল আশা সকল ভরসাই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ সমাজের ভবিষ্যতের দুর্দ্দশার আশঙ্কার প্রতি যাঁহার চক্ষুঃ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

আমাদের সম্পূর্ণ আশা ছিল যে, লোকে বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া উপযুক্ত স্বামী ও উপযুক্তা গৃহিণী, উপযুক্ত ভ্রাতা ভগিনী হইয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি-সাধনোদ্দেশেই জীবন উৎসর্গ করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বৈপরিত্যাচরণে কাহার হৃদয়ে ব্যথা না পায়? যেই শিক্ষা ও সভ্যতা একমাত্র আশার স্থল ছিল, তাহাই আবার নিরতিশয় শঙ্কার কারণ হইল। অতএব এই বিহিত সময়ে যাহাতে দেশোন্নতি-সাধনে কোন রূপ বাধা উপস্থিত না হয় অন্ততঃ সকল প্রকার দোষের নিরাকরণ হইতে পারে তাহার চেষ্টা ও উপায় বিধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত নিম্নে কিছু লেখা গেল; "মুখরা ভার্য্যা ও তাহার স্বামীর" এতদ্দ্বারা সামান্য মাত্র উপকার দর্শিলেও সফল শ্রম বোধ করিব।

পরিণয় সমাজের—পরিবারের একটী অতি কর্ত্তব্য, ও পবিত্র প্রণালী। দম্পতী এই সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কতিপয় বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য পালনে সুখে ও সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এই শুভোদ্দেশেই পাণিগ্রহণ প্রথা সংরচিত ও চিরক্রমাগত। কিন্তু কিরূপ কর্ত্তব্য পালনে তাঁহাদিগকে যত্নপরায়ণ থাকিতে হইবে, অনেক দম্পতীর বুদ্ধিদোষে শিক্ষা দোষে তাহা জানা নাই। অতএব সেই সমস্তের উল্লেখে এ স্থলে যত্নবান্ হইলাম। যদিও আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের উপদেশ বটিকা, অভিমান ব্যাধির প্রবল স্রোতোমুখে ভাসিয়া যাইবে, তথাচ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। নৈদানিকদিগের বিশ্বাস যে সকল সময়েই প্রযুক্ত বটিকায় ফল না দর্শিলেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, সেই সমস্ত বটিকার গুণ রোগীর দেহে বর্ত্তমান থাকে এবং কাল সহকারে উপযুক্ত ঔষধের সংযোগে বিশেষ গুণ দেখায়।

স্বামীর প্রতি ;—

স্বীয় প্রণয়িনীকে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে আপনার সমান জ্ঞান করিবেন। স্নেহ, দয়া, সম্মানদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবেন ; এবং কোন কোন অবোধ স্বামীর ন্যায় তাঁহাকে সামান্যা পরিচারিকা বোধে সগর্ব্ব-ব্যবহার করিবেন না।

তাঁহার গৃহকার্য্যে কদাচ হস্তার্পণ বা কর্ত্তৃত্ব করিবেন না।

সর্ব্বদাই তাঁহার হস্তে, স্বীয় অবস্থানুসারে, অর্থ, অলঙ্কার, বসনাদি অর্পণ করিয়া সমুচিত পূজা প্রদান করিতে যত্ন পাইবেন।

প্রণয়িনী সমুচিত যে সমস্ত প্রার্থনা করিবেন তৎ সমুদয় প্রফুল্লমনে, অবিলম্বে সম্পূর্ণ করিবেন।

গৃহকার্য্যে সামান্য মাত্র ত্রুটি বা দোষ দর্শন করিয়া কদাচই তাঁহার উপর ক্রোধাভাস প্রকাশ করিবেন না।

সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী, ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রবর্দ্ধিকা বিদ্যা শিক্ষা দিতে যত্ন ও ব্যয় স্বীকার করিবেন ; কিন্তু বাবু শিক্ষা-প্রদানে অপরিণামদর্শী যুক্তির অবলম্বন করিবেন না।

তাঁহাদের অনুচিত স্বাধীনতা-দানে অগ্রসর হইবেন না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় প্রণয়িনী গৃহ-বিনির্গতা হইয়া সভ্যতা শিক্ষার সহিত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে ও তাঁহার উপর অনুচিত প্রভুত্ব-স্থাপনে শিক্ষিতা হইয়া উঠেন। ইহাপেক্ষা আমাদের অন্তঃপুর-নিবদ্ধা স্ত্রীস্বাধীনতা অধিকতর সন্তোষ-প্রদায়িনী এবং সুখ সন্তোষ ও জগতের শান্তি-প্রবর্দ্ধিনী।

গৃহিণী সদ্‌গুণ-শালিনী ও সুবিজ্ঞা হইলে সকল প্রকার বিপদে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। অনেক স্বামীকে এইরূপ উপায়ে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। প্রণয়িনী বিপৎকালের যেরূপ অকপট মিত্র, পৃথিবীতে এরূপ আর কে আছে ?

কোন অপরাধ জন্য বা অপরাধ সন্দেহে তাঁহাকে কাহারও নিকট তিরস্কার করিবেন না। অনেক রমণী অন্তঃপুরে নির্জ্জনে তাহা সহ্য করিলেও অপরের নিকট তাহা করিতে পারেন না।

পত্নীর প্রতি ;—

সর্ব্বদা আপনার পতিকে স্নেহ, ভক্তি ও প্রেম করিবেন। সংসার যাহাতে সুখময় বোধ হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন এবং স্বামীর স্নেহ ও প্রেমের সকৃতজ্ঞ প্রতিদানে যত্নবতী থাকিবেন।

পারিবারিক ও সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে অথবা যে কোন ন্যায়ানুগত উপায়ে স্বামী সর্ব্বদা পরিতোষ লাভ করেন, তৎ-সম্পাদনে দৃঢ়ব্রতী থাকিবেন। কদাপি স্বামীর উপর অনুচিত প্রভুত্ব স্থাপনে বা তৎপ্রদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন না। এরূপ ব্যবহারে তাঁহার মর্য্যাদা ভঙ্গ ও তাঁহাকে হীনাবস্থ করা হয়।

তাঁহার সকল প্রকার সুসঙ্গত কামনায়

সাহ্লাদে ও সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করিবেন।

সক্রোধ ব্যবহার বা আলাপ পরিহার করিবেন। সম্বাদপত্রে বা সাধারণ সমীপে দেশে বা বিদেশে তাঁহার নিন্দাবাদ অপেক্ষা ভয়ানক অনিষ্টকর কার্য্য আর কিছুই নাই।

স্বামী মন্দবুদ্ধি-বশতঃ যদ্যপি কদাচ অন্যায়াচরণে অনুরক্ত হয়েন, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা উচিত নয়। যত গোপনেই করা হউক—ক্রমে কাণাকাণি হইয়া সকলেরই শ্রবণগোচর হইবে ও সাধারণের উপহাস-জনিত পরিহাসের কারণ হইবেক।

স্বামী আপন ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্রণাগ্রহণে অভিলাষী না হইলে কদাচ তাঁহার বিষয়-কার্য্যে বাধা জন্মাইবেন না।

বিদ্যা-শিক্ষায় যত্নবতী হইবেন। তিনি যাহাতে স্বামীর সন্তোষদায়িকা চিরসঙ্গিনী হইতে পারেন, তাহার সম্যক্ চেষ্টা পাইবেন।

বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া—স্বামীর অনুরাগিণী হইয়া—কদাচ “বিবি” হইবেননা। এ বিষয়ে স্বামীর অনুরোধ থাকিলেও তাহা যত্নে পরিহার করিতে যত্নবতী থাকিবেন।

স্বামীর অবস্থা ভাল হইলে সর্ব্বদাই বসন ভূষণাদিতে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে সযত্ন থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার মন্দভাগ্যের উদয়ে কদাচ তজ্জন্য তাঁহাকে পিষ্ট-পেষণ করিবেন না। এরূপ অবস্থায় অনেক দুর্ভাগ্য-স্বামীর সংসার ক্লেশকর হইয়া উঠে। এবং পত্নী সদ্বিবেচিকা না হইলে, পতির আচার ব্যবহার ক্রমেই অধিকতর বিদূষিত হইবার সম্ভাবনা। সংসার-সমুদ্র উত্তরণে পত্নীই ধ্রুব তারা। যখন ঝঞ্ঝা-বাতোত্থিত প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পোতখানি সন্দোলিত হইতে থাকে; যখন বিস্ময়, ভয় ও নৈরাশ্যে নাবিকের হৃদয় ব্যাকুলিত হইতে থাকে—তখন যদি সেই ধ্রুবতারার পরিষ্কার ভাব প্রদর্শিত না হয়; পৃথিবীর চারিদিকে যে তমোরাশি সুবিস্তৃত—তাহা যদি নভোমণ্ডলস্থ সেই নাবিকের হৃদয় প্রফুল্লকর নক্ষত্রটীকেও গ্রাস করিয়া রাখে—তখন কি নাবিকের প্রাণরক্ষার আশা আর ক্ষণমাত্রও হৃদয়ে স্থান পায়? তিনি পথ-ভ্রান্ত—ভগ্নচিত্ত—নিশ্চেষ্ট—হইয়া কর্ণ ত্যাগ করেন; পোতখানিকে কাল-স্রোতের গতিতে সমর্পণ করিয়া প্রস্তরবৎ নিশ্চেষ্ট থাকেন—সুতরাং তাহার বিনাশও যে সুনিশ্চিত, তাহা একরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বলিলেও দোষ স্পর্শে না। অতএব দেখা যায় অনেক লোকে সংসারের ধ্রুব তারার এরূপ অবস্থায় নানামতে বিপন্ন হইয়া থাকেন। যদি উপযুক্ত সময়ে সেই নক্ষত্রটী নির্ম্মল ও পরিষ্কার কিরণ-রাশি বিস্তার করেন, তাহা হইলে নাবিকের পুনরুদ্ধারের অনেক সম্ভাবনা।

উভয় পক্ষকেই ;—

পতি পত্নীর মধ্যে কখনও কোন রূপ অনৈক্যতা জন্মিলে তাহা সাধারণের গোচরীভূত না হয়। সচরাচর ওরূপ হইবার কারণ দাম্ভিকতা ও অভিমান।

দম্পতীর সাংসারিক অবিচ্ছেদ সুখ-প্রস্রবণের নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমরা "সহিষ্ণুতা" ও "ক্ষমা" এই দুইটী মনোবৃত্তিরই উল্লেখ করিব।

পতি পত্নী পরস্পর বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

পরস্পরে কাহারও চরিত্রের উপর সন্দিহান হইবেন না। এরূপ করা বিষম অনিষ্টের কাবণ। এতদ্দ্বারা চরিত্রের নির্ম্মলতার প্রহরী স্বরূপ যে সকল বৃতি থাকে তৎ সমস্ত ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং বিপদ্‌রাশি—ভগ্ন-সেতু-জল-স্রোতের ন্যায় সতেজে সমুপস্থিত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় দম্পতীকে দীপশিখা-সমীপস্থ পতঙ্গের ন্যায় বোধ করিতে হইবেক। সন্দেহ, বিরোধ, মনোভঙ্গ, ত্যাগ, হত্যা প্রভৃতি নানাবিধ বিপদ্ পুরোভাগে প্রচ্ছন্ন থাকে, অবসর পাইলেই সতেজে আক্রমণ করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিয়া লয়।

যদি অতীত সময়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিয়া থাকে, তাহা একবারে বিস্মৃত হইবেন; পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন রাখে না।—

উপসংহারকালে ব্যক্তব্য এই যে, পতির প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার, অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন পত্নীর অবশ্য সম্পাদ্য কর্ত্তব্য এবং দাম্পত্য—সুখের ভিত্তি স্বরূপ। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ, রসিকতার মাধুরি, প্রণয় সংস্থাপনের প্রধান উপকরণ হইলেও সেই সেই গুণে গুণবতী ও প্রণয়িনী ভার্য্যা করিতে পারে না। যাহাতে পতি পত্নীর নিকট উপাস্য দেবতা ও তাঁহার নিকট পত্নী, অর্দ্ধাঙ্গিনী—বোধে পুজ্য ও পূজনীয়া হন তাহার কারণ সারল্য, ভক্তি এবং অবিচলিত প্রেম। একের এই সমস্ত গুণের কিছু মাত্র অন্যথাভাব দর্শনে অন্যে সহজে জীবন-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। গৃহিণীর সর্ব্বাপেক্ষা সাবধান থাকা উচিত যেন তিনি স্বামীর মনোভাবের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিলে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। সে রূপ করিলে পরিণয় রূপ সুপবিত্র ও সুদৃঢ় বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে তাহার পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মনোভঙ্গ-রূপ বিষ-বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া জীবন নাশের—সংসারের ক্লেশ সঞ্চারের সূত্রপাত করিতে থাকে।

শ্রী উঃ—

হরেক রকম।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

১। "পালজীর লেখনী"।—

বিলাতীয় হংসপুচ্ছবিনির্ম্মিতা, রাশি রাশি মসী উদ্গারিণী—এই লেখনীর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, স্বজাতির বিপক্ষে আর ইংরাজজাতির স্বপক্ষে, মক্ষিকা-পুরীষ-চিত্রিত কদলীপত্রের ন্যায়

শাদা কাগজে নানা প্রকার চিত্র করিতে পারে। নির্দ্দোষী রাজ রাজড়ার দণ্ডার্থিনী হইয়া, অবিমৃষ্যকারিতা-দোষ-দূষিত ইংরাজের গুণগান করা ইহার মহাব্রত। যাহাতে পালজী ইংরাজপ্রসাদভোজী হইয়া আরো উন্নত পদ পান—(আকাশের ন্যায় না কি ?) এই লেখনী তাহাই করিতে যত্নবতী। এই লেখনী শত শত মলহর রাওয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়া গবর্ণর জেনেরলের শ্বেত চরণ অলক্ত রঞ্জিত করিতে ভাল বাসে। সৌভাগ্যবান্—দ্বিতীয় পালজী না হইলে—এই সর্ব্বগুণশালিনী লেখনীর ক্রেতা হওয়া দুর্ঘট ;—কারণ, ইহার মূল্য বেশী।

২। কয়েকটী "রাজা বাহাদুর" ও "রায় বাহাদুর" উপাধি।—

বিলাতের মহাসভার "এক চোকো" ছাঁচে সম্প্রতি ঢালাই হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা পরার্থে ভূরি ভূরি অর্থ বিতরণ করিয়া, দানের উপযুক্ত পাত্র বা বিষয়ের অভাব মোচন করিতেছেন, উপরি-উক্ত সম্মানসূচক উপাধি গুলি তাঁহারা ক্রয় করিবার অনুমতি পাইবেন না ;—সুতরাং তাঁহাদিগের আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু যে সকল স্বদেশহিতৈষী পরোপকারিগণ ইংরাজজাতির ষোড়শোপচারে পূজা করিতে সক্ষম,—"তেষাং মধ্যে ততোঽধিকম্" যে যে ব্যক্তি শ্বেতদেবতার পদে পূজা করিতে পারেন, তাঁহারাই ঐ গুলি কিনিতে পারিবেন।

৩। একখানি "দুর্গেশনন্দিনী" নভেল।—অতি উৎকৃষ্ট—নির্ভুল—ব্যাকরণ-দোষ লেশমাত্রও নাই—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লেখা শিখিবার শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—কারণ, ইহাতে ইংরাজীর গন্ধও নাই। আর এতৎ-প্রণেতার এখানি স্বকোপল-সম্ভূত, কেন না, ইংরাজী হইতে এক আনা অংশেও অনুবাদ ও ভাবগ্রহণ করিলে, তিনি অবশ্য ইহার ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিতেন অতএব "দুর্গেশনন্দিনী" গ্রন্থকর্ত্তার মানসাকাশের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী !

৪। পৌষ ও মাঘ মাসের "বঙ্গদর্শন" এবং মাঘ মাসের "আর্য্যদর্শন"।—

যিনি "বৃত্রসংহার" কাব্যের যুগপৎ সমালোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন উপরি-উক্ত তিন সংখ্যা মাসিকপত্র ক্রয় করিবার চেষ্টা পান। কিনিলে, বঙ্গদর্শন সম্পাদকের অপক্ষপাতিনী সমালোচনা ও আর্য্যদর্শনের পক্ষরক্ষিণী সমালোচনা দেখিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

৫। "শিক্ষা নবিশের পদ্য"।—

ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ ও সুকবির অমরকীর্ত্তি। কারণ, পক্ষপাত-শূন্য সুসমালোচক বঙ্গদর্শন-সম্পাদক এ খানিকে বড় ভাল বলিয়াছেন !

৬। মিং রবিন্সন্ সাহেবের "চস্‌মা"।

সে দিন ছোট কর্ত্তার নৈশ সভায় কলিকাতাস্থ যে সকল ভাল ভাল গ্রন্থকার (সকলে নয়) নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন,

মিং রবিন্সন্ সাহেব ঐ ত্রিভুবনপ্রদর্শিনী চস্‌মাখানি চক্ষে দিয়া বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া নিমন্ত্রণ করেন; সুতরাং উহা অবশ্যই ভাল!

৭। লর্ড নর্থব্রুকের গত ১৯ এ এপ্রিলের "রিপোর্ট" এর নকল।—

গ্রীষ্মপ্রভাব-পরাজয়কারী চিরতুষারাবৃত সমুন্নত সিমলাপর্ব্বতে বসিয়া উক্ত মহাত্মা উল্লিখিত রিপোর্ট খানি লিখিয়াছেন। তিনি অসাধারণ, সূক্ষ্ম সুবিচার ও সদ্বিবেচনা দ্বারা ঐ রিপোর্টের সিতভাগ অসিত করিয়াছেন। কারণ ভারতবর্ষের জাতি সাধারণের মতে (কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ জাতি ব্যতীত) মলহর রাও গুইকুমার নির্দ্দোষ, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের মতে তিনি অত্যন্ত দোষী, সুতরাং তাহাই উহাতে লিখিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে। যিনি ঐ নকলখানি ক্রয় করিবেন, তিনি বড় কর্ত্তার বিদ্যাবত্তা, প্রতিজ্ঞাপালন, অপক্ষপাত দোষ-শূন্য বিচারকতা, দেশীয় রাজগণের প্রতি সরল মিত্রতা প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া ক্রয় করিবার অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবেন! পালজী মহাশয়, সহচর সম্পাদক ও এডুকেশন-সম্পাদক মহাশয়গণ যেন এ খানি ক্রয় করিবার চেষ্টা করেন। যিনি ডাকের উপর ডাক—তার উপর ডাক ডাকিতে পারিবেন, তাঁহারই কপালে এ নকল খানি হইবার সম্ভাবনা!—

৮। মহাত্মা ফেয়ার সাহেবের সরবৎ পান করিবার গেলাস!

উক্ত সর্ব্বগুণান্বিত রাজপুরুষ বিলাত যাইতেছেন। অতএব পাথেয়ের কিঞ্চিৎ অনাটন হওয়াতে ঐ গেলাসটী বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছেন। ঐ গেলাসটী আলাদীনের প্রদীপের ন্যায় অলৌকিক গুণসম্পন্ন! একজন স্বাধীন ও মিত্র রাজা ঐ গেলাসের গুণে চিরজীবনের জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরী হইলেন—ইংরাজজাতির অক্ষয়কীর্ত্তি তপনতলে স্থাপিত হইল—পুলিসের অসামান্য গুণরাশি কীর্ত্তিত হইল—সাত লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ হইল—ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাঁর প্রতি ধর্ম্মদেব সুপ্রসন্ন, দেখিতেছি তাঁহারই ভাগ্যে ঐ কাচবিনির্ম্মিত, স্ফটিকবিনিন্দিত গেলাসটী অধিকৃত হইবে। যিনি গেলাসটীকে আর্সনিক ও হীরকচূর্ণ প্রভৃতি বিষম্রক্ষিত বলিয়া সন্দিগ্ধ হইবেন—তিনি ঠকিবেন! কারণ ঐ গেলাসটী বিষাক্ত নহে—অমৃতময়!

৯। সেনজীর "আয়না"।—

এই আয়না খানি অত্যুৎকৃষ্ট। ইহার ফ্রেম খানি সুবর্ণে হলকরা।—উপরে "ওঁ তৎসৎ", বাম পার্শ্বে "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" দক্ষিণ দিকে "সত্যমেব জয়তে" এবং নীচে "শত্রু দক্ষিণ গণ্ডে চড় মারিলে বাম গণ্ড পাতিয়া দিবে" লেখা আছে। আর ইহার কাচখানি "একমেবাদ্বিতীয়ং" পারদে লিপ্তপৃষ্ঠ হওয়াতে, অতি মূল্যবান্ হইয়াছে।—যিনি ইহাতে মুখ দেখিবেন,

তিনি পূর্ণালোকপূর্ণ ঈশ্বরের সহিত সেনজীর ঘরকন্নার কথোপকথন শুনিয়া নরজন্ম সার্থক করিতে পারিবেন। সাকারের সহিত নিরাকারের (আ'জ কা'ল কোনো কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাইতেছে) কথোপকথন শ্রবণ করা সাতিশয় সৌভাগ্যের কথা! অতএব সৌভাগ্য যাঁর—এই আয়না খানিও তাঁর!

১০। ব্যথিত শ্রী—র " ভারত মাতা " (রূপক)—

এ খানি অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক (?) শিশির বাবুর প্রণীত বলিয়া যাঁহারা কাণাকাণি করেন, সেটী তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম! কেন না, শ্রী—একজন সুলেখক ও সুকবি, তবে কি জন্য তিনি পরের উদ্গীরিত দ্রব্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন? অতএব এখানি ক্রয় করিয়া ব্যথিত শ্রী—কে উৎসাহ দান করা সকলের কর্ত্তব্য। " গ্রন্থকার প্রহসনের " গ্রন্থকার যদি শ্রী—কে তাঁহার গ্রন্থের নায়ক কালাচাঁদের সহিত " অভিন্নহৃদয় " করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে!

পুরাবৃত্ত পাঠে কি কি উপকার।

গর্হিত দেশাচার দমনে ইহার উপযোগিতা।

এটি কি? ইহা চিরকাল কি একভাবে আছে? না কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে? পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল, এখন তাহা কেন নাই? পূর্ব্বে যাহা ছিল না, তাহা কি প্রকারে এবং কোথা হইতে আসিল? ইত্যাদি বিষয়ে কুতূহল মানব মানসের আন্তরিক ধর্ম্ম ও তদীয় বুদ্ধি-বৃত্তির ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাকৃতিক ভাব। এই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভূতত্ত্ববিদ্ আহার নিদ্রায় অবহেলা করিয়া অহোরাত্র পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত যাবতীয় পদার্থের পরীক্ষা করিতেছেন, ও পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে অস্ত্র উদ্ভিন্ন করিয়া নূতন নূতন ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া করিতেছেন। এই বৃত্তির বশীভূত হইয়াই পুরাবৃত্তানুসন্ধিৎসু ভীষণ গিরি-গুহা, অত্যুন্নত পর্ব্বত, ভীষণ-তরঙ্গ-সমাকীর্ণ সমুদ্র, তুচ্ছ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন; বিজাতীয় পুস্তকালয় হইতে প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছেন, প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকাদির প্রতিমা গ্রহণ করিতেছেন, ও প্রাচীন ভাষা শিক্ষা জন্য জীবনের অন্যান্য সুখ বিসর্জ্জন দিতেছেন। এই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই জ্যোতির্বিদ্ শীতকটিবন্ধের নিষ্ঠুর নীহার-নিপাতে মনোযোগ না করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রাসাদোপরি দূরবীক্ষণ-হস্তে উপবিষ্ট আছেন। কোন অসামান্য গ্রহণ ঘটন অবলোকনার্থ উত্তুঙ্গ সাগর-তরঙ্গ ভেদ করিয়া দক্ষিণ মেরু-সন্নিহিত কোন দ্বীপে গমন করিতেছেন।

এই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই, ইতিবৃত্তাখ্যায়ক বহুল পরিশ্রম সহকারে ঘটনাবলী একত্র সংলগ্ন করিতেছেন। পরস্পরের সম্বন্ধ সুচারুরূপে প্রদর্শন করিতেছেন ও এই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই, পাঠক, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিরত ইতিবৃত্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছেন। এই ইতিবৃত্ত পাঠের ফলাফল-বিচারই আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, উভয়ের পক্ষেই ইতিবৃত্ত পাঠ সমধিক আনন্দদায়ী ও উপযোগী। অশিক্ষিতের শিক্ষা হয়; কৌতূহল নিবৃত্তি হয়; সময়ের সদ্ব্যবহার হয়; ও শ্রেষ্ঠ পথে মনোবৃত্তির চালনা হওয়াতে কুকর্ম্মে বিরতি জন্মে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়; পূর্ব্বসংগৃহীত সত্য সমুদায় দৃঢ়ীভূত হয়; এবং তিনি

পুস্তক-গর্ভস্থ ঘটনারাশি হইতে সম্যক্ উপযোগী উপদেশ নিষ্কাশিত করিয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করেন।

ইতিহাস পাঠে যদি সময়ের সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই উপকার না থাকিত, তাহা হইলেও ইতিহাস মানববর্গের মঙ্গল-জনক পদার্থ-পুঞ্জ-মধ্যে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। যাহার দ্বারা জীবনের দুর্ব্বহ ভার সময় সুখে যাপন করা যায়, আত্মদুঃখ বিস্মৃত হওয়া যায়, অপর ব্যক্তির সহিত আপনাকে অভেদ ভাবিয়া তাহার জীবনস্রোতে আপনাকে চালিত করা যায়; যাহা পাঠকালে মানসিক কুপ্রবৃত্তি সকল নিজ নিজ পথে বিচরণ করিবার সুযোগ পায় না, দুর্দ্দান্ত রিপুনিচয় উত্তেজিত হয় না, পরনিন্দার অবকাশ পাওয়া যায় না, সেই পুস্তক কি সামান্য উপকারী? যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মুখে দেখিয়াও পাঠক যে গ্রন্থ হইতে নয়ন অপসারণ করিতে অপারগ হইয়া, তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতেও পারেন নাই; যখন কোন দেশের ইতিহাস মাত্র পাঠ করিয়া, শতযোজনদূরস্থিত ব্যক্তি সেই দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন; তখন সেই পুস্তক কি পাঠকের মন আকর্ষণ করিতে ও তদীয় হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে না? অবশ্যই পারে। কিন্তু এই সমস্ত সামান্য আনন্দ দান করিয়া ও এই সমস্ত সামান্য ও ক্ষুদ্র উপকার সাধন করিয়াই ইতিবৃত্ত নিবৃত্ত হয় না। বিশেষ ব্যক্তির আনন্দ বর্দ্ধন, চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ বা হৃদয় গ্রহণ করিয়াই ইহার প্রভাব পর্য্যবসিত নহে। কুকার্য্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যকে বিরত রাখিয়াই ইহার গুণের সমাধা হয় না।

পুরাবৃত্ত-পাঠে দেশের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। মনুজ-সমাজের কি প্রকারে উন্নতি হইয়াছে; তাহা কেবল এই শাস্ত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে কিরূপে মনুষ্যগণ বনে বনে ভ্রমণ করিত; পরে কিরূপে গিরিগুহায় বাস করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল; পরে কি কি কারণে সামান্য মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া কটাহ আয়ত কুটীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। পরে যখন বর্ষাকালে দেখিল যে উর্দ্ধদেশের মৃত্তিকা-রাশি কেবল আপৎপাতের নিমিত্ত; তখন কি প্রকারে প্রথমে শুষ্কপর্ণ, পরে সুদীর্ঘ তৃণরাশি যোগ আচ্ছাদন করিতে শিক্ষা করিল। সেই সামান্য মৃত্তিকায় হঠাৎ অগ্নি সংযোগ হওয়াতে দগ্ধ মৃত্তিকা যে কত কঠিন ও জল-বায়ু-সহ বুঝিতে পারিয়া কিরূপে ইষ্টক প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিল। ক্রমে কি প্রকারে গিরিগুহার ন্যায় অর্দ্ধ গোলাকার বা নিবিড় পত্রাচ্ছন্ন বিটপীর ন্যায় অপূর্ব্ব আকৃতি বাসস্থান প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিল। প্রথমে কিরূপে রাজ্যভার সর্ব্বাপেক্ষা বলবানের হস্তে; তৎপরে যুদ্ধভার বলবানের হস্তে রাখিয়া বুদ্ধিমানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইল; কিরূপে ধর্ম্মাচার্য্যেরা আপনাদিগকে

পরমেশ্বরের প্রিয়পুত্র ও প্রেরিত বলিয়া সমুদায় স্বত্ব কৌশলে অধিকার করিল, এবং কি প্রকারে আশ্চর্য্য নির্ব্বন্ধ সহকারে সামান্য লোকেরা সেই সকল পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিল, ইত্যাদি নানাবিষয়িণী সামাজিক উন্নতির বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কেবল একজন মনুষ্য নয়, দেশের সমস্ত ব্যক্তি মাত্রের উপকার লাভ হয়। কিন্তু কি দুর্দ্দশা! সেই উপকার আমাদের দেশে কোথায়? দেশীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা হিলটদিগের যুদ্ধ বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন, কি অধ্যবসায় সহকারে ও কি ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিয়া মারসিয়ান প্রভৃতি ইটালিবাসিরা, রোমানদের নিকট হইতে স্বীয় স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। প্লিবীয়ানেরা কত দিনে পাট্রিশিয়ানদিগের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিয়া ছিলেন; কতশত ব্যক্তি তাহাদের সাহায্য করিতে গিয়া প্রাণবিনষ্ট হইয়াছেন ও সেই স্বাধীনতা হইতে যে কি সুফল লব্ধ হইয়াছিল, তাহাও পাঠ করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ গালিলিওকে বিশুদ্ধ মতের প্রচার করিতে গিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের হস্ত হইতে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহাও জানেন। ইংরাজ রাজ্যে কি প্রকারে সামান্য ব্যক্তিগণ পুরোহিতপ্রভাব হইতে মুক্ত হয়, তাহাও তাহাদের মনে জাজ্বল্যমান আছে। লুথর কত কষ্ট সহ্য করিয়া চিরনিবদ্ধ কুসংস্কার বিপক্ষে স্বীয় রসনা সঞ্চালন করেন, তাহাও সকলে জানেন। ফরাসিস্ রাজ্যে পুরোহিত বিপক্ষে কি সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাও তাহাদের মনে জাগরূক রহিয়াছে। কলেন্সো কুসংস্কার বিরোধে লেখনী সঞ্চালন করাতে, কিরূপে অপদস্থ হইয়াছিলেন ও কত অবমানিত হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে সেই কলেন্সো কিরূপে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকতা-পদে পুনর্ব্বার স্থাপিত হইয়াছেন, তাহাও শুনিয়াছেন। তদীয় জয়পতাকা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট করিতেছেন। কিন্তু সেই বহুদর্শিতার ফল কোথায়? এত জানিয়া শুনিয়া কি উপকার হইল? সেই অধ্যবসায় কই? সে উদ্যম কোথায়? সে সহিষ্ণুতা কোথায়? কুসংস্কারের প্রবল শত্রু বক্তৃতাশক্তি কোথায়? বাত, বৃষ্টি, বজ্রপাত তাচ্ছিল্যকারী অচলের ন্যায় মিথ্যা নিন্দায় অবিচলিত থাকা রূপ অসীম শক্তি কোথায়? 'এক ঘরে' হইয়া থাকিবার ভয় অদ্যাপি কৃতবিদ্য যুবকগণের হৃৎকম্প জন্মাইয়া দিতেছে। ইতিহাস পাঠের কি এই ফল লাভ হইল? অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া কি এই নীতি শিক্ষা হইল? না! সময় উপস্থিত। 'চিরদিন কখন সমান না যায়।'

"চিরদিন কখন সমান না যায়" এইটী ইতিবৃত্তের অন্যতম উপদেশ। কথিত আছে যে, কোন বিদেশীয় সম্রাট্ স্বীয় মন্ত্রীকে একটী অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া অনুমতি করিয়াছিলেন, যে, যাহাতে দারুণ দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা হয়, ও সৌভাগ্যের সময়ে

ঐশ্বর্য্য মদে মত্ততা না জন্মে, এমন কোন বাক্য সেই অঙ্গুরীয়ে খোদিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। তাহাতে সুবুদ্ধি সচিবধর 'এ দিন থাকিবে না' (এসা দিন নাহি রহে গা) এই বাক্য খোদিত করিয়া সম্রাট্‌কে প্রতিদান করেন। ইতিবৃত্ত, সেই অঙ্গুরীয়ক। ইহা পুনঃ পুনঃ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, এ দিন কখনই থাকিবে না। যখন ফরাসিস্ রাজ্য ইংলণ্ডের দাসত্ব শৃঙ্খলে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইতেছিল, তখন এক সামান্যা সুদীনা কুমারী কর্ত্তৃক তাহার স্বাধীনত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই ফরাসিসেরাই বোনাপার্টের শাসন সময়ে মত্ত হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রভূত বিক্রম একতার হস্তে পতিত হইয়া সেণ্টহেলেনা দ্বীপে কেদার আবদ্ধ করিবরের প্রভাবের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ও কণ্ঠ বিনিঃসৃত আর্ত্তস্বরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। চিরদিন কখন সমান না যায়।

পুরাবৃত্ত হইতে পুরাকালের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াই আমরা জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারি, এমন নহে। ইতিবৃত্ত অশীতিপর স্থবিরের ন্যায় প্রাচীনকালের দোষাদোষ প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত নহে, ইহা অভিনব পর্য্যটকের ন্যায় নানা দেশের সার নীতি সংগ্রহ করিয়া স্বীয় সমাজে বিতরণ করিতেছে।—ইতিবৃত্ত মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, বর-কন্যার নির্জ্জনে মনোনীত করণ প্রথা কদাপি অনুসরণ করিও না। দেখ দেখ শারদীয় চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ ইউরোপখণ্ডে, উহা কলঙ্কের ন্যায় কেমন লক্ষিত হইতেছে।—পিতামাতার শাস্ত্র-অনুমতি-সদৃশী বলবতী পরিণয় বিষয়িণী আজ্ঞা বরং সহ্য হয়; বাল্যবিবাহ বরং ভাল; পুরাতন স্বয়ংবরা বা পতিম্বরা প্রথা না হয় পুনর্ব্বার প্রচলিত কর; পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা গুণিতম (by the competitive system) ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান কর; প্রকৃত পাণিগ্রহণ প্রথা পুনঃ প্রচার কর। কিন্তু ইতিবৃত্তের কথায় মনোযোগ করিও। গোপনে মন পরীক্ষা করিতে কদাচ সুযোগ দান করিও না। প্রণয় সন্ধুক্ষণ অপ্রবীণাবস্থায় প্রলোভন তাড়না করা অতি দুরূহ ব্যাপার। সুযোগ, উত্তেজিত্র শোণিতানলে আহুতি প্রদান করে। এই বিষয়ে ইউরোপীয় হেতুবাদ এই যে, কোন বিশেষ প্রথার যাজন্ হইল না বলিয়া কি সেই ব্যবহার নিন্দাই হইল? না। অনেকে,—প্রায় সকলেই মিথ্যা যাজন করে বলিয়াই কি মিথ্যাশ্রয় যুক্তিসিদ্ধ? না, কখনই নহে। ঐ কথা পরম সত্য; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি; কুসংসর্গে দোষ কি? যদি কিছু দোষ থাকে, সেই দোষ ঐ প্রথাতেও আছে। এ পক্ষে হেতুবাদ এই যে, কতকগুলি এরূপ কর্ম্ম আছে, যাহা হইতে পাপ পুণ্য উভয়েরই উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু সমাজের অবস্থা ও মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিয়া যখন দেখা যাইতেছে যে, কোন বিশেষ প্রথা দ্বারা সমূহ লজ্জাকর অমঙ্গল ঘটিতেছে, তখন সেই

প্রথার অনুসরণ না করাই কর্ত্তব্য, ও তাহা হইলেই ইতিবৃত্তের উপদেশ সার্থক হইল। ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ রাজ্যের ভয়ানক গৃহবিদ্রোহ স্থল দেখাইয়া দিয়া ইতিবৃত্ত বলিতেছেন, সাবধান পাঠক! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কদাপি আপনা আপনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও না। প্রতিবিধিৎসা-প্রবৃত্তির ডুয়েল ফাইট নামক ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া ইতিবৃত্ত বলিতেছে, দেখ! এই নরশোণিত লোলুপ কুণপের মুখ দর্শন করিও না, উহা ইউরোপখণ্ড ছার খার করিয়াছে। উহার শাসনে ভ্রাতৃহস্তে ভ্রাতা নিহত হইয়াছে। চিরবন্ধুদ্বন্দ্ব সামান্য দ্বন্দ্ববশাৎ রাগান্ধ হইয়া, পিতামাতার স্নেহ মমতা বিস্মরণ করিয়া, প্রেয়সীর প্রীতিপুষ্পে অনাদর করিয়া, উভয়েই শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। ইতিবৃত্তের বিনয় বাক্যে কর্ণপাত কর, ডুয়েল ফাইটের মুখ দর্শন করিও না।

মদ্যপানে যে কত সুখ, তাহা কি সাম্প্রতিক ইতিবৃত্ত, কি পুরাবৃত্ত উভয়েই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাদক সম্পর্ক পরিশূন্য মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডরের সহিত উন্মত্তপ্রায়, অহঙ্কারী, মিত্রঘাতী আলেক্‌জাণ্ডরের তুলনা কর, ও একবার স্থির চিত্তে নিভৃতে স্বগত জিজ্ঞাসা কর, কেন সেই বিত্ত, সেই বল, সেই জ্ঞান থাকিতে ও উন্নতবুদ্ধি হইয়াও সেকন্দর সেরূপ ভয়ানক পাপ কার্য্যে স্বীয় কর কলুষিত করিয়াছিলেন? মন কি উত্তর করিতেছে, মাদকদ্রব্য সেবন।

কিন্তু কি কেবল পুরাবৃত্তই এই ভয়ানক সংস্কার হইতে সাবধান হইতে বলিতেছে। তাহা কেন? ইতিবৃত্ত বলিতেছে, ইদানীন্তন কালে ইউরোপে এবং আমেরিকায় কি হৃদয়শোষক কুক্রিয়া ঘটনা হইতেছে, অবলোকন কর। লণ্ডন অন্তঃপাতী বাতুলালয়ের উন্মত্ততা-কারণাবধারিকা তালিকার প্রতি একবার নয়ন সঞ্চালন কর। অধিকাংশ লোকের ছিন্ন জ্ঞানের কারণ কি? মাদক দ্রব্য সেবন। প্লীহা, যকৃৎ, অপস্মার, পৃষ্ঠাঘাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের রোগনির্দ্দেশক পুস্তক একবার নিরীক্ষণ কর, দেখ দেখি 'মাদক দ্রব্য সেবন' এই বাক্যটী তাহাতে কতবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইতিবৃত্তই বলিতেছে যে, মাদকের প্রাদুর্ভাব দর্শন জন্য বিজাতীয় ভাষায় বিলাতীয় বিবরণ পাঠের আবশ্যকতা নাই। স্বীয় দেশে, স্বীয় নগরে, নিজ পল্লীতে একবার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া নিরীক্ষণ কর। যদি তাহাতেও সন্তুষ্টি না জন্মে, একবার ভাগীরথীর শোভাকরী ভারত ভূমির রাজনগরী কলিকাতায় চল, কলির কি প্রাদুর্ভাব দেখ; একবার শৌণ্ডিকালয় সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, ঐ দেখ কত ভদ্রবেশী লোক প্রবেশ করিল, উঃ কি ভয়ানক কোলাহল, ইহাতেও সন্তুষ্টি হইল না। ভাল একবার আজি শনিবারে বাবুদিগের বাগানে যাই। দেখিতেছ কি ভয়ানক মত্ততা, কি ঘৃণাজনক বাক্‌শক্তি, ও কি শোককর প্রলাপ! ভাল, কিছুক্ষণ

অপেক্ষা কর। রজনী প্রভাতা হউক। এখন কি ? ঐ দেখ চালচিত্রের পুত্তলিকাবৎ সকলে উলঙ্গ, চৈতন্য রহিত, শব দেহের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি ইতিবৃত্ত পাঠক! তোমার জ্ঞানোদয় হইবে না? তবে ইতিবৃত্তের দোষ কি ?

কুসংস্কার বিরোধে উপদেশ প্রদান করাতেই ইতিবৃত্তের বাক্যের শেষ হয় নাই। যে সমস্ত আন্তরিক রোগ বলে বিস্তীর্ণ রাজ্যসমূহ উৎসন্ন ও তাহাদের অস্থিমাংস শিরা জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাহা এই শাস্ত্রেই সুচারুরূপে প্রকাশ আছে। সৈনিক প্রজাবর্গ মধ্যে অসন্তোষ রূপ বিষম কৃমি বুটাস্ রাজ্য-দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, দেখ তাহাতে সামান্য টোটাকাটার ছলনায় কি ভয়ানক উৎপাত পাত হইয়া গিয়াছে। যদি প্রাচীন কালে, সমস্ত ভারত রাজ্য একমত হইয়া যবন আক্রমণ বিরোধে অসি উত্তোলন করিত, তবে কি এই দেশ চিরকালের নিমিত্ত স্বাধীনতাচ্যুত হইত ? কাণ্যকুব্জ, মথুরা, হস্তিনাপুরী, দ্বারকা প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা যদি কেবল স্বীয় স্বীয় সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদ পারে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহা হইলেও যবন প্রবেশ করিবার পথ পাইত না। আবার সেই যবনই বা কিসে সিংহাসন চ্যুত হইল ? ঘোর স্ত্রৈণতা ও অপরিমিত বিলাস লালসা দুইকীটে যবন রাজ্যের অন্তর্দ্দেশ জর্জ্জরিত করিয়াছিল, বিষম ইউরোপীয় সৈন্যিক-বাত্যা প্রভাবে একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। গৃহবিচ্ছেদ ও বিলাসলালসাপ্রভাবে কেবল বৃহৎ রাজ্য নয়, আমাদের দেশের কত শত সংসার লুপ্ত হইতেছে। আমাদের রাজপুরুষেরা সম্যক্ সাবহিত সুতরাং এই উপদেশ আমাদিগের স্বদেশীয় বড় মানুষের প্রতি আরোপ করিয়াই ইতিবৃত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু ইহার ভৎসনা বাক্যে কর্ণকুহর স্ফুরিত কর। ঐ শুন, সাবধান, সাবধান! গৃহবিচ্ছেদ ও বিলাস-লালসা হইতে দূরে বিচরণ কর, একতার আশ্রয় লও, সামান্য সুখভোগে সন্তুষ্ট থাক।

ইতিবৃত্ত হইতে অসীম আনন্দও উপলব্ধ হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, দোর্দণ্ড দশানন সাতিশয় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তদীয় সংগ্রাম স্পৃহার শান্তি নিমিত্তই চতুরঙ্গ ক্রীড়ার সৃষ্টি হয়, এবং তিনি তাঁহার মহিষী মন্দোদরীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেন। রাবণরাজ পক্ষে চতুরঙ্গ যে প্রকার আনন্দ বর্দ্ধনের উপায় ছিল, পুরাবৃত্ত পাঠ সকলের পক্ষেই তদ্রূপ। কুরুক্ষেত্রের বিশাল যুদ্ধ, আলেক্‌জাণ্ডারের দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী দিগ্বিজয়, হানিবলের অধ্যবসায়, সিজরের পরাক্রম, নেপোলিয়নের সমরকৌশল ইত্যাদি পাঠ অপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে আর কি অধিক আনন্দজনক আছে ? আকবর শাহের অপরূপ রাজ্য কৌশল, বিলাত দেশের ক্রমান্বয় রাজনীতির উন্নতি, লর্ড

বেণ্টিকের শাসন প্রণালী ইত্যাদি নানাবিধ প্রবন্ধ পাঠ অপেক্ষা দেশের সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষী, রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতের পক্ষে অধিক মনোরম আর কি আছে? জন হাউয়ার্ডের অসামান্য দয়াবৃত্তি, শ্রীরামচন্দ্রের অপরূপ চরিত্র, হর্শেল সাহেবের বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যবসায়, স্যার্ উইলিয়ম জোন্সের পাণ্ডিত্য, রাজা রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণ বিবরণ দ্বারা যে লোক বিশেষের মানস-হ্রদ আনন্দ-স্রোতে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহার কোন সংশয় নাই। অতএব পুরাবৃত্ত, কি যুবক, কি স্থবির,—কি যুদ্ধপ্রিয় মহাবীর, কি শাস্ত্রস-ভোগী ধার্ম্মিক সকলের পক্ষেই উপকারী ও আনন্দজনক।

আর্য্যজাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদিমত্ব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত ‘বেদ’ হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। সেই ‘বেদ’ হইতেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি। বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দস্। সুতরাং জ্যোতিষ বেদাংশানুসারে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত। ধর্ম্মশাস্ত্রোন্নতি সম্বন্ধে আদিম হিন্দুদিগের আকাঙ্ক্ষা যেরূপ বলবতী ছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি যে, জ্যোতিঃশাস্ত্র সেই ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া এরূপ মহতী উন্নতির সোপান শ্রেণীতে অধিরোহণ করিবে যে, তাহার অনেক বৎসর পরেও বিদেশীয়, বহু পূর্ব্বাবিষ্কৃত ও সমালোচিত সেই শাস্ত্রের সমকক্ষ হইতে অদ্যাপিও পারিয়াছে কিনা সন্দেহ স্থল। এমন কি, যাহা খৃষ্টের শত শত বর্ষ পূর্ব্বে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি হিন্দুদিগের সকলেই জানিতেন, তাহাও বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদেরা অনুসন্ধান করিয়া পান নাই, যদিও পাইয়া থাকেন, সে অতি অল্পদিন মাত্র। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বে বিদেশীয়দিগের কমেটকে (Comet) জড় পদার্থ (material) বলিয়া ভ্রম ছিল, অল্প দিন হইল, সুপ্রসিদ্ধ এন্‌কি সাহেব (১) উহাকে বাষ্পীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কমেটের এ দেশীয় নাম ধূমকেতু। এই ধূম শব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ‘ধূমকেতু বাষ্পীয়’।

একথা হিন্দুরা বহুকাল পুর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন। ফলতঃ অতি প্রাচীনকালে হিন্দুজ্যোতিষ উন্নতিসম্বন্ধে অন্যান্য দেশীয় জ্যোতিষকে পরাভূত করিয়াছিল। কিন্তু

(১) See Encke's Force and Nature.

এই যে উন্নতি, এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রোন্নতি, এই উন্নতি কোথা হইতে আসিল ? প্রাচীন হিন্দুরা বহু বর্ষ পূর্ব্বে স্বকীয় বাহুবলে পার্শ্বস্থ যাবতীয় শত্রুবিদ্রোহিগণকে (কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয়) করতলস্থ করিয়া যে নির্ব্বিঘ্ন, নিস্তব্ধতা ও স্থিরতা ভোগ করিতেছিলেন, এবং ঘোর চিন্তা ও অতুল অধ্যবসায়শীলতা যে নিস্তব্ধতা ও স্থিরতার অমোঘ ফল, সেই চিন্তা ও অধ্যবসায়শীলতার ফল কি এই উন্নতি? অথবা ইহা ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত ?

এক্ষণে দেখা যাউক, এই ম্লেচ্ছ শব্দে কাহারা বাচ্য ? সাধারণতঃ ইহা দ্বারা হিন্দু ভিন্ন সকল জাতিকেই বুঝায়। কিন্তু আদিম হিন্দুরা সেই সকল জাতিকেই যে জানিতেন, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব (Colebrooke) বলেন, বিদেশীয়দিগের মধ্যে পারসিক, যবন, রোমক, হিন্দুদিগের জ্ঞাত ছিল। পারসিক ও যবন ক্রমান্বয়ে পারস্যবাসী ও গ্রীশবাসীদিগকে যে বুঝাইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অনেকে আবার পারসিক ও যবন, উভয় শব্দকেই গ্রীক্‌জাতির প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (২) কিন্তু আমরা আমাদিগের প্রমাণকে গুরুতর করিবার জন্য উক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এই দুই

(২) যবন—ইদানীন্তন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা কি পাঠান, কি আরব, কি তুর্ক জাতীয় মুসলমানের প্রতি যবন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মপ্রকাশের পূর্ব্বকালীন ভূরি গ্রন্থে জাতি বিশেষের প্রতি যবন শব্দের প্রয়োগ আছে। বস্তুতঃ অশোক রাজার শিল্প লিপি দ্বারা ও অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছে যে, ইউরোপীয় গ্রীক্ লোক যাহারা কিয়ৎকাল ভারতবর্ষের পশ্চিমে বাহ্লীক (বাল্‌খ) দেশে ও তাহার অভ্যন্তরেও কিয়ৎ দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদিগকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে যবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এই শিল্পলিপিতে অশোক রাজা দ্বারা নানা দেশে চিকিৎসালয় স্থাপন প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে যে “ অন্তিয়োকে নাম যোন লাজয় বাপি তস-অন্তিয়কস সামন্তা লাজানে দেবা নিম্পিয়স পিয় দাসিনো বনো দ্বে চিকিছা কতা। ” “ অন্তিয়োক নামে যোন রাজার রাজ্য যাহাতে সেই অন্তিয়োকসের সামন্তগণ রাজত্ব করিত, সেই রাজ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবপ্রিয় প্রিয়দাসি অশোক রাজার দ্বিপ্রকার চিকিৎসা স্থাপিত হইল। ” পরন্তু গ্রীক ও পারসীক ইতিহাসে অন্তিয়োকস (Antiochus) রাজার রাজ্য বৃত্তান্ত বিস্তারিত আছে, তদন্তর্গত তাঁহার রাজত্ব কালেও, অন্য অন্য ব্যাপারের সহিত অশোক রাজার রাজত্ব কাল আদির ঐক্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে গ্রীক অন্তিয়োকসই যোন রাজ শব্দে প্রণীত হইয়াছে। পালি

ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অন্তর্গত করিলাম। এক্ষণে ভাষার যোন শব্দ সংস্কৃত ভাষার যবন, অতএব সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা উক্ত গ্রীকদিগকে যে যবন বলিতেন তাহার সংশয় নাই। বিশেষতঃ যখন বরাহমিহির যবনদিগকে জ্যোতিঃশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শীরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তখন গ্রীকেরা যে যবন জাতি তাহার প্রতি কোন আপত্তি নাই, যেহেতু পুরাকালে গ্রীকেরা এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। অনুমান হয় অযোনিঅ দেশীয় বিখ্যাত গ্রীকদিগের হইতে এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবেক। হিব্রু ভাষাতে ইহাদিগের নাম যবন, বর্ত্তমান পারসীক ও আরবীতে যুনানি এবং প্রাচীন পারসীক ভাষার শরাগ্রমূর্ত্ত বর্ণের শিলালিপি (Cuneform Inscriptions) যাহার অর্থ নিষ্পাদন সম্প্রতি হইয়াছে, তাহাতে যুনা শব্দে ইহাদিগের নাম লিখিত আছে। অতএব গ্রীক অযোনিঅ, হিব্রু যবন, পারসীক ও আরবী যুনানি, প্রাচীন পারসী যুনা, পালি যোন এবং সংস্কৃত যবন শব্দ গ্রীক জাতির প্রতিপাদক এবং তাহারা এক মূল হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। গ্রীক জাতির প্রতিপাদক এই সমস্ত শব্দের "য" বর্ণ বাঙ্গলা রীতি অনুসারে 'জ' বা 'অ' বর্ণের ন্যায় উচ্চারণ না করিয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার নিয়ম ক্রমে প্রায় 'ইঅ' শব্দের ন্যায় করিবেন এবং তাহার 'ব' দন্ত্য উচ্চারণ করিবেন। তত্ত্ব, বো, প, রোমক শব্দের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় 'সিদ্ধান্ত-শ্রীমণিতে' কথিত আছে যে, যখন রোমকদেশে রাত্রি দুই প্রহর, তখন লঙ্কাদ্বীপে সূর্য্যোদয়, ইহাতে রোমক শব্দে ইতালীর অন্তর্গত রোম নগরকে বুঝাইতে পারে (৩)। উইলফোর্ড সাহেবও এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন (৪) অতএব দেখা যাইতেছে যে, রোমক শব্দে রোমীয়দিগকেই বুঝায়। ইহা ভিন্ন আর্য্যেরা চীনবাসী (Chinese) (৫) দিগকেও জানিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে হিন্দুরা চীনবাসী, আরব ও পারস্যবাসী, রোমীয় ও গ্রীকদিগকে চিনিতেন। এক্ষণে এই দেখান যাইতেছে যে, আর্য্যদিগের জ্যোতিষোন্নতি এই কয় ম্লেচ্ছ জাতিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হয় নাই, এবং তাহাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, হিন্দুদিগের এতৎ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উন্নতি স্বকীয়োন্নতি,—ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত নহে।

---

(৩) The western country called Romaka, where it is said to be midnight when it is sunrise at Lanka, may perhaps be Rome also. Elphinstone's History f India. Book. III. Chap. 2.

(৪) See Asiatic Researches Vol VIII. p. 367,

(৫) China they certainly knew. Ibid.

প্রথম,—চীনবাসী।

এই দেশে জ্যোতিষ বহু পূর্ব্বকাল হইতে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন্ সময়ে এই দেশে ইহার প্রথম প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। এই দুঃসাধ্য সাধন সম্পাদনের জন্য যে সকল অনুমানের সহায়তা লইতে পারা যায়, যাহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি, তাহা এরূপ অল্প সংখ্যক যে, আমরা ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য ও ভ্রমশূন্য হইবে না, তথাচ আমরা যে ক্রমেই সত্যের নিকটবর্ত্তী হইব, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। পুরাকালে এই শাস্ত্র মানব-ভাগ্য সম্বন্ধে একপ্রকার ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিবেচিত হইত। যদি আকাশে গ্রহণ হইল, অথবা ধূমকেতু উঠিল, তাহা হইলে হুলস্থূল ব্যাপার! রাজার রাজ্যধ্বংস হইবে, রাজত্বে বিদ্রোহ হইবে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে ইত্যাদি বিপদ্ সংঘটনের অনুমান করিয়া দেশবাসী, গ্রামবাসী, নগরবাসী সকলেই মহাভীত হইতেন, নিস্তার নাই;—সকলকেই মরিতে হইবে। কত রাজা যুদ্ধ সময়ে এই সকল কারণবশতঃ রণে ভঙ্গ দিয়াছেন, কত রাজা শত্রুর পদানত হইয়া কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার স্থির নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চীন দেশেও যে এই মত প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সহিত পরস্পর কোন সংস্রব ছিল না, এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আ৺ ।জানি না। আমরা শুনিতে পাই যে খৃষ্টে চতুর্থ শতাব্দীতে অনেক চীনবাসী এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসেন, সুতরাং ইহার পুর্ব্বে যদি চীনের সহিত সংস্রব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই সময়ের প্রমাণের প্রয়োজন নাই; যেহেতু চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বকালীন উভয় দেশীয় জ্যোতিষ ঐক্য কিম্বা অনৈক্য হউক, মিলুক বা নাই মিলুক, যখন আমরা সেইকালের সংস্রব মাত্রই অস্বীকার করিতেছি, তখন ইহা নিশ্চয় যে, উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে কেহই কাহার নিকট ঋণী নহেন।

ফাদার গবিল (Father Gaubil) চীনদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র লইয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ঐ দেশীয় ঐ শাস্ত্রের সকল বিষয় লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই শাস্ত্রসম্বন্ধীয় চুকিং নামক আর একখানি পুস্তকে লিখিত আছে যে, চীনবাসীদিগের গ্রহণ গণনার কাল খৃষ্টের ২৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে, কিন্তু তাহার অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদিগের গণনার কাল দেখিতে পাওয়া যায় (৬)।

(৬) The most curious of all the Indian tables are those brought from Trivalore by Mr. Le Gentil and analysed atlength by Bailly in his Indian Astronomy (chap. II). The

ইহার অনেক পরে ৭২০ হইতে ৪৮১ অব্দ পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ) চীনবাসীরা এই শাস্ত্রের অধিক উন্নতি করিয়া উঠিতে পারেন নাই; বাল্যকালে যে গ্রহণগণনা, অধিক কিছুই শিক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রহণই জ্যোতিঃশাস্ত্র, এই তাঁহাদিগের জ্ঞান ছিল, সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব, যে সেই শাস্ত্র, যাহার এরূপ দুরবস্থা, সেই শাস্ত্রের নিকট আর্য্যেরা ঋণী।

আবার দেখা যায় যে খৃষ্টের ১৬৪ বৎসর পরে (৭) চীনবাসীরা রোমীয়দিগের সহিত গতিবিধি আরম্ভ করে, এবং ইহাতে এই স্থির করা যাইতে পারে, যে চীনেরা রোমীয়দিগের নিকট হইতে আপনাদিগের শাস্ত্রের পুষ্টতা সম্পাদন করিয়াছেন। অত্র সাময়িক হিন্দুরা চীনবাসীদিগের নিকট হইতে আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, একথা নিতান্ত অযৌক্তিক, কারণ যে জাতির যে বিষয় এরূপ দুরবস্থায় পতিত, যাঁহারা বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে তাহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন, সেই জাতির নিকটেই যে আর্য্যেরা সেই বিষয়ের জন্য ঋণী হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

যে বীর দস্যু সমস্ত ভারতকে বিলোড়িত করে, সেই জেঙ্গিস্ খাঁ কর্ত্তৃক ১২১৬ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে চীনদেশ জয়সম্পাদিত হয়, এবং সেই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও ইজীপ্টবাসী কতিপয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আসিয়া চীনদেশের মৃতবৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে, কিন্তু সে ১২১৬ খৃষ্টাব্দ, মধ্যকাল, (Middle ages) তাহার সহিত আদিম হিন্দুদিগের কোন সংস্রব নাই, এবং মধ্যকালের অসংস্রবতা প্রদর্শন করাও এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়; ফলে এখন এই দেখান গেল, যে আদিম হিন্দুরা আদিম চীনবাসীদিগের নিকট উক্ত শাস্ত্রসম্বন্ধে ঋণী নহেন (৮)।

দ্বিতীয়,—আরব ও পারস্যবাসী।

অতি প্রাচীন কালে এই দুই জাতি ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। বন-

---

epoch of these tables is the year 3102 before Christ at which time they suppose a general injunction on the ecliptic of the sun, moon and planets. Library of useful knowledge. Natural Philosophy. History of Astronomy. p. 9.

(৭) It seems that, about the year 164 after Christ, the Chinese began to have communication with subjects of the Roman empire. Ibid. p. 6.

(৮) The conquest of China by Gent-chis-Khan, who brought with him men well versed in the astronomy of Ptolemy and the Arabs, gave a fresh impulse to the languid state of the Chinese astronomy; but the ameliorations then introduced belong rather to the history of middle ages. Ibid. p. 7

মধ্যস্থিত সামান্য কুটীর ইহাদিগের আবাস-স্থল, অরণ্যজাত ফল মূলাদি ও অসীম শ্রম-জনিত শিকারপ্রাপ্ত পশ্বাদি ইহাদিগের খাদ্য এবং নিরপরাধী পথিকের উপর অত্যাচার ও তাহাদিগের ধনলুণ্ঠন ইহা-দিগের ব্যবসায়। এই অবস্থাগত জাতি-দিগের মধ্যে শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে কিছুমাত্রও উন্নতি ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উন্নতি সভ্যতার ফল, এবং অর্থসংগ্রহ সভ্যতার অন্যতর কারণ। ধনোপার্জ্জন ব্যতিরেকে যে কোন জাতি সভ্যতার সোপান-শ্রেণীতে অধিরোহণ করিতে পারে না, এবং সেই সভ্যতার চরম সীমায় উপস্থিত হইতে না পারিলে যে, জ্ঞানোন্নতি, শাস্ত্রোন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতি কাহাকেও লাভ করা যায় না, তাহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং আদিম অব-নতির দরিদ্রতাই মুখ্য কারণ। আরব ও পারস্যবাসীরা এই দশাগ্রস্ত হইয়া বহুদিন অসভ্য অবস্থায় ছিল। কিন্তু যখন তাহা-দের বাহুবল ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠিল, যখন জিগীষাবৃত্তি তাহাদিগের প্রত্যেকের অন্তরে জাগিয়া উঠিল, তখন তাহাদিগের জ্ঞান হইল। অল্পদিন মধ্যে ইজীপ্ট জয় করিয়া ফেলিল এবং জয়-পতাকা পূর্ব্ব-গামিনী হইয়া ক্রমশঃ পঞ্জাব দেশে অধি-স্থাপিত হইল—তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র-সমালোচনা দেশমধ্যে সর্ব্বত্র আলোচিত হইতে আরম্ভ হইল এবং অল্প দিবসমধ্যে অসামান্য অনু-সন্ধানবেত্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগি-লেন। এই জয়ারম্ভের কাল অষ্টম শতাব্দী। এই তাঁহাদিগের শাস্ত্রের বিশেষতঃ জ্যোতি-ষের আরম্ভ—বাল্যাবস্থা মাত্র। ইহার অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুদিগের জ্যোতিষ এক প্রকার পূর্ণাবয়বতা ও সম্যক্ সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং এতৎ-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের আদিমত্বের বিপরীত প্রমাণ এক প্রকার অপ্রাপ্য (৯)।

তৃতীয়,—রোমবাসী।

ইহাঁরা এক কালে সভ্যজাতির আদর্শ ছিলেন। সমস্ত ইউরোপকে পদানত করিয়া ইহাঁরা যেরূপ বুদ্ধি ও কৌশলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে এ দেশে শাস্ত্রো-ন্নতি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই উন্নতি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে যে হইয়াছিল, তাহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সাহিত্যভাণ্ডার বলিয়া এই দেশকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, অন্যান্য শাস্ত্রেও যে ইহাদিগের বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল, ইহাও হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও যে জ্যোতিষে তাঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন, এ

(৯) The age of the tables of Brahma Gupta as fixed by Mr. Bentelly decides one question by showing that the *Indian astronomy was not originally borrowed from the Arabs* Library of useful Knowledge. Natural Philosophy. vol. III History of Astronomy. p. 12.

কথা আমরা স্বীকার করি না। পূরাকালে সাহিত্য সম্বন্ধীয়োন্নতি আশা ইহাঁদিগের মনে এরূপ বলবতী ছিল—এবং এই উন্নতি সকলের অন্তঃকরণে জাগরিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের মনে যেরূপ ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, যে তাঁহারা দেশ-মধ্যে এ কথা রাষ্ট্র করিয়া দেন যে, যে ব্যক্তি এই শাস্ত্রভিন্ন অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তিনি আর সভ্যশ্রেণীতে গণনীয় হইবেন না। কি পূর্ব্বকাল, কি মধ্যকাল, কি বর্ত্তমানকাল চিরকালই রোমীয়দিগের মনে এই ভাব এরূপ বলবান্ ছিল, যে তাঁহারা জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না (১০) সুতরাং ইহাদিগের নিকট আর্য্যজ্যোতিষ ঋণী হইতে পারে না।

চতুর্থ,—গ্রীসবাসী।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সহিত প্রাচীন গ্রীকদিগের যে গতিবিধি ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই জাতিদ্বয়ই সর্ব্ব প্রথমে সভ্য হইয়াছিল। পার্শ্বস্থ সকল জাতিই মূর্খতা ও অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন—কেহই সে সময়ে উহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। এই দুই জাতির মধ্যে শাস্ত্রসম্বন্ধোন্নতিও প্রায় এক প্রকার, এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে পরস্পর অনেক সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সৌসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব বলিয়াছেন, যে আর্য্যজ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। কিন্তু এ কথা, যত আমরা বুঝিতে পারি, নিতান্ত অসঙ্গত। এই কথার সমর্থনার্থ যে কয়েকটী প্রমাণ দেখান যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রদর্শন করাণ আমাদের বাসনা, যে তাহাদের একটীও সুযুক্তি নহে।

১। জ্যোতিষের কিয়দংশের উন্নতি ও অপরাংশের অবনতি।

জ্যোতিষের যে স্থল উন্নতি লাভ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থলই যবনদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত, এবং যে স্থানে অবনতি তাহাই স্বকীয় বুদ্ধির ফল এই কথাই প্রায় রাষ্ট্র। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যখন একটী ফলের (effect) দুইটী কারণ (cause) দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই ফলটী একটী কারণ হইতে হইয়াছে, ইহা অবশ্য অনুমেয়। কিন্তু কোন্‌টী হইতে কে বলিবে? মনে কর তুমি কোন ব্যক্তির মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিলে, তুমি, কোন্ নির্দ্দিষ্ট পাড়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে অনুমান করিবে? সেইরূপ এই প্রমাণ-সম্বন্ধে আমরা আর

(১০) It is impossible to pay any attention to the history of the Romans, without perceiving that in that nation there prevailed at all times a singular indisposition to the pursuit of mathematical and Physical science. Libray of useful Knowlege—Natural Philosophy. vol III. History of Astronomy. p. 35.

একটী কারণ দেখাইতে পারি। অতি পূর্ব্বে যে সকল মহোদয়েরা এই শাস্ত্রের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার সকলাংশের উন্নতি সমভাবে করিয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ ইহা এরূপ বিস্তৃত, যে তাঁহাদের জীবন কাল মধ্যে ইহার পুষ্টতা সম্পাদিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং তাঁহারা যতদূর পারিয়াছিলেন ইহার উন্নতি সাধনে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলে পর তদ্বৎ ধীসম্পন্ন এমন কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি ঐ শাস্ত্রের অবশিষ্টাংশ পূর্ব্বাংশের ন্যায় করিয়া তুলেন। এখন এই প্রমাণ সম্বন্ধে দুইটী কারণ দেখা যাইতেছে, ১ম, যে স্থল যবনদিগের নিকট হইতে গৃহীত তাহারই উন্নতি, অবশিষ্টাংশের অবনতি, এবং ২য়, বিখ্যাত আদিম আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদেরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অতিশয় বিস্তৃততা হেতু তাঁহাদের জীবনকালের মধ্যে যতদুর সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন, ততদূরের উন্নতি, অপরাংশের অবনতি। প্রথমটী বিপক্ষ, দ্বিতীয়টী সাপেক্ষ। বিপক্ষীয়েরা যখন প্রথমটীকে সত্যকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তখন আমরাও দ্বিতীয়টীকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব; প্রথমটী গ্রহণে তাঁহাদের যে ক্ষমতা, দ্বিতীয়টী গ্রহণেও আমাদের সেই ক্ষমতা।

২। প্রাচীন আর্য্যদিগের "রোমক সিদ্ধান্ত" নামক পুস্তকের প্রণয়ন।

যদ্যপি আর্য্যদিগের মধ্যে উক্তনামা কোন পুস্তক থাকে, তাহা হইলে গ্রীকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের শাস্ত্রের উন্নতি, একথা কে বলিবে? আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে রোমক শব্দে রোমকে (Rome) বুঝায়, সুতরাং এই কারণ যদি আর্য্যেরা কাহারও নিকট ঋণী হয়েন, তাহা হইলে রোমীয় ভিন্ন আর কাহারও নিকটে নহে কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি, যে আর্য্যেরা রোমীয়দিগের নিকট ঋণী নহেন।

গ্রীকজ্যোতিষের সহিত আর্য্যজ্যোতিষের অনেক স্থলে ঐক্য আছে। কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

কারণ যদি আর্য্যেরা এই প্রমাণে গ্রীকদিগের নিকট ঋণী হয়েন। তাহা হইলে আমরাও এই প্রমাণে গ্রীকদিগকে আর্য্যজাতির নিকট ঋণী বলিতে পারি।

ইহা ভিন্ন বিপক্ষীয়দিগের আরও অনেক গুলি প্রমাণ আছে, কিন্তু তাহারা বিশেষ প্রামাণ্য না হওয়াতে এখানে আর তাহাদের কোন উল্লেখ করা গেল না।

এক্ষণে হিন্দুদিগের সাপেক্ষ প্রমাণ গুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

১। আমরা দেখিতে পাই, যে, গ্রীকদিগের জ্যোতিষ ইজীপ্সিয়ানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত (১১)। এবং আমরা পূর্ব্বেই

(১১) The greeks derived their astronomical Knowledge from the

প্রমাণ করিয়াছি যে ইজীপ্‌সিয়ানদিগের নিকট হইতে আর্য্যজ্যোতিষ গৃহীত হয় নাই সুতরাং ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে গ্রীকদিগের নিকটেও আর্য্যজ্যোতিষ ঋণী নহে।

২। ইতিহাসবেত্তা এল্‌ফিন্‌সটোন্ (Elphinstone) সাহেব বলেন, যে যদ্যপি হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই গ্রহণের কাল হিন্দুদিগের শাস্ত্রের অনেক উন্নতির পর (১২)। ইহাতে এই স্থির করা যাইতে পারে যে আর্য্যজ্যোতিষের ঋণ-সম্বন্ধে উক্ত সাহেবের সম্পূর্ণ সংশয় আছে। ফলে, এক্ষণে এই প্রদর্শন করাণ আবশ্যক, যে পরেই হউক কিম্বা পূর্ব্বেই হউক, কোন সময়েই আর্য্যেরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে আপনাদিগের জ্যোতিষের পুষ্টতা সম্পাদন করেন নাই।

আমরা দেখিতে পাই, যে গ্রীসের জ্যোতিষের যথার্থ ইতিহাস থেলস্ (Thales) নামক জ্যোতির্ব্বেত্তা হইতেই আরম্ভ হয়, উহার কাল খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্ব (১৩)।

পুনশ্চ দেখা যায়, যখন মিড্‌স্ (Medes) ও সিদিয়ান্‌সেরা (Sythians) ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তখন আকাশে গ্রহণ দেখিয়া সৈন্যদলদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে (১৪)। এই গ্রহণই উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ থেলস্ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এবং ইহাও কথিত আছে, যে গ্রীকদিগের মধ্যে এইটীই প্রথম গণনা। ফলে ইহা প্রথমই হউক আর দ্বিতীয়ই হউক, হিন্দুদিগের গ্রহণ গণনা গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই, একথা সুপ্রসিদ্ধ সাহেব জেন্‌টিল্ (Le Gentil) এবং ডেভিস্ (Mr. Davis) স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন(১৫)।

Egyptians in the first place. Beeton's Scientfic Dictionary, Astronomy.

(১২) It seems probable that if the Hindus borrowed at all, it was after their astronomy had made considerable progress. Elphinstone's History of India.

(১৩) With the Greek philosopher Thales, who flowrished abount 640 B. C. the real and reliable records of facts connected with the history of astronomy may be cosidered to commence. Beeton's Astronomy.

(১৪) See History of Astronomy. Library of useful Knowledge Natural Philosophy. p. 18.

এবং Taylor's Manual of Ancient History. p. 61.

(১৫) The Indian methods for the calculation of eclipses which have explained atlength by Le Gentil and Mr. Dairs are extremely curi-

পুনশ্চ সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্‌স বলেন, যে আর্য্যেরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে যে কিছু লইয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা সকল ম্লেচ্ছদিগকে বিশেষতঃ গ্রীকদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, এমন কি তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ জনরব প্রচলিত ছিল, যে যবন অপেক্ষা নীচ জাতি পৃথিবীতে আর নাই, এবং যবন শব্দেও গ্রীকদিগকে বুঝাইত (১৬)।

আমরা এক্ষণে একে একে সপ্রমাণ করিলাম, যে আর্য্যেরা কোনও জাতির নিকট হইতে আপনাদিগের জ্যোতিষের উন্নতি লাভ করেন নাই—এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা কাহারও নিকট ঋণী নহেন।

শ্রীমঃ

ous and bear certainly the appearance of originality. History of Astronomy Library of useful Knowledge. Natural Philo. p. 12.

(১৬) See Asiatic Researches vol. II. p. 302.

দৈববাণী।

১

এ কি রে!

একে ঘোর অমানিশি অন্ধকারময়,
নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর!
তাহে কালিমাখা মেঘ আকাশে উদয়!
বহিছে সবেগে পুন প্রবল সমীর।
উন্মত্ত হইয়া বায়ু মেঘখণ্ড গুলি
ছড়াইছে অবিশ্রামে, যাইছে মিশিয়া;
দেখি তা পবন পুন হুহুঙ্কার তুলি,
আনিছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়া!
সর্ব্বনাশ!—কি বিপদ্!—ভীষণ আঁধার!
এ কিরে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার!

২

চমকি চমকি ওঠে বিদ্যুতের রেখা;
সাগর-সলিলে যেন বাড়ব দহন!
অথবা নরক-হ্রদে অগ্নিময়ী লেখা
পাপীরে দেখাতে ভয়, দেয় দরশন!
গরজে গভীর ডাকে জলধর দল,
হুড় হুড়, গুড় গুড়, চমকে হৃদয়!
অশনির শব্দ পুন কাঁপায় ভূতল;
সুগভীর সমস্বরে (হেন বোধ হয়)
উঠিছে গর্জ্জিয়া যেন সিংহ শত শত;
আকুল ভূতলবাসী ভয়ে থতমত!

৩

তড় তড় বৃষ্টিধারা মূষল ধারায়
অজস্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ;
ক্রমে ঝমাঝম্ শব্দ কাণে শোনা যায়,
ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীরণ।
উচ্চ তালতরু শিরে, অচল চূড়ায়
কড় কড় ঘোর রবে বজ্রপাত হয়;
ঝটিকার পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়
মূল সহ বড় বড় বনস্পতিচয়!

এ কি রে, প্রলয় নাকি ! আজি ধরাতল
লীলা সম্বরিয়া বুঝি যায় রসাতল !

৪

ঝটিকার শন্‌শনি, মেঘের গর্জ্জন,
জীবন-সংহারকারী কুলিশ-হুঙ্কার,
মুমূর্ষু সমান যত জীবের রোদন
পূরিল আকাশগর্ভ, ক্ষুব্ধ চারিধার !
এ হ'তে গভীরতর, এমন সময়,
উঠিল গর্জ্জন এক আকাশ উপরে,
ক্ষিপ্ত নিসর্গেরে দমি সে গর্জ্জন হয়,
বন্দুকেরে হারাইয়ে ভয়ানক স্বরে
গরজে কামান যেন ! সহসা তাহায়
শুনা গেল কটি কথা, (হৃদি চমকায় !)

৫

" উঠ রে নির্জ্জীব * * * জাতি, খোলো রে নয়ন !
আরো কি ঘুমায়ে রবি আলস্য-শয়নে ?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ?
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে ?
কত কাল গত হলো, তবুও এখন্
মিটিল না নিদ্রা-সুখ ? একি বিড়ম্বনা !
আরো কি অসাড় হয়ে, শবের মতন,
প'ড়ে রবি ? আ'জো কি রে হ'ল না চেতনা ?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি, অলস জাতি, হয় না চেতনা ?

৬

" উষারে সমুখে করি তপন যখন
পূর্ব্বভাগে রক্তরাগে সমুদিত হয়,
সামান্য তির্য্যগ্‌যোনি পশু পাখিগণ
ওঠে সবে সে সময়ে, ঘুমায়ে কি রয় ?
কিন্তু, হায়, কত নিশি প্রভাত হইল ;
কতবার সূর্য্যদেব উঠিল গগনে ;
তথাপি তোদের নিদ্রা আ'জো না ভাঙ্গিল,
অলস হইয়া আছ আলস্য-শয়নে !
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমায়ো না আর,
উঠ রে অলস জাতি উঠ রে এবার !

৭

" এ দুর্যোগ শান্ত হ'লে, কিঞ্চিৎ গউণে,
আবার উঠিবে রবি অযুত বিভায় ।
সাবধান, দেখো, যেন দেখে না নয়নে
সে রবি তোদের ছবি শয়িত দশায় !
আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকারে,
যদি না উঠিস্ তোরা, তা হ'লে কি আর,
উঠিবি কখনো কারো আহ্বান-ফুৎকারে,
এ হেন শবের দশা করি পরিহার ?
সে আশা বিফল—তাহা হবে না কখন,
আজি না জাগিলে, জাগা বৃথা আকিঞ্চন !

৮

" উন্মত্ত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,
(দেখ্ রে নির্জ্জীব, তোরা দেখ্ রে চাহিয়া)
যে গর্জ্জন করিতেছি, মহীধর ফাটে ;
থর থর কাঁপে ধরা হেলিয়া দুলিয়া !
তথাপি তোদের, হায়, নিদ্রা নাহি ছাড়ে,
এতই বধির তোরা, শ্রবণ-শকতি
নাহি কিরে অণুমাত্র ? আলস্য অসাড়ে
বিলুপ্ত কি হ'ল তাহা ? ধিক্ নীচমতি !
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমায়ো না আর,
উঠ রে অলস জাতি উঠ রে এবার ! "

৯

এত বলি সে গর্জ্জন আরো গরজিল,
যথা বীর মেঘনাদ মেঘের আড়ালে
বীরমদে বীরকণ্ঠে ঘোর হুঙ্কারিল,
বধিতে রাঘব-সেনা খর শরজালে!
পুনশ্চ এ কথা গুলি সে গর্জ্জন কয়;—
" হায় রে অলসজাতি, এখনো কি সুখে
কুম্ভকর্ণ-সম সবে ঘুমাইয়া রয়?
পাদুকা-সমেত কত পদাঘাত বুকে
করিছে তোদের শত্রু; নীচাশ কুঞ্জর
পদ্মকুলে দলি যেন ভাঙ্গিছে পঞ্জর!

১০

" তবু কি চেতনা নাই? বুঝেছি এবার,
অসার, অসাড় তোরা পর্শবোধ নাই!
তা যদি থাকিত, তবে পাদুকাপ্রহার
সহিয়া থাকিস্ আ'জো? ভাবি আমি তাই!
অরির পাদুকা কি রে মিষ্ট লাগিয়াছে?
স্বদেশে স্বাধীন থাকা তিক্ত বোধ হয়?
গরলে অমৃত বোধ এবে হইয়াছে;
অমৃতে গরল জ্ঞান মানসে উদয়!
এ রুচি কিরূপে হ'ল? তারাই কি তোরা,
স্বাধীনতা একদিকে—একদিকে ছোরা?

১১

" তারা হ'লে আ'জো কেন শত্রুপদতলে
মর্দ্দিত হইছ, ভীরু, কর্দ্দমের মত?
পাষাণ-দশন-যাঁতা আ'জো কি রে দলে
তোদেরে গোধূম সম পিশিয়া সতত?
সে জাতি নহিস্ তোরা, সে শোণিত নাই,
মেষের শাবক তোরা কেশরি-ঔরসে!
তোদের মতন ভীরু নাহি কোনো ঠাঁই,
ভূমিলতা তোরা, ভীরু, সুধার সরসে!
তীক্ষ্ণ-বিষ-অজগর-মুখের বিবরে
বিষহীন ঢোঁড়া সাপ এবে রে বিচরে!

১২

" উঠ, ভীরু, সাহসেরে করিয়া সহায়,
জাতীয় বিদ্বেষ ছাড়ি, একতাবন্ধন
করিতে যতন কর, দিন বয়ে যায়,
সময় ফুরালে কার্য্য হয় কি সাধন?
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু,
কেন রে তৎপর এত? জাতীয় গৌরব
ভুলি কেন বাঁধ কৃতদাসত্বের সেতু
জীবন সাগরে; তারে করিলি রৌরব!
উঠ, ভীরু, সাহসেরে সহায় করিয়া,
পূর্ব্ব পিতামহগণে বারেক স্মরিয়া।

১৩

" একতা না হ'লে কিছু হয় না সাধন,
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া
' একতাই জগতের উন্নতিকারণ।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
' একতা অরির অরি, দুর্ব্বলের বল '
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
' একতারই পদতলে চলে ভূমণ্ডল '
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
' একতা ঈশ্বর-অংশ, অমূল্য রতন '
উঠ রে নির্জ্জীব জাতি করিয়া স্মরণ!

১৪

" বারুদের পরাক্রম, জানতো সকলে,
গুঁড়ায় ভূধর দেহ; দেয় উড়াইয়া
দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্য্য বলে;
নিবিড় কানন ভস্ম করে পুড়াইয়া।

কিসে তা? এ কথা যদি সুধাও কাহারে,
'একতা' উত্তর তার তখনি পাইবে,
সূক্ষ্ম তৃণ, একতায় বাঁধিবারে পারে
মদমত্ত গজবরে; কে না তা কহিবে?
অন্য কথা দূরে যাক্; আ'জের ঘটন,
চেয়ে দেখ, একতাই ইহার কারণ!

১৫

"একত্র মিলিলে পরে সলিল আগুনে
লৌহযন্ত্র অনায়াসে করে রে চালন!
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গুলি একতার গুণে,
দেখ রে, দুরূহ কার্য্য করে সম্পাদন।
মানব হইয়া তোরা মানব-সমাজে
তবে কেন হেন হ'লি? কি লজ্জার কথা!
ভীরুতা-কালিমা মাখা বদন কি লাজে
দেখাইস্, তেয়াগিয়া স্বর্গীয় একতা?
একতা-অমৃত-শূন্য যাহার জীবন,
মরণে জীবন তার, জীবনে মরণ!

১৬

"উঠ রে, উঠ রে, উঠ, কর গাত্রোত্থান,
একতা, সাহস সহ কর আলিঙ্গন!
এখনি দেখিবি পুন বিজয় নিশান
উড়িবে তোদের ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ।
দেশের দুর্দ্দশা দেখি হও রে কাতর,
এখনি সাহস আসি হইবে সহায়
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর?
স্বজাতির দশা দেখ—পাবে একতায়।
পিতৃপিতামহগণে কর রে স্মরণ,
জড়তা ঘুচিবে—পাবে নূতন জীবন।

১৭

"কই রে, এখনো আঁখি কেহ যে খোলে না!
এরা কি জীবিত নাই? মরেছে সকলে?
এ হেন গর্জ্জনে কেউ মস্তক তোলে না,
কি লজ্জা; এখনো এরা শয়িত কি ব'লে?
মরে নাই—বেঁচে আছে—তবে কি কারণ
উঠে না, মিলে না আঁখি? বুজেছি এবার;—
আলস্য-ভাণ্ডার এরা দাসত্বজীবন,
শত্রুপদাঘাতে সুখী অন্তর সবার!
কাজ নাই—বৃথা বলা—অরণ্যে রোদন,
দেববাক্যে শ্রদ্ধা নাই; নিশ্চয় পতন!!"

১৮

নিরুত্তর দৈববাণী; বাড়িল বাতাস,
বৃষ্টিধারা আরো জোরে পড়িতে লাগিল,
অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ
ফেলিল নিশ্বাস যেন; বিষাদে কাঁদিল
নির্জ্জীব জাতির তরে; চমকে তড়িত,
ক্রোধে দুঃখে যেন তাঁর নয়ন জ্বলিল!
চড়াৎ করিয়া বজ্র হইল পতিত,
দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল;—
"যতকাল ইহাদের না হবে সাহস,
না হবে একতা, এরা রবে পরবশ!"

১৯

থামিল প্রচণ্ড ঝড়; স্থির চারিধার;
চলিল জলদকুল থমকে থমকে;
লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার;
ক্বচিৎ হসিত মুখে বিজলী চমকে।
নির্ম্মল আকাশতল, কিন্তু তমোময়,
মার্জ্জিত তারকা গুলি অম্বরেতে ভাসে;
দিগম্বরী কালী যেন হইয়া উদয়,

আনন্দে মগন হয়ে ঘন ঘন হাসে।
এই যে ক্ষণেক আগে কি ছিল প্রকৃতি;
আবার ক্ষণেক পরে নূতন আকৃতি।

২০

সহসা এমন কালে সুদূর অম্বরে
ঘোর রবে দেবশৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল;
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ ভরে
সে শৃঙ্গনিনাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল।
" আজিকার এ দুর্যোগ —জে'নরে নিশ্চয়—
আমার পরম-বন্ধু সাহস-মূরতি !
দৈববাণী যে কহিল—জেন'রে নিশ্চয়—
আমি সে একতা, নাম খ্যাত ত্রিজগতি !"
সে শৃঙ্গ-নিনাদ-সহ এ কটি বচন
শুনা গেল ; ক্ষণ পরে নীরব গগন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বাহ্যোত্তাপ ও আন্তরিকোত্তাপ

উত্তাপ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা আর কিছুই নহে, গতি প্রভৃতির (Motion, electricity.) নামান্তর অথবা বিকার মাত্র। মনে কর, এক খণ্ড লৌহ, সজোরে প্রাচীরের দিকে নিক্ষেপ করিলাম। লৌহ-খণ্ড প্রাচীরে আঘাতিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। যে পরিমাণে (Velocity or Rate of motion.) উহা প্রাচীরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীর না থাকিলে উহা যত দূর যাইত, প্রাচীরে ঠেকিয়া সেই পরিমাণে ফিরিল না, তাহাতে আমরা এই স্থির করিতে পারি যে, ইহার কিয়দংশ গতি কমিয়াছে। নষ্ট হইয়াছে অথবা ধ্বংস হইয়াছে, একথা বলিতে পারি না, যেহেতু পৃথিবীর কিছুই ধ্বংস বা নষ্ট হইতে পারে না। পৃথিবীর কণামাত্রও যে ধ্বংস হইতেছে না, হইতে পারে না এবং কালেও হইবে না, ইহা আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এক পরমাণুও যে সময়ে শূন্যরূপে পরিণত হইবে, ইহা আমাদের বিবেচনাতীত, বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং যে গতিটুকু কমিয়াছে, সেটুকু যে ধ্বংস হইয়াছে, একথা আমরা বলিতে পারি না। তবে উহা কোথায় যাইল ? বিজ্ঞানবিদেরা বলিবেন, উহা উত্তাপে পরিণত হইয়াছে, কারণ প্রাচীরের যে স্থলে উক্ত লৌহ খণ্ড আঘাত করিয়াছিল, সেই স্থলে হাত দিয়া দেখিলেই আমরা উত্তাপ অনুভব করিতে পারিব। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠে কিয়ৎকাল ঘর্ষণ করিলেই উহারা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং এমন কি অগ্নিস্ফুলিঙ্গও বহির্গত হইতে পারে। আমরা বিজন-বনে যে দাবানলের কথা শুনিতে পাই, তাহা আর কিছুই নহে, বায়ুসঞ্চালিত দুইটী বা তদধিক সন্নিকটস্থ বৃক্ষের ঘর্ষণ মাত্রই ইহার কারণ। ভূমিকম্পও এই উত্তাপের আর একটী ফল,

পৃথিবীর অভ্যন্তরে চিরকালই উত্তাপ প্রবেশ করিতেছে। যখন পৃথিবী আর অধিক উত্তাপ ধারণ করিতে পারেন না, তখন ভূমিকম্প প্রভৃতির দ্বারা সেই উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। যদি একবারও ভূমিকম্প না হইত, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবী এত দিনে অকালে লয়প্রাপ্ত হইত।

উত্তাপের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দৃঢ় দ্রব্যকে (Solid) তরল (Lequid) করিতে পারে, তরলকে বাষ্পীয় (Gaslous) করিতে পারে। কোন দৃঢ় দ্রব্যকে তরলাকারে পরিণত করা আর কিছুই নহে, কেবল তাহার পরমাণুগণকে (যাহারা পূর্ব্বে পরস্পর দৃঢ় সংশ্লিষ্ট ছিল) পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করা। আবার তরল পদার্থের পরমাণুগণকে আরও বিশ্লিষ্ট করিলে উহা বাষ্প হইয়া যায়।

এবিষয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এক খণ্ড সীসা বা অন্য কোন ধাতুকে (লৌহকে তরল ও বাষ্প-রূপে পরিণত করিতে হইলে অত্যধিক উত্তাপের আবশ্যক। অগ্নির উত্তাপে তাহা সংসাধিত হইতে পারে না—উহা রাসায়নিকোত্তাপসাপেক্ষ। এবম্বিধ আরও অনেক প্রকার ধাতু আছে।) ক্ষণকাল অগ্নির উত্তাপ লাগাইলেই উহা তরল হইয়া যাইবে এবং আরও অধিক উত্তাপ লাগাইলে উহা বাষ্পাকার ধারণ করিবে।

সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তরল ও বাষ্পীয় দ্রব্য মাত্রেই—উত্তাপের আধিক্য আছে। তাহা না হইলে উহারা তরল বা বাষ্পীয়াকার ধারণ করিয়া থাকিতে পারিত না। এতদ্বিষয়ে একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে, যথা জল। জল তরল পদার্থ, সুতরাং ইহাতে উত্তাপ অবশ্যই আছে। হস্ত দিয়া দেখিলে হয়ত আমরা জলকে অত্যন্ত শীতল অনুভব করিব, কিন্তু তথাপি উহাতে অত্যধিক পরিমাণে উত্তাপ আছে, না থাকিলে উহা এরূপ তরল ভাবে থাকিতে পারিত না।

আমরা এক্ষণে যে উত্তাপের কথা উল্লেখ করিলাম, অর্থাৎ যাহা গতির নামান্তর বা বিকার মাত্র, তাহাকে বাহ্য উত্তাপ (Physical heat) বলা যায়।

এক্ষনে আন্তরিক উত্তাপ (Animal heat) কাহাকে বলে, দেখা উচিত।

শরীরে হস্তাবমর্ষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাই, যে, ইহাতে উত্তাপ আছে। যখন আমরা শরীরে উত্তাপের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না, তখনই আমরা জানিতে পারি, যে, শরীরের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। শরীরের সকল অংশেই এই উত্তাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আন্তরিক উত্তাপ।

আমরা এক্ষণে এই দেখাইব, যে এই উভয় প্রকার উত্তাপ, অর্থাৎ বাহ্যোত্তাপ ও আন্তরিকোত্তাপ, একই পদার্থ, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদই নাই। দুই প্রকার উত্তাপ হইতে দুইটী উদাহরণ দিলেই ইহাদের অভেদত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে।

প্রথম বাহ্যোত্তাপ।

একটী জলপূর্ণ মৃৎকুম্ভ ক্ষণকাল বায়ুতে রাখিয়া দিলেই অনুভূত হইবে যে, কুম্ভস্থ জল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শীতল হইয়াছে। ইহার কারণ কি? মৃত্তিকার পরমাণুগণ অত্যধিক দৃঢ় সংশ্লিষ্ট না হওয়াতে কুম্ভস্থ জল কুম্ভ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে। সুতরাং অল্প সময় মধ্যেই কলস পাত্রে জলবিন্দু দেখা যাইবে, দেখিতে দেখিতে তাহা আবার অদৃশ্য হইবে। সে জলবিন্দু কোথায় গেল? বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জল তরলাবস্থাতে কখন বায়ুতে মিশাইতে পারে না, সুতরাং মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বে জলকে বাষ্পীয়াকার ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তরল পদার্থকে বাষ্পীয় করিতে হইলে উত্তাপের আবশ্যক। এ উত্তাপেরইবা সম্ভব কোথা হইতে? বায়ুতে উত্তাপ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু ইহা এরূপ দ্রুতগামী যে, ইহার উত্তাপ জলকে এত শীঘ্র বাষ্পীয় করিতে পারে না। সুতরাং কুম্ভস্থ জলে যে উত্তাপ (Latent heat) আছে, তাহাই মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া বাহিরের জলবিন্দুকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ফেলে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, জল হইতে কিয়দংশ উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, এবং এই কারণেই আমরা ইহাকে অপেক্ষাকৃত শীতল অনুভব করিয়া থাকি।

ধাতুপাত্রের জল শীঘ্র শীতল হয় না, ইহার কারণ, ইহাতে জল চোয়াইতে পারে না।

দ্বিতীয় আন্তরিকোত্তাপ।

আমাদিগের মাথা ধরিলে, অথবা অন্য কোন মস্তকের পীড়া হইলে, আমরা মাথায় সাধারণতঃ জল, বা গোলাব জল দিয়া থাকি। ক্ষণকাল পরেই সেই জল বায়ুসঙ্গে মিশাইয়া যায়। কিন্তু মিশাইবার পূর্ব্বেই ইহা উত্তাপ কর্ত্তৃক বাষ্প হইয়া গিয়া থাকে। বায়ুর উত্তাপে যে এ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং মস্তকের উত্তাপ বাহিরে আসিয়া একার্য্য সম্পন্ন করে। অতএব মস্তকের উত্তাপ কিয়দংশ কমিয়া যায়, এবং আমরা আমাদিগকে সুস্থ অনুমান করিয়া থাকি।

আমরা আরও দেখিতে পাই, যে, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া যদি শরীরেই শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা শরীর শীতল অনুভব করি।

উপর্য্যুক্ত উদাহরণদ্বয় দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে, শরীরের উত্তাপ ও জলের উত্তাপ একই পদার্থ। প্রথমটী আন্তরিক, দ্বিতীয়টী বাহ্যোত্তাপ—অতএব এই উভয় প্রকার উত্তাপের অভিন্নতা-সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন আপত্তি করা যাইতে পারে না।

শ্রীমঃ

পূর্ণশশী।

জাহ্নবী-হৃদয় যবে
কেলি করে মৃদু রবে,
থেকে থেকে কেঁপে উঠে তরঙ্গ নিচয় ;
হেনকালে ছাদে বসি,
হেরিলাম পূর্ণশশী,
উঠিয়াছে নভোমাঝে—পীযূষ আলয়।
আসে পাশে তারা গুলি,
যেন রে কুমুদ তুলি,
সাজায়েছে চাঁদে বিধি মনের মতন ;
নীলাকাশে পূর্ণশশী,
যেন রে অপ্সরী বসি,
ঢাকিয়াছে নীলাঞ্চলে শরীর আপন।
অথবা সুনীল জলে,—
যেখানে ভ্রমর দলে,
ঘূরে ঘূরে খেলা করে মধু পান আশে ;
বসি সেথা (বোধ হেন,)
ফুটিয়ে কমল যেন,
আপন রূপের গর্ব্বে আপনিই হাসে।
নিম্ন দিয়া হুহুস্বরে,
জাহ্নবী-হৃদয়োপরে,
চলি যায় চারি দিকে তরণীর সার ;
সেই জলে শশিকর,
(নয়নের তৃপ্তিকর,)
পড়েছে—দেখিতে বেশ—বাহা কি বাহার!

হৃদয়-আনন্দভরে,
চাহিলাম নভোপরে,
হেরিবারে পূর্ণশশী নয়ন-রঞ্জন ;
কিন্তু, হায়, মেঘরাশি,
কোথা হতে দ্রুত আসি,
ঢাকিল চাঁদের কর—চাঁদের বদন।
অমনি বিষাদ-মুখে,
চাহি নিম্নে মন-দুখে
হেরিলাম সত্য, ভূমে মেঘে ঢাকা শশী,
ঢাকিয়া অঞ্চলে কায়,
প্রেয়সী আমার হায়,
অলক্ষ্যেতে আসি পাশে রহিয়াছে বসি।
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে,
" হেরেছ আকাশোপরে "
ধরিয়ে চিবুক তার বলিনু আদরে ;
" হেরেছ আকাশোপরে
পূর্ণশশী শোভা করে,
কিন্তু ও যে হৃদয়েতে কলঙ্কেরে ধরে।
কখন আকাশে ধায়,
কখন বা অস্তে যায়,
চিরকাল এক ভাব নহে লো উহার ;
তুমি কিন্তু, প্রিয়ে, মম,
চিরকাল রহ সম,
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী তুমিলো আমার।

শ্রীমঃ

হরেক রকম।

তৌলদণ্ড।

চির-হিমানি-রাশি-বিমণ্ডিত ধবল-দেহ হিমালয় পর্ব্বতের একটি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে একটি দেবতা মুদ্রিতনয়নে বসিয়া আছেন। সহসা দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন গুরুতর বিষয়ের তলপ্রবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছেন। প্রশস্ত ললাট পট্ট কুঞ্চিত—মৃদুমন্দ নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত—পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র অবধি মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত নিস্পন্দিত—বামকরতলে বামগণ্ড স্থাপিত। ইনি কি ধ্যানে নিমগ্ন? তাহা ইনিই জানেন—আমি বলিতে পারি না।

ও আবার কি?—সহসা গুহাদ্বার আলোকিত হইল কেন? গাঢ় অন্ধকার-রাশি কেন অন্তর্হিত হইল? এরূপ কেন? এখনি জানিতে পারিবে।

ঐ দেখ, একটা ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি মশাল জ্বালিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে! উঃ, কি ভীষণ কলেবর! এরূপ বিকট দেহ তো কখনো দৃষ্ট হয় না। আরক্ত লোচনদ্বয় অনির্মেষে ঘুরিতেছে কখনো অট্টহাস্য—কখনো দশনে অধর দংশন—কখনো বা ওষ্ঠাধর পৃথক্ করিয়া বদন ব্যাদান করিতেছে; যেন গুহার মধ্যে আর একটা গুহা! বাম হস্তে মশাল এবং দক্ষিণ করে একটা তৌলদণ্ড।

বিকট-মূর্ত্তি খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাস্য-নির্ঘোষে নির্ব্বাত ও নিস্তব্ধ গিরিগহ্বরও প্রতিধ্বনিচ্ছলে হাস্য করিল। দুই শব্দে এক হইয়া যেন শত শত পটহ বাজাইতে লাগিল। বাহ্য-জ্ঞান রহিত দেবমূর্ত্তি চমকিয়া উঠিলেন! নিমীলিত নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন। অমনি সম্মুখে সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

বিকট পুরুষ আবার অট্ট হাসি হাসিয়া গম্ভীর সম্বোধন করিয়া কহিল;—"তুমি কি জান না যে, চিরকাল কাহারই সমান যায় না? তুমি কি অবগত নও যে, অপমানিত শত্রু সময় পাইলে, তাহার প্রতিশোধ লইবেই লইবে? তুমি কি জান না যে, শত্রুর প্রতি হিংসা চেষ্টা,—সর্ব্বনাশিনী চেষ্টা? ইহা তুমি অবশ্যই জান; কারণ, তুমি দেবতা। আর যদি বল, আমি জানি না, তবে অবিলম্বেই তোমাকে জানাইতেছি।" এই বলিয়া সেই সাক্ষাৎ ভয়স্বরূপ মূর্ত্তি দক্ষিণ করস্থ তৌলদণ্ড উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দেখাইল। বলিল, "দেখ, তুমি মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় এক দিন আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে তোমার সেই পরীক্ষিৎ কোথায়? এক্ষণে ছদ্মবেশে আর কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে? তুমি যেমন জগতে সকলের নিকট পূজিত

ছিলে, আজি তেমনি তোমার মাহাত্ম্য লোপ করিব—আমার অপমানের পরিশোধ লইব—আর আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তোমাকে অপদস্থ করিয়া আমার মহিমা—অসীম মহিমা—অমেয় মহিমা, বায়ুসঞ্চালনে উড্‌ডীন কুসুম-সুরভির ন্যায় সাগরে, ভূধরে, আকাশে, ভূতলে—সর্ব্ব স্থলেই বিকীর্ণ করিবই করিব। যদি না পারি, তবে আমি তোমার অপেক্ষাও অসার! এই দেখ, এই তৌলদণ্ডই তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অকাট্য ও অনন্য উপায়! আর বড় বিলম্ব নাই; অচিরেই আমার চিরাপমানের প্রায়শ্চিত্ত করিব। দেখা যাউক, তুমি কেমন 'ধর্ম্ম' আর আমিই বা কেমন 'কলি'।"

এই বলিয়া বিকট-মূর্ত্তি কলি সদর্পে গুহা হইতে নির্গত হইল। তর্জ্জন গর্জ্জন থামিল; যেন শব্দিত চক্কা-সমূহ যুগপৎ ছিন্ন হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে দুই এক পা করিয়া, দরিদ্র, শ্রমসহিষ্ণু কৃষকের বিশ্রামদায়িনী—তস্কর ও দস্যুর ইষ্টসিদ্ধির উপায়-বিধায়িনী—বালক বালিকার ভীতিসঞ্চারিণী—শ্রমকাতর সুখবিলাসী ধনিগণের নিদ্রানিবারিণী—শিবা, চর্ম্মচটিকা প্রভৃতি জন্তুগণের আহার্য্য-প্রদায়িনী—অহিফেন-সেবীর মুহুর্মুহুঃ তাম্রকূট ধূমপানের অবসরদায়িনী—সম্বাদপত্র লেখকের মস্তিকবিলোড়িনী—তমোমুখী, নক্ষত্রভূষণা যামিনী মেদিনীর সহিত প্রায় দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাদর সম্ভাষণ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করিতে চলিয়া গেল। প্রভাত আসিল;—প্রকৃতি নূতন বেশে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসি মিশিয়া গেল! কেন গেল? এ কথা, বোধ হয়, 'দেহিনাং ভূষণং চক্ষুঃ' পাঠককে আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কারণ, পাঠক! একবার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন,—একখানা নিবিড়, গর্জ্জন গম্ভীর মেঘ উঠিয়াছে! তাই-ই প্রকৃতির মধুর হাস্য উবিয়া গেল!

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, পশ্চিমে মেঘ, ভয়ানক মেঘ—সর্ব্বনেশে মেঘ! সেই হেতু এই মেঘ খানা দেখিয়া হিমালয়-শেখর হইতে সাগর-বারি-চুম্বিত কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবাসী সশঙ্কিত হইল! না জানি, একটা কি তুমুল কাণ্ড ঘটিবে! কি কুক্ষণেই প্রাতঃকাল আসিল!

নব প্রভাত দেখিয়া ইংরাজকুলতিলক মহাত্মা ফেয়ার সাহেব প্রাতর্ভোজন (Brakefast) করিবার জন্য ভোজ্যজলা-পরিশোভিত, কাচপাত্রাদি রত্ন বিমণ্ডিত, দুগ্ধফেন বিনিন্দিত বসনাবৃত টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময়ে ভীষ্মের ন্যায় কৃত-প্রতিজ্ঞ কলি, সাহেবের সমুদয় অঙ্গে অনঙ্গের ন্যায় অনঙ্গ হইয়া প্রবেশ করিল! সাহেবেরও সোণায় সোহাগা হইল! কেন না, তাঁহার পূর্ব্বতন অপূর্ণা বাসনা পূর্ণ হইবার অকাট্য উপায় হইল। যেমন পিত্ত-

প্রকোপবিশিষ্ট ব্যক্তি সুশুভ্র শঙ্খকেও পীত-বর্ণ দর্শন করে, সেইরূপ বৃটিস্ বংশাবতংস ফেয়ার সাহেবে ও কলিগ্রস্ত হইয়া কাচপাত্রস্থ সুমিষ্ট ও বিশুদ্ধ সুখপানীয় (সরবৎ) পান করিবার সময় তাহাতে বিষ দেখিলেন—হীরক চূর্ণ দেখিলেন—আর্সনিক দেখিলেন—আরও কত কি যে দেখিলেন, তাহা তিনিই জানেন! সাহেবের বিস্ময়-সাগর সময় পাইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা-লতা তাঁহার কোমল হৃদয়কে জড়াইয়া ধরিল—সাহেব হতভম্ব! এ দিকে সাহেবের এই দশা!' এমন সময়ে শূন্যচারী সুনিবিড় মেঘ খানা হুড় হুড় গুড় গুড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল!—বজ্রপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে লাগিল!—বারিবর্ষণের উপক্রম হইল! কিন্তু, কি যেন মনে করিয়া, মেঘ খানা বাষ্পীয় শকটের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট হইয়া সাঁ সাঁ করিয়া উত্তরদিকে উড়িয়া গেল। তখন আর কোনো অশুভ সংঘটন হইল না। কিন্তু যাইবার সময়েও যেরূপ ঘন ঘন তড়িতের চকমকি দেখা গেল; তাহাতে ভারতবর্ষীয় কি বিজ্ঞানবিৎ কি অবিজ্ঞানবিৎ সকলেই নিঃসন্দেহ জানিলেন যে, অচিরেই ভারতের বক্ষে একটা ভয়ঙ্কর বজ্রপতন হইবেই হইবে।

উন্নত শৈলশেখরে মেঘমালা সর্ব্বদা অবস্থান করে, এ কথা, বোধ হয়, পাঠকগণের মধ্যে সকলেই অবগত আছেন। পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গ বিশেষ সিমলা পাহাড়ের চূড়ায় যে সকল জলদ খণ্ড ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, পূর্ব্বোল্লিখিত ভীষণ মেঘখানা উত্তর দিকে আসিয়া সেই সকল বারিধর খণ্ডের সহিত একাঙ্গীভূত হইল। সুতরাং শ্বেত দেবতাগণের লীলাচল সিমলা পাহাড় অপেক্ষাকৃত তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তখন শ্বেতাম্বর-কুলের নায়ক সহসা বিস্মিত হইলেন। স্বায়ত্ত দৈবী বুদ্ধির প্রভাবে 'অন্ধকারের কারণ কি' চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মশক্র কলি মেঘ হইতে অলক্ষ্যে তাঁহার স্কন্ধে আবির্ভূত হইল—চিন্তার কারণ চূড়ান্ত রূপে প্রতিপন্ন হইয়া গেল! অমনি তখন শ্বেতাঙ্গ দেব কুলনায়ক লর্ড নর্থব্রুক্ বিজাতীয় ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অপরাপর সহচর দেবতারা তাঁহার তাদৃশ ভয়ঙ্কর রোষের কারণ জানিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মেঘ একবার ডাকিয়া উঠিল। লর্ড সাহেবের সম্মুখে একটা বৃহৎ তৌলদণ্ড সহসা উর্দ্ধ হইতে পতিত হইল। পাঠক! বুঝিয়াছেন, এ তৌলদণ্ডটা কাহার?

লর্ড সাহেব পার্শ্বচরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, আমার অনুমতিক্রমে শীঘ্র বরদাধিপতি মলহররাও গুইকুমারকে রাজ্যচ্যুত কর—তাঁহার রাজমুকুট খুলিয়া লও—এবং চিরকালের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" এই কথা বলিবা মাত্র মেঘ আবার গর্জ্জন করিল।

সহচরেরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সহসা ঈদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব অনুজ্ঞা শুনিয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভো! বরদারাজ কি পাপ করিয়াছেন?

কলিগ্রস্ত লর্ড সাহেব বলিলেন, "মলহররাও আমাদের পরম বন্ধু রেসিডেণ্ট সাহেবকে বিষ পান করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবলে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।"

পার্শ্বচরেরা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বিষ পান করাইবার চেষ্টা! কি সর্ব্বনাশ! প্রভো, অবিলম্বেই ইহার প্রতিবিধান করুন।"

এক জন সহচর আর এক জন সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি রূপে এখানে থাকিয়া সে বিষয় জানিতে পারিলেন?" তিনি কহিলেন, "সে কি, তুমি কি জান না আমাদের প্রভু সর্ব্বজ্ঞ?"

লর্ড সাহেব আবার গম্ভীর স্বরে "শীঘ্র মলহররাওকে নির্ব্বাসিত কর" বলিয়া উঠিলেন। মুহুর্মুহুঃ মেঘ গর্জ্জন হইল। এমন সময়ে পর্ব্বত-কন্দরস্থিত ধর্ম্মদেব অলক্ষ্যে আসিয়া আকাশ-বাণীতে "অবিচার, অরাজক, এরূপ ঘৃণিত বাসনা ত্যাগ কর, মলহররাও নির্দ্দোষী, তিনি বিষদান দোষে বিন্দু বিসর্গ পরিমাণেও লিপ্ত নন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধর্ম্মের অপমান করিও না" বলিয়া শূন্যগর্ভ আকাশ শব্দ পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু কলিময় ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞ পক্ষপাতশূন্য সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা লর্ড সাহেব সে কথা শুনিয়া সম্মুখস্থ আকাশ-পতিত তৌলদণ্ড উঠাইয়া বলিলেন, "এই দেবদত্ত তৌলদণ্ডে পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া যদ্যপি মলহরকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে নিষ্কৃতি দিব, রাজ্যচ্যুত করিব না; কিন্তু দোষ সপ্রমাণ হইলে, নিস্তার নাই।"

পার্শ্বচরেরা ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু অলক্ষিত ধর্ম্মদেব লর্ড সাহেবের ভাব ভঙ্গি আর তৌলদণ্ড দেখিয়া কলির ষড়যন্ত্র জানিয়া বিষণ্ণ হইলেন। মেঘ আবার ডাকিয়া উঠিল।

ভারতের জীর্ণ বক্ষে—লৌহ শলাকা প্রোথিত করিয়া তাহাতে তৌলদণ্ড ঝুলান হইল। লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। তখন লর্ড সাহেব পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া, তাহা হইতে এক খণ্ড অচ্ছিন্ন তাম্রকট পত্র লইয়া "শ্রীশ্রী লর্ড নর্থব্রুক" নাম লিখিয়া, তৌলদণ্ডের এক দিকে রক্ষা করিলেন। তদুপরি কলি আবির্ভূত হইল। অমনি অপর দিক্ শূন্যোত্থিত হইয়া, নামধৃত পার্শ্ব ভূতলস্পৃষ্ট হইল। তখন মহাত্মা লর্ড সাহেব পার্শ্বচরগণকে কহিলেন, "মলহররাওকে ঐ দিকে বসাইয়া দাও।" তাহাই হইল। কিন্তু তৌলদণ্ড সমান হইল না।

তখন লর্ড সাহেবের পক্ষীয়েরা 'সূক্ষ্ম বিচার, সূক্ষ্ম বিচার' বলিয়া আহ্লাদে নাচিতে লাগিলেন; কিন্তু ধর্ম্মশরণ বিংশতিকোটি ভারতবাসী "পক্ষপাতবিচার" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তখন লর্ড সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা যে প্রকারে পার, তৌলদণ্ড সমান কর। মলহর রাওয়ের সহিত আমার নাম সমপরিমিত হইলে আমি তাঁহার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিব না।" মেঘ আবার বাদ্যধ্বনি করিল।

লর্ড সাহেবের কথা শুনিয়া, সকলে অনন্যমত হইয়া ব্যালাণ্টাইনকে মলহরের দিকে বসাইয়া দিল। তৌলদণ্ড সমান হইতে হইতে হইল না। কেন হইল না?—কলির কুদৃষ্টি! তখন জয়পুরের মহারাজ, গোয়ালিয়রের মহারাজ, রাজা দিনকর রাও মলহরের দিকে বসিলেন;—কিছুই হইল না। বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারী বসিলেন;—কিছুই হইল না। বিলাতের আরো কতিপয় মহাত্মা বসিলেন;—কিছুই হইল না। বিলাতের ভুবনবিখ্যাত টাইম্‌স সংবাদ পত্র বসিল;—কিছুই হইল না। ভারতবর্ষের খান্ দুচ্চার দেশীয় সংবাদ পত্র ব্যতীত সমুদয় দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বসিল;—কিছুই হইল না। মলহররাওয়ের মুখ শুকাইয়া গেল! বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, "এত দিনে জানিলাম, পৃথিবী ধর্ম্মশূন্য হইয়াছে!" চক্ষু হইতে বক্ষঃস্থলে কয়েক বিন্দু অশ্রুপতন হইল!

লাট সাহেবের পক্ষে জয়ধ্বনি হইল। তখন তৌলদণ্ড অসমান দেখিয়া ত্রিশ কোটি ভারতবাসী "অবিচার, অবিচার" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইল! সকলে মিলিয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি গলিত নয়নাশ্রু মলহর রাওয়ের দিকে রক্ষা করিল; তবুও তৌলদণ্ড সমান হইল না! সুতরাং সকলে একেবারে হতাশ হইল!

সহসা এমন সময়ে কালস্বরূপ গর্জ্জিত মেঘ হইতে ঘোরতর শব্দে বজ্রপতন হইল! সেই বজ্রের অনিবার্য্য আঘাতে নির্দ্দোষী মহারাজ মলহররাও গুইকুমারের 'স্বাধীনতা' ভস্মীভূত হইয়া গেল! তৎসঙ্গে আবার ভয়ানক উত্তুরে ঝড় উঠিল! সেই ঝড় গুইকুমার মলহর রাওকে পতঙ্গের ন্যায় আত্মীয়-স্বজন-শূন্য সুদূর মান্দ্রাজের কারাগারে উড়াইয়া লইয়া ফেলিল! তদ্দর্শনে ভারতসন্তানেরা "হা হতাশে" বিলাপ করিতে লাগিল। কেবল পেট্রিয়ট্-সম্পাদক, এডুকেশন গেজেট্ সম্পাদক এবং সহচর-সম্পাদকের দেবচক্ষে একবিন্দুও বারিবর্ষণ হইল না। কেন হইল না? কারণ— * * *

এমন সময়ে অলক্ষ্যে ধর্ম্মদেব গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সুবিচারক লর্ড নর্থব্রুক্! এই কি তোমার পদোচিত কার্য্য? তুমি সুবুদ্ধি হইয়া 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' জানিয়া শুনিয়া অদ্য 'যতোঽধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' করিলে! তুমি কলির কুহকে পড়িয়া চারিযুগবিরাজিত ধর্ম্মের অবমাননা করিলে! এই কি তোমার ধার্ম্মিকতা! তুমি যেমন একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিলে, তেমনি তোমার চিরসঞ্চিত ভুবন-বিখ্যাত

যশোরাশিতে চিরকলঙ্ক ঘটিবেই ঘটিবে। কখন সহিবে না।—তোমার ইহকালও আর দেখ, ধর্ম্মের অবমাননা তোমার ধর্ম্মে নাই, পরকালও নাই।*

আছে হেন ধন জগতে কি আর।

সুনীল গগনে বিহগের দল
বিহরিছে ওই করি কোলাহল,
উঠিছে—নামিছে—খেলিতেছে পুন,
শুন তাহাদের কোলাহল শুন ;
কিন্তু বিধাতার নিয়ম কেমন
চির সুখ কভু না রয় কখন ;
ক্ষুধার্ত্ত মানব পাতিলেক ফাঁদ,
পড়িল সকলে ঘটিল প্রমাদ।

২

আহা মরি কিবা হরিণ হরিণী,
বিহরিছে বনে দিবস যামিনী,
নব তৃণদল আহার কেবল,
পানীয় নির্ম্মল ঝরণার জল,
না করে কাহার অনিষ্ট মনন,
নিরমল প্রেম বিঘোষে নয়ন ;
এমন সরল সেই যে হৃদয়,
বিধি বিধাতার ! ভয়ের নিলয়।

৩

নিরমল সরঃ সলিলে সুন্দর,
বিকাসে কমল অতি মনোহর,
বিতরি সুবাস মাতায় জগত,
পুঞ্জ পুঞ্জ অলি গুঞ্জরে নিয়ত,
কুমারী—সৌন্দর্য্য নিন্দিত বরণে,
মনের উল্লাসে হেরিছে তপনে ;
কিন্তু সে রূপের গৌরব নাশিতে,
শিশিরের সৃষ্টি, বিধির বিধিতে।

৪

সুবর্ণ গঞ্জিত সুন্দরী-যৌবন,
প্রাণের অধিক যতনের ধন,
যাহার রক্ষণে,—সদত সুন্দর
মুকুরে অর্পিত চারু দুই কর,
বর্দ্ধনে যাহার ধূর্ত্ত সুচতুর
স্বর্ণকার দল ঘামিছে প্রচুর ;
সে যৌবন গর্ব্ব খর্ব্বের কারণ,
বিধির বিধানে বার্দ্ধক্য সৃজন।

৫

অতুল প্রতাপী নরপতি গণ,
লভিছেন রাজ্য জিনি মহারণ,
করিছেন কত নগর বিলয়,
পীড়িছেন শত নির্দ্দোষ হৃদয়,
তুলিছেন কারে অবস্থার শিরে,
ফেলিছেন পুন সমুদ্র গভীরে ;
এমন প্রবল রাজার হৃদয়
পরপ্রতাপেতে সদা ভীত রয়।

৬

সংসার সুখের সার ধন 'ধন',
যার উপার্জ্জনে সদা ব্যস্ত মন,
যাহার কৃপায় গৌরব অতুল
লভিছেন ভবে যত নরকুল,

বিনাশে যাহার সন্নাম সংহার,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পদে লুটে যার,
এমন সুখের লতিকাটী, হায় !
ধন-ক্ষয় ভয় হুতাশে শুকায় ! !

৭

জগতের লোক যশের কারণ,
বিদারি সাগর-তরঙ্গ ভীষণ,
লঙ্ঘিয়া উন্নত পর্ব্বত শিখর,
নদ, নদী, মরু, বিপদ আকর !
নানা দিগ্‌দেশে করিছে গমন,
তোপমুখে করে শরীর পতন,
কিন্তু কাল ক্রমে বিস্মৃতি রাহুতে,
সেই যশঃ শশী পূরে উদরেতে।

৮

সকল সুখের মূলেতে যতনে,
রয়েছে অসুখ লুকায়ে গোপনে,
সময় পাইলে অমনি তখন,
প্রকাশে জগতে স্বভাব আপন,
কিন্তু ধার্ম্মিকের নির্ম্মল হৃদয়,
কিছুতেই নাহি বিচলিত হয় ;
চির সুখ তথা করে বিহার ;
আছে হেন ধন জগতে কি আর ?

শ্রীউঃ—

বিদেশাগত স্বামী ও তৎপত্নী।*

কেন সখি ! মুদে আঁখি বল না ?
প্রাণ তুমি যোগাসনে,
বসিবারে মনে মনে করেছ কি বাসনা ?
তার ত সময় নয়, বেশভূষা সমুদয়
বিপরীত পরিচয় করিতেছে ঘোষণা ;
বল প্রাণ কেন কর ছলনা।

কিবা তুমি যদি মান করিতে ;
সুনীল নয়নাকাশে
অভিমান মেঘ বসে ডুবাইতে জলেতে ;
ভাসিত উন্নত বুক, কাঁপিত তব চীবুক,
ঘন ক্রোড়ে সৌদামিনী দেখিতাম খেলিতে
অশনি পড়িত মম শিরেতে।

হৃদয় কমল মম ফুটেছে ;
যখনি মানসাকাশে
সুচারু অরুণবেশে তব রূপ উঠেছে।
দুখনিশা হয়ে ভোর ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
নিজ কাযে ইন্দ্রিয়েরা সঘনেতে মেতেছে,
সুখ দিবা প্রকাশিত হয়েছে।

তব গুণ পিককুল সঘনে,
ধরিয়ে মধুর তান
মোহিছে জগত প্রান বাঁচি বল কেমনে ?
এমন সুখের রবি, লইয়ে মোহন ছবি,
ভাসাইয়ে দুখিনীরে ডুবে পাছে গগনে,
তেঁই আঁখি পথ মুদি যতনে।

শ্রীউঃ—

* প্রাচীন বাঙ্গালা গান হইতে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

(The Music and Musical Notation of Various countries) এখানি ইংরাজী গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ এই গ্রন্থের প্রণেতা এবং ইহা মহামান্য লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়কে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী প্রেসে মুদ্রিত।

এই পুস্তকখানিতে নানা দেশের সংগীত ও সংগীতচিহ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের ন্যায় আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রেও প্রাচীনকালে যে স্বরলিপি চিহ্ন সকল ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রমাণ করিয়া আমাদের সঙ্গীতের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের দেশে বহুকালাবধি সংগীত বিদ্যার আলোচনা হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু এ পর্যান্ত এতদ্বিষয়ে সাধারণের বোধোপযোগী কোন পুস্তক ছিল না সম্প্রতি কয়েকখানি পুস্তক প্রচারিত হওয়াতে বিশেষ উপকার হইতেছে। অতএব সংগীত বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই ভাল ও আমাদের গৌরবের বিষয়। যাহা হোক এই পুস্তকখানি আড়ম্বর শূন্য হইলে আরো ভাল হইত। গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আমরাও দেশের সঙ্গীত প্রিয় মহাত্মাগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতিসাধন পক্ষে শ্লথাদর না হন। বিদেশীয় সঙ্গীত যতই সুমধুর হউক না কেন, তাহা কদাচই আমাদের জাতীয় গৌরব-পরিবর্দ্ধক হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের যে সঙ্গীত প্রাচীন পণ্ডিত-ব্যূহের যত্নে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই যদি এক্ষণে আমাদের দ্বারা হতাদর হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা জাতীয় কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে?

(Hindu Music.)

ইহাও ইংরাজী ভাষায় সংগীত বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। ইহা প্রথমে হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়াছে।

মেং সি, বি, ক্লার্ক সাহেব হিন্দুসংগীতের কতকগুলি অভাব দেখাইয়া তাহার উপর দোষারোপ করেন। এখানিতে সে দোষগুলির বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়া স্বজাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সংগীতবিষয়ক গ্রন্থনিচয় হইতে প্রমাণ ও বিশেষ বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সুচারুরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১। হিন্দু-সংগীত-পদ্ধতিতে শ্রুতির অভাব আছে, এই প্রকার বিশ্বাস অতীব ভ্রান্তিমূলক।

২। অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে স্বরগ্রামের

পরস্পর সম্বন্ধ ও প্রভেদ নিরূপণ করিতে যাওয়া অতি অসঙ্গত।

৩। হিন্দু-সংগীত-পদ্ধতি, চিহ্ন ও সুরগ্রাম ইউরোপীয় সংগীত পদ্ধতি, চিহ্ন ও সুর-গ্রাম অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত, এবং এতদ্দ্বারা সংগীতবিষয়ক পারিপাট্য অনায়াসেই সাধিত হয়।

৪। জাতীয় সংগীত-চিহ্নের পরিবর্ত্তে অপর জাতীয় সংগীত চিহ্ন গ্রহণ করা অপকর্ষবিধায়ক; বিশেষতঃ যখন পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা নাই।

পদ্য পরিচয়।

প্রথমভাগ।

শ্রীশ্রীনাথচরণ মাসান্ত প্রণীত। প্রেসিডেন্সী প্রেস, কলিকাতা।

এই কবিতা পুস্তকখানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। স্থানে স্থানে দুই একটী চিত-গর্ভ সুন্দর বর্ণনা আছে। লেখক ছন্দো-গ্রন্থনে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন, যদি তিনি কবিতাগুলির ভাব সংরক্ষণে সেইরূপ যত্ন করিতেন, তাহা হইলে ইহা একখানি উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক হইত। বালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত প্রায় প্রতি কবিতার নিম্নভাগে ছন্দোবন্ধে যে ছন্দের লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষার পক্ষে কতদূর ফলোপধায়ক হইবে, বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে ছন্দোলক্ষণ গুলি লিপি-বদ্ধ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন লাভ হয় নাই। ছন্দোলক্ষণ শিক্ষার পক্ষে শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্নকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণই যথেষ্ট। যাহা হউক এতদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং যত্ন করিলে তিনি যে পরিণামে এক জন সুকবি হইতে পারিবেন, তাহারও সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ এই গ্রন্থখানির উল্লিখিত সাধারণ দোষসত্ত্বেও আমরা ইহাকে স্বদেশের উদ্যানজাত পাদপের ফল বিবেচনায় প্রীতি-নয়নে নিরীক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সাধারণের গোচরার্থ উহা হইতে একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নীচের উচ্চ ভাষা।"

রসবতী।

"ওহে শিশুগণ!
শুন দিয়া মন।
যদি নীচ জন,
কহে কুবচন,
শুনে না শুনিবে,
নীরব রহিবে!
করে তায় ক্রোধ,
করো না বিরোধ।
ফেউ ফেউ করে,
ফেরু ডেকে মরে।
শুনে সেই রবে,
মৃগেন্দ্র কি রবে?"

প্রত্যক্ষবাদ ও অধ্যাত্মবাদ।

এই বিষয়ের মীমাংসা করা বা ভ্রম প্রদর্শন এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। উভয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচন ও সূক্ষ্মতম অংশের বিকাশনই আলোচ্য বিষয়। যতদূর পারা যায় চেষ্টা করা যাউক।

স্বর্গীয় দেবগুরু বৃহস্পতি প্রত্যক্ষবাদের প্রথম উদ্ভাবক বলিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বৃহস্পতি-প্রণীত 'সূত্র' সকল প্রত্যক্ষবাদের মূল। তিনি কেবল যে সূত্র সকল রচনা করিয়াছেন, এমন নহে; অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত, সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বে বৃহস্পতি প্রত্যক্ষবাদের স্রষ্টা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। নাস্তিক-চূড়ামণি বৃহস্পতি অসাধারণ সতেজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষা তদানীন্তন সকল জ্ঞানের উপরি সর্ব্বপ্রকাশ করিত। বুদ্ধি-বৃত্তি বিষয়ে বৃহস্পতির প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল কি না সন্দেহ। প্রত্যক্ষবাদের বীজ তিনিই রোপণ করেন। অনন্তর কালক্রমে উহা শাখা পল্লবিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। মহাবুদ্ধি গৌতম বৃহস্পতিপ্রণীত প্রত্যক্ষবাদ বিদ্যার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। হেতু-শাস্ত্রের চরম উন্নতি গৌতমের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। গৌতমের সুতীক্ষ্ণ সূত্র-সকল তর্ক শাস্ত্রের অস্থি স্বরূপ বলিয়া গণ্য করা কোন ক্রমেই অনুচিত নহে। তৎকৃত সূত্র সকল বহুপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। যদিও পরে অন্যান্য মহাত্মাদিগের দ্বারা উহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে, কিন্তু সুরগুরু বৃহস্পতির প্রত্যক্ষবাদ গৌতমের দ্বারাই সম্যক্ উপচিত হইয়াছে। বহুপূর্ব্বে বৃহস্পতি যে বিষয়ে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই সময়ে নবীভাব ধারণ করিয়া বৌদ্ধ সময়ে ভারতরাজ্যের অশেষ উন্নতি করিয়াছিল। এই উন্নতি বাহ্যিক নহে, আত্মা সম্বন্ধীয়। ভৌতিক জগতের উন্নতি যদিও পূর্ব্বাচার্য্যগণের ততদূর স্পৃহণীয় বলিয়া বোধ ছিল না, কিন্তু আত্মোন্নতিই উঁহাদিগের সকল জ্ঞানের, সকল প্রকার বুদ্ধির আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রাচীনতম ঋগ্বেদ সংহিতায় বৃহস্পতির প্রত্যক্ষবাদ-সম্বন্ধীয় কোন কথা দৃষ্ট হয় না; তাহা না হইবারও সম্ভাবনা। কারণ ঋগ্বেদ প্রণয়নের সমকালীন অর্য্যমা, পূষা, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি অত্যধিক প্রাকৃতিক শক্তি সম্পন্ন ঋষিগণ জড়পদার্থের উপাসনায় মনোনিবেশ করিতেন। বুদ্ধির অবস্থা, মনোবৃত্তির অবস্থা সম্যক্ উন্নত না হইলে প্রাকৃতিক ঘটনার দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হওয়া যায় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষার্হ করা যায় না। কিন্তু যে অনাদিকালে বৃহস্পতি প্রত্যক্ষবাদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, যখন কোমৎ আদি অনাগত কালে শয়ান ছিলেন, তখন

ভারতের গৌরব পতাকা স্বর্গ ভূমিতে উড্ডীন হইয়াছিল। এই স্বর্গ ভূমি হিমালয় মহীধরের অধিত্যকা প্রদেশ বলিয়াই স্থির বোধ হয়। কোন্ সময়ে বৃহস্পতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। তবে তিনি নিজ অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে সুরকুলকে (তদানীন্তন সভ্যতম) বিশেষ বশীভূত করিয়াছিলেন। কারণ মহা-বুদ্ধি সম্পন্ন বিক্রমাদিত্য সভাসদ্ কোষকার অমর সিংহ স্বপ্রণীত কোষে বৃহস্পতিকে দেবগণের গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দুরবগাহ রাজনীতি শাস্ত্রেও বৃহস্পতির অসাধারণ ক্ষমতা ছিল! অসুরাচার্য্য শুক্র অতিশয় নীতিজ্ঞ ছিলেন, এবং রাজনীতিতেও তাঁহার দক্ষতা সবিশেষ লক্ষিত হইত। এইজন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, বিভিন্ন স্বভাব সুরাসুর মধ্যে উভয় জ্ঞানীকে নিরন্তর প্রতি দ্বন্দ্বিতাসূত্রে পরামর্শ প্রদান করিতে হইত। যাহা হউক সুসভ্য দেবগণকে সর্ব্ববিষয়ে সুপরামর্শপ্রদান, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকাম হইয়া করা বৃহস্পতিরই উপযুক্ত বলিয়া নিঃসংশয়িত রূপে বোধ হয়। অধুনা প্রত্যক্ষবাদের বিষয়ে বৃহস্পতির বুদ্ধির ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান কতদূর দেওয়া যাইতে পারে দেখা যাউক। বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের চরম নির্ণেয় বিষয় বর্ত্তমান জড় জগতের সহিত সম্পূর্ণ অসংলিপ্ত, জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতিকে সহায় স্বরূপে গণ্য করা জ্ঞানের ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ বিষয়। প্রমাণপরম্পরায় গুরুতা প্রত্যক্ষাতি-রিক্ত অন্য প্রমাণের উপরি তত নির্ভর করে না। যদিও বিষয় বিশেষে, অবস্থা-ভেদে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু প্রমাণের সঙ্কোচই বাহুল্য রূপে ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে বিমোহিত করিয়া কোন বিষয় সপ্রমাণ করা, আর অন্ধকে হস্তীর স্বরূপ বর্ণন শ্রবণ করাইয়া গজাবয়ব নির্ণয় উভয়ই সমান। পার্থিব দৃষ্টান্ত-সমূহ ঐশ্বরিক তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে যে বিশদরূপে অনুকূল হইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাশা করা যায় না।

কোন ব্যক্তি কোনকালে যে এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিবেন, তাহা বলা যাইতে পারে না। মনুষ্য চিরকাল এই বিষয়ে কখনও আলোক দর্শন করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না। কেবল সময়ে সময়ে পুঞ্জীকৃত বিভ্রান্তমতরাশি সৃষ্ট হইয়া সমাজ বিশেষে, দেশবিশেষে মনুষ্য হৃদয়ে বাস করিবে। বৃহস্পতি প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ-বাদে নৈতিক বন্ধনের দৃঢ়তা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তিনি সুনীতি প্রতিপালনকে মনুষ্য গৌরবের এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নৈতিক বন্ধনের শিথিল ভাব সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রবর্ত্তক ও পথনির্দ্দেশক। অস্তি, নাস্তি এই বাক্যে আস্থাবান্ হওয়াও সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট রুচির গঠনানুসারে হইয়া থাকে। চিরশান্তি

অপেক্ষা সাময়িক বিপ্লব অনেক কার্য্য করিয়া থাকে। তদ্রূপ প্রাচীনতম বৈদিক কালের জড়োপাসনা বৃহস্পতি দ্বারা এই রূপে বিভিন্ন ভাবে. বিভিন্নাভিপ্রায়ে পরিণত হইয়াছিল। বৃহস্পতির সময়কে বৈদিক ধর্ম্মের বিপ্লাবক সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণান্তর স্বীকার করিতেন না। পারলৌকিক জগৎ কেবল ভীতিজনিত চিরসংস্কারের আবেশ মাত্র। উহাতে কার্য্যকারণ ভাবের পরিণতি দৃষ্ট হয় না। চিত্তবৃত্তিকে বহুকাল যেরূপ অভ্যাসে অভ্যস্ত করা যাইবে, মানবও তদধীন, তদনুগত সংস্কারের বশ্য হইয়া সংসার ক্রীড়ায় সময় যাপন করিবে।

কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরত্ব ব্যবস্থাপন, আত্মগত চির সংস্কারের প্রতিবিম্ব মাত্র। উহাতে কোন অতিমানুষিক ভাবের সুচিহ্ন দৃষ্ট হইতে পারে না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, জগৎ সৃষ্ট, ঈশ্বর স্রষ্টা; জগতের স্রষ্টৃত্ব ঈশ্বরে আরোপ করা মাত্র। স্রষ্টারও স্রষ্টা থাকিতে পারে। কারণ তাহা সমর্থন করিতে হইলে অনুমান, শ্রদ্ধা, ভক্তিকে আহ্বান করিতে হয়। নতুবা কার্য্য কারণ তথ্যের বিরোধী হইয়া উঠে।

অতঃপর অধ্যাত্মবাদের বিষয় কিরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, দেখা আবশ্যক। আত্মবাদীরা বলেন যে, আত্মাই জীবদেহে অবস্থান করিয়া জীবের জীবত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। আত্মাই ঈশ্বর, আত্মাই নিত্যবস্তু। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকে ও বেদান্তে লিখিত হইয়াছে যে, আত্মাই ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ও অদ্বয়। আত্মাকেই শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন প্রভৃতি সাধন-পরম্পরা দ্বারা অধিকারী হইয়া বেদ, বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর। যুক্তির বলবত্তা স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। কারণ অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিদ্‌গণ ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছেন যে. আত্মা ভিন্ন ইহ জগতে অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তু নাই। আত্মাই জ্ঞেয়, তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে বদ্ধবিশ্বাস হও; অধ্যাত্মবিদ্যাবিৎ আচার্য্যের নিকট সমিৎকর হইয়া গমন কর, তিনিই শিষ্যকে মায়াবাদ হইতে, ঐহিক কষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়া দিবেন। হয়ত জীবন্মুক্তও করিতে পারেন। পঞ্চীকরণ অভ্যাস কর, অর্থাৎ জলাদিভূতের কিরূপ সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদে দেহ সংরচিত হয়, তাহা জান। মায়াবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, পৌরাণিকী কল্পনা পরিত্যাগ কর, সর্ব্বভূতৈকদর্শী হও; তবে আত্মতত্ত্ব রহস্য উদ্ভেদ করিয়া লব্ধজ্ঞান হইবে। জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর। যৌবন, ধনসম্পত্তি শারদ মেঘচ্ছায়ার ন্যায় নিতান্ত বিনশ্বর। অতএব তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ঐহিক আপাত মনোহর সুখের মোহনে নিদ্রিত হইবার আবশ্যক নাই। সুখ অপরিণামি। উহাতে ত্রিতাপ পূর্ণ দুঃখের আধিক্যই অধিক। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপের শান্তি, তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিবাকর হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার

বিনাশ না করিলে মনুষ্য দেহের অযথা ব্যবহার করা যায়। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নের অনুকূল উপায় মাত্র। তিতিক্ষা উপরতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হও, সন্ন্যাসী হও, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মচিন্তাতে মনোনিবেশ কর। একদা এক প্রত্যক্ষবাদীর সহিত বৈদান্তিকের সম্মিলন হয়, তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথোপকথনের পর প্রত্যক্ষবাদী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ‘ বৈদান্তিক মহাশয়! অনেক বিষয়ে আপনার সহিত মত সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তবে আপনি হস্তপদাদি বিহীন, অশরীরী, বাক্যমনের অগোচর এরূপ একজনকে কেন মানেন ? ’ তখন বৈদান্তিক বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তোমার সহিত চিরকালই মতের বিভেদ আছে ও থাকিবেক। অন্যত্র উপনিষদে নচিকেতাসম্বন্ধীয় (যমপুত্র) একটী আখ্যান কথিত হইয়াছে। উক্ত আখ্যান দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, নচিকেতা ত্রিতাপে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া একজন তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট আত্মজ্ঞান লাভার্থে গমন করেন। এই আখ্যানের অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, যমপুত্রকেও তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া গুরূপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। কারণ ঐ তত্ত্বজ্ঞান বিনা কাহারই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ষড়্ দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শনই ভারতের অনেকস্থলে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, অন্য কোন দর্শন শাস্ত্র তাদৃশী প্রভুতা লাভে সমর্থ হয় নাই। এতৎসম্বন্ধীয় বেদান্তসার, পঞ্চদশী, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক পুস্তক আছে। তন্মধ্যে গীতাই অনেকের সবিশেষ আদরণীয়। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পণ্ডিতকুলের মধ্যে গীতার মহত্ত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শাস্ত্রের অত্যুন্নতি সাধন করিয়াছেন। তৎকৃত ভগবদ্গীতার শাঙ্কর ভাষ্য অতি উৎকৃষ্ট। ইনি প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি কয়েক জনকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু হেত্বাভাস শাস্ত্র দ্বারা বৈদান্তিক মত অনেক স্থলে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন দ্বারা বৈদান্তিকদিগের ঘোর বিশ্বাস বিশেষরূপে অপনীত হইয়াছে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, কার্য্য কারণ ভাবজ্ঞ নৈয়ায়িকেরা অযথা শ্রদ্ধাপনোদিত হইয়া বেদান্ত বাক্যে গুরুবাক্যবৎ অচল শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে বাধ্য নন। বলবতী যুক্তিকে অকারণে নিরাকরণ করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি কামনা কতদূর স্পৃহণীয়, তাহা বার্হস্পত্য তর্ক সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। বৈদান্তিকদিগের মত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, এবং লোকে তন্মতস্থ হইলে বাহ্য জগতের উন্নতি একদাই তিরোহিত হয়। বাহ্য সম্পদ্ অধ্যাত্মবিদ্যার পরম শত্রু। যদি সকলে এই চিন্তাপরায়ণ হইয়া চলে, তবে লোকযাত্রা বিধান এক ক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি মৃত্যু শরীরীদিগের

দেহ-ধারণ রূপ স্বাভাবিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবি ফল বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে সেই অবশ্যম্ভাবী ফলের ভয়ে জন্মাবধি নৈরাশ্যের দাস হইয়া বিবেকপর হওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম সময়ে সুন্দররূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। কারণ যে প্রত্যক্ষবাদ বৃহস্পতির বুদ্ধি বিনিঃসৃত, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহারই পত্তনের উপরি স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং পুরাবৃত্ত পাঠকেরা অনেক অংশে অবগত হইয়াছেন যে, বৌদ্ধ সময়ে ভারতবর্ষের বাহ্যিক উন্নতি কতদূর প্রসারিণী হইয়া ছিল। তক্ষশীলা, তাম্রলিপ্তী প্রভৃতি তদানীন্তন সুসমৃদ্ধিশালিনী নগরীই তাহার প্রমাণ স্থল হইয়া রহিয়াছে।

যে ধর্ম্ম জগতের বিলয় সাধনের উপায় নির্দ্দেশ করে, বাহ্য সম্পদের অবনতির পরামর্শ দেয়, মনুষ্য সমূহকে নিরাশায়, হতোৎসাহের ও অন্যান্য বিবেকের একান্ত বশীভূত করিয়া তুলে, তাহা স্বর্গীয় ধর্ম্ম বলিয়া কয়জন সতেজ বুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন? তদ্দ্বারা কেবল পরোপজীবী অতিথির সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই জন্যই বুদ্ধদেব ও বৃহস্পতি তুল্য লোকের ধরণীমণ্ডলে আবির্ভাব অনেক উপকারজনক হইয়াছে।

যাহা হউক বৈদান্তিকেরা অনেক শ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বেদমুখ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রমাণ প্রদর্শন পক্ষে বেদকেই সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক শ্রুতি তাঁহাদিগের অনুকূল পক্ষ; সুতরাং তাঁহারা বেদের দোহাই দিয়া আত্মমত সমর্থন সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষবাদে শ্রুতির নামমাত্র নাই। কারণ উহা হেতু শাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ করা প্রত্যক্ষবাদীদিগের উদ্দেশ্য। অনেকাংশে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। চিরাগত মতের অনুসরণ করিলে চিরাগত শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা অভিলষিত সিদ্ধি করিতে হয়। সুতরাং তাহাতে বুদ্ধির অত্যুন্নতি জনিত বিকাশ প্রকাশিত হয় না। এই জন্য বৈদান্তিকেরা মনোনীত শ্রুতি সকল সংগ্রহ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রহস্য ভেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় একটী ক্ষুদ্র গৃহে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া একটী যুবতী শয্যায় শয়ানা। গৃহে একটী মাত্র আলো জ্বলিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাণোন্মুখ। যুবতী পীড়িত। রোগের জ্বালায় সুন্দরী কাতরা। তেমন চন্দ্রানন মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আবার ক্ষীণালোক পড়িয়া সেই আননে সন্ধ্যাকালের সুপ্ত পদ্মের ন্যায় শোভা বিরাজমান। শয্যাপার্শ্বে যুবতীর চারি বৎসরের একমাত্র বালক ক্রীড়া করিতেছে। বালস্বভাব সুলভ আমোদে পুত্র নিমগ্ন।

মাতার দারুণ রোগের কি প্রতিকার—কিসে আরোগ্যলাভ করিবে, তাহা এক-বারও মনে স্থান দিতেছে না। আহা! সেই শৈশবে সে যদি জানিত, কি বিষম বিপদ্ উপস্থিত, তা হইলে সে কি অমন করিয়া খেলা করে? বালককে চঞ্চল দেখিয়া যুবতী তাহাকে কোলে লইয়া দুই গণ্ডে চুম্বন করিলেন। বলিলেন, " বাবা গোপাল আমার " বলিতে বলিতে দুই গণ্ড বাহিয়া অজস্র অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। যুবতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া চক্ষুর্দ্বয় অঞ্চলে ঢাকিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। গোপাল বলিল " মা কাঁদিস কেন? " " না আর কাঁদিব না " বলিয়া সুন্দরী আবার সন্তানকে ক্রোড়ে লইলেন। " বাবা আমি যে এখন হইতে—" এই কথা বলিতে বলিতে যুবতী ক্ষীণালোকে দেখিলেন যে, গৃহে এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়াছে: ক্রমে চিনিলেন। সুপ্তোত্থিত মৃগ কিরাতকে দেখিলে যেরূপ চম্‌কিয়া উঠে, যুবতী নবাগত পুরুষকে দেখিয়া সেইরূপ হইলেন। সেই দারুণ রোগ জ্বালা সত্বেও বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। নয়ন আরক্ত হইল, গণ্ড-পার্শ্বে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। যুবতী বলিলেন,— " তুমি আবার এখানে? " নবাগত মূর্ত্তি মেঘ গর্জ্জনবৎ স্বরে বলিল " আর একবার আসিলাম,—আর আসিব না, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ ভুলিও না,—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে—ইহকালের যন্ত্রণা, পরকালের যন্ত্রণা স্মরণ রাখিও।" সে ভীষণ স্বর শুনিয়া গোপাল কাঁদিয়া উঠিল। যুবক—" আর কিছু বলিতে চাহি না, যাহা বলিয়াছি যথেষ্ট হইয়াছে, এক বিন্দুও ভুলিও না, আমি চলিলাম।" এই কথা বলি-য়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যুবতী উচ্চৈঃস্বরে (সে অবস্থায় যত উচ্চৈঃস্বর সম্ভব) বলিলেন, " না কিছুই ভুলিব না, সকলই স্মরণ রাখিব, কিন্তু একটী কথা শুনিয়া যাও।" যুবক শুনিলেন না, চলিয়া গেলেন। যুবক বাহির হইবামাত্র যুবতীও শয্যার এক পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবতীর নাম সারদাসুন্দরী। সারদা ব্রাহ্মণকন্যা। ঢাকা জেলা তাঁহার নিবাস। সারদার পিতা—রামধন চট্টোপাধ্যায় অশীতিবর্ষ বয়সে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সদানন্দ কলিকাতায় চাক্‌রি করিতেন। পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার কলিকাতা আগমনের প্রধান কারণ। বিশেষতঃ সেই সময়ে এখানে দুর্ভি-ক্ষের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অত্যন্ত মারী ভয় উপস্থিত হয়, এবং সদানন্দও সেই রোগ-ব্যাধের লক্ষ্য হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ কলিকাতায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া এখানে আসিতে কিছু অন্যমনা হইলেন, দুই চারি বার ইতস্ততঃ করিলেন, পরিশেষে ভাবিলেন, আমার আর কেহই নাই। এক মাত্র পুত্র (দুই বৎসর পূর্ব্বে

তাঁহার স্ত্রীর পরলোক প্রাপ্তি হয়); কন্যাটী যা আছে, তাহাও বিবাহ হইলে অন্যের হইবে। তবে আর জীবনের মায়া কার জন্য? এই সময় সদানন্দকে দেখিতে পাইয়া মরিলেই আমার স্বর্গসুখ। বৃদ্ধ এই ভাবিয়া কলিকাতা আসিবার জন্য যাত্রা করেন, বাটীতে কেহই রহিল না, সুতরাং কন্যাকে সঙ্গে লইতে হইল। তখন সারদার বয়স ছয় বৎসর মাত্র। রামধনের কলিকাতায় আসিবার দুই দিন পরেই সদানন্দের মৃত্যু হইল। বৃদ্ধ মনঃক্ষোভে আর বাড়ী ফিরিলেন না,—কন্যাসহ কাশীবাসী হইলেন।

ছয়বৎসর কাল বৃদ্ধ কাশীতে রহিলেন। ইতিমধ্যে সারদাসুন্দরী বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহাদের বাসার অনতিদূরে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণের আবাস। রাজকৃষ্ণের বয়স অন্যূন বিংশতি বৎসর। দেখিতেও সুশ্রী। ইহার পিতা এক জন জমীদার ছিলেন। জমীদার-পুত্রের সাধারণতঃ যে সকল দোষ থাকা সম্ভব রাজকৃষ্ণ বাবুতে তাহা ছিল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি শৈশবাবস্থাতেই পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রশ্রয় দিবার লোক কেহই ছিল না। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যপতি হইয়াও কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসের জন্য আসিয়াছিলেন, কলিকাতায়ও একখানি তাঁহার বাড়ী ছিল, সেই খানেই থাকিতেন। দেশে প্রায় যাইতেন না। বৎসরে একবারও কখন কখন হইত কি না, সন্দেহ স্থল। কিন্তু এবারে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে শীতের ছুটীতে কালেজ বন্ধ হইলে একবার দেশে গিয়াছিলেন।

এই সময় রামধন চট্টোপাধ্যায় সারদার বিবাহের জন্য একটী উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন, কয়েক দিন পরে রাজকৃষ্ণকেই জামাতা করিতে বাসনা করিলেন। কেন না সে জমীদারতনয়,—কন্যার কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বংশজ, রামধন কুলীন। তিনি আপনার কুলমর্য্যাদা অক্ষয় রাখিবার জন্য রাজকৃষ্ণ বাবুকে কন্যা দিতে প্রথমে কিছু অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অতুল অর্থের আশা ছাড়িতে না পারিয়া, বিশেষতঃ অন্য-পাত্র অনুসন্ধান করিতে গেলে তাঁহার আর কাশীবাসী হওয়া হয় না, এই ভাবিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকেই জামাতা করিলেন। বিবাহ করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর মনের কিছু বিকার হইল; কলিকাতায় যাওয়া উচিত, কি স্বদেশে থাকাই কর্ত্তব্য, ইহার কোনটীও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমরা তাঁহার এরূপ মতের অস্থিরতা অনেক দিন হইতে জানি। একবার তিনি খৃষ্টান হইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পাত্রীর সহিত কলহ করিয়া আসেন। কয়েক দিন ব্রাহ্ম হইলেন, পৈতা ত্যাগ করিলেন; মৎস্য আহার ছাড়িলেন ইত্যাদি। এক্ষণে আবার যেমনকার হিন্দু তেমনি হইয়াছেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পৈতা-

ধারণ সকলই যথানিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান হইবার কথা তাঁহার স্বদেশে কেহই জানিত না, আমরা জানিলেও এত দিন বলি নাই। তাহা হইলে বোধ হয়, বৃদ্ধ আপন কন্যাকে রাজকৃষ্ণ বাবুকে দিতেন না। আমরা পরোপকার-ব্রত লোকের অনিষ্ট ভাল বাসি না।

দুই চারি দিন ইতস্ততঃ করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুত্রশোক, এক্ষণে কন্যাবিচ্ছেদ—উভয় কারণে রামধন বাবু কাশীতেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

১২৬৩ সালের মাঘ মাস। রাজকৃষ্ণ বাবু সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্বের মত বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। আপন স্ত্রীকেও লেখা পড়া শিখাইলেন। এক্ষণে (১২৭৬ সাল) তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি মন্দ ওকালতী করিতেন না। আমরা সবিশেষ জ্ঞাত আছি যে, ইতিমধ্যে তিনি একবারও স্বদেশে যান নাই। সারদাসুন্দরী একবার মাত্র শ্বশুরালয়ে (কাশীতে) গিয়াছিলেন, সেখানে থাকিবার মধ্যে রাজকৃষ্ণ বাবুর সম্পর্কে এক মাতামহী এবং তাঁহার একটী বিধবা কন্যা ছিল। রাজকৃষ্ণ বাবু কলিকাতায় থাকাতে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি বিশেষ যত্ন হয় নাই, সুতরাং ছয় মাস পরেই সে কলিকাতায় পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেই অবধি তাঁহাদের আর বিচ্ছেদ হয় নাই।

রাজকৃষ্ণ বাবুর পরিবারবর্গের মধ্যে তিনি স্বয়ং, তাঁহার স্ত্রী সারদাসুন্দরী, এক জন দাসী, রন্ধনকারিণী (রমাসুন্দরী), এবং একজন চাকর—এই কয়জনেই কলিকাতার বাড়ীতে থাকিতেন।

বাড়ীটী একটী ছোট খাট দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুইটী পুষ্করিণী, বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটী বৃহৎ বাগান, এবং তৎসংসর্গে অনেকগুলি গৃহও ছিল। দক্ষিণ দিকে কতকগুলি ছোট ছোট কামরা ব্যবহার না থাকাতে সে গুলিতে চাবি দেওয়া থাকিত। মেরামত অভাবে সে গুলি জীর্ণভাব ধারণ করিয়াছে। টীকটীকি, পতঙ্গ, আরসোলা প্রভৃতি কীটগণ সুবিধা পাইয়া সেখানে বাসস্থান করিতে ত্রুটি করে নাই।

প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভের পূর্ব্বে রন্ধনকারিণী রমাসুন্দরীর দুই একটী কথা বলিয়া রাখা যাউক।

সেও কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বধূ ছিল। ব্রাহ্মণ এক দিন রাত্রে কোথায় পলাইলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। এমন কি, আপন স্ত্রীকেও কিছু বলিয়া যান নাই। রমাসুন্দরী শয্যা হইতে প্রাতে উঠিয়া দেখিঃলেন, সর্ব্বনাশ, স্বামী নাই। চারি দিকে খুজিলেন, কোথাও পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন শয্যাপার্শ্বে এক খানি পত্র

পড়িয়া আছে, খুলিয়া দেখেন, তাহাতে এই কয়েকটী কথা লেখা—

"আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ না হইলে আমি আর গৃহে ফিরিব না। কি প্রতিজ্ঞা তাহা তুমি জান—যদি জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি রূপে জীবন ধারণ করিবে, তাহাতে আমার এই উত্তর যে—দাস্যবৃত্তি অথবা তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই করিও।"

পত্র পড়িয়া রমাসুন্দরী কিছু ভাবিত হইলেন। প্রতাপ (তাঁহার স্বামী) আবার ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় আরও দশ পনর দিন বাড়ীতে রহিলেন। কিন্তু প্রতাপ ফিরিলেন না। একখানি পত্র আসিল, তাহাতে লেখা ছিল—"প্রতাপ জলপথে যাইতে ছিল, অকস্মাৎ ঝটিকা আসিয়া তাঁহার জীবনের শেষ করিয়াছে নৌকাতে যে যে ছিল, সকলেই মরিয়াছে। কেবল একজন নাবিক জীবিত, তাহার নিকট হইতেই আমি সমস্ত অনুসন্ধান পাইয়াছি।" নিম্নে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই। রমাসুন্দরী দুই চারি মাস স্বামীর অনুসন্ধান করিলেন। পরে জীবিকা নির্ব্বাহের অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়াও রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে চাকরী স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর বা ঘৃণাজনক বলিয়া বোধ হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে সারদাসুন্দরী সেই ভীষণ আগন্তককে দেখিয়া শয্যাপার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যূন এক ঘণ্টা পরে রমাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন গৃহিণী ম্লানবদনে শুইয়া আছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ বাবু কবিরাজ দ্বারা ঔষধাদির ব্যবস্থা করাইয়া পুত্রকে কোলে করিয়া বাহিরে গিয়াছিঁলেন। সুতরাং যুবতী গৃহে একাকিনী। রমাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র যুবতী ক্ষীণস্বরে বলিলেন "কে রমাদিদি ?" রমা ব্যগ্র হইয়া বলিল "হ্যাঁ আমি—অমন করিতেছ কেন বল, রোগের কিছুই উপশম হয় নাই ?"

"এ রোগের ঔষধ আজিও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আমার রোগের আবার উপশম ? মৃত্যু—মৃত্যুই আমার ঔষধ।"

এই কথাগুলি বলিতে যুবতীর হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু চক্ষে একবিন্দু জল পড়িল না। স্থিরদৃষ্টে রমার প্রতি চাহিলেন। বলিলেন,—"ভগিনি! আমি চলিলাম, বোধ হয় এই আমার শেষ দিন। তোমার সহিত এই শেষ দেখা। সকলকে দেখিও।"

রমাসুন্দরীর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। দুই চক্ষু অঞ্চলে ঢাকিয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সারদা বলিলেন "ভগিনি! কাঁদিলে কি হইবে ? তোমাকে আমি চিরসুখী করিয়া যাইব, তুমি কাঁদিও না।"

"আমি চিরসুখী হইতে চাহি না। তুমি

অতুল ঐশ্বর্য্যপতির গৃহিণী, তাহা আমি জানি। তুমি আমাকে ধন দিয়া যাইতে পার; কিন্তু তাহাতে আমার কি হইবে? আমি সুখী হইতে চাহি না, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইও না।" এই বলিয়া রমাসুন্দরী আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

"ভগিনি! কাঁদিও না, যাহা বলি শুন। লেখন-সামগ্রী এখানে আন, আমি একখানি পত্র লিখিব।"

"কাহাকে লিখিবে?"

"পরে জানিতে পারিবে।"

"না, আমি তাহা পারিব না, আমি আপনার বিষয়ের কণাংশও চাহি না।"

যুবতী ভ্রূভঙ্গী করিলেন, বলিলেন—"এই কি তোমার আমায় ভাল বাসা?"

রমাসুন্দরী আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া লিখিবার আয়োজন করিয়া দিলেন।

সারদা বলিলেন "এইবার আমি পত্র লিখিব। লিখিবার পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

"কি প্রতিজ্ঞা?"

"যাহা বলি।"

"বলুন।"

"আমি তোমার হস্তে এই পত্র দিব, তোমাকে লইতে হইবে।"

"আমি লইয়া কি করিব?"

"আমার স্বামীকে দিবে।"

"প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না।"

"স্বামীকে না দাও নাই দিবে, এই পত্র ছিঁড়িবে না?"

"না।"

"কোন রূপে নষ্ট করিবে না?"

"না।"

"অন্য কাহাকেও দিবে না?"

"না।"

"এই বাটীর বাহিরে লইয়া যাইবে না?"

"না।"

"আমার মৃত্যু হইলে এই পত্র পড়িও —মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও খুলিও না।"

"আচ্ছা তাহাই করিব।"

"প্রতিজ্ঞা করিলে?"

"ব্রাহ্মণকন্যার বাক্যই যথেষ্ট।"

যুবতী পত্র লিখিয়া রমাসুন্দরীর হস্তে দিলেন। রমা তাহা অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিল।

সেই নিশিশেষে যুবতী ইহলোক ছাড়িয়া চলিলেন, তাঁহার জীবন-গ্রন্থি ছিঁড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সারদাসুন্দরীর আত্মা এ পৃথিবী ছাড়িয়া অপর পৃথিবীতে চলিয়া গেল। সেই নবীন বয়সে সে সংসারের সুখ হইতে বঞ্চিত হইল। হায়! এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান আছে? কিন্তু সে মৃত্যুতেও সুখভোগ করিয়াছে। এমন সুখ ভোগ করিতে কত জন লালায়িত, কিন্তু কয় জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে? একহস্ত স্বামীবক্ষে, অপর হস্তে পুত্রকে ধরিয়া সারদাসুন্দরী চক্ষু মুদিত করিলেন। সেই সময়ে স্বামীমুখ-নিঃসৃত

'প্রেয়সী,' 'প্রিয়তমে,' 'জন্মের মত চলিলে' সকরুণ মধুর প্রেম সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে তাহার আত্মা-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। এরূপ মৃত্যুতেও সুখ। তাহাতেই বলিতেছি, সারদাসুন্দরী মৃত্যুতেও সুখভোগ করিয়াছে। মরিবার সময় অতি ক্ষীণস্বরে কেবল একটী মাত্র কথা বলিয়াছিল——'ভুলিও না' সে কথা রমাসুন্দরী ভিন্ন আর কেহ শুনিতে পায় নাই, যদিও কেহ শুনিয়া থাকে, বুঝিতে পারে নাই।

ইহার দুই দিন পরে রাজকৃষ্ণ বাবু আপন গৃহে বসিয়া গোপালের সহিত কথা কহিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। কত কথা কহিলেন, কতবার কোলে লইলেন, কতবার চুম্বন করিলেন, তথাপি মনের আশা মিটিল না। যে প্রণয়াংশ স্ত্রীর প্রতি পড়িয়াছিল, সে টুকুও পুত্রেতে আসিল। রাজকৃষ্ণ বাবু আপন হৃদয়াপেক্ষাও গোপালকে ভাল বাসিতেন। সে ভালবাসার পরিমাণ নাই, সে ভাল বাসার সীমা নাই। পাছে সন্তানের কোন ক্লেশ হয়, এই ভয়ে তিনি স্ত্রীবিয়োগজনিত মনের দুঃখ মনেতেই রাখিতেন, বাহিরে প্রকাশ করিতেন না। বিশেষতঃ তিনি বাল্যকাল হইতে চিত্ত সংযত করিতে শিখিয়াছিলেন। কখন কাহারও জন্য দুঃখ করেন নাই, করিলেও বাহিরে প্রকাশ হইত না। আংশিক পুত্র সান্ত্বনার জন্য, আংশিক চিত্তকে আরও দৃঢ়তর সংযত করিবার জন্য তিনি পত্নীর নিমিত্ত বাহিরে কোন দুঃখই প্রকাশ করেন নাই। জনরব উঠিল, রাজকৃষ্ণ বাবুর মত সংযমী পুরুষ জগতে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

রাজকৃষ্ণ বাবু গোপালকে ভুলাইবার জন্য নানা প্রকার কথা কহিয়া, পরিশেষে গৃহ-শোভনার্থ গৃহের চারিদিকে দোদুল্যমান একখানি ছবির প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "গোপাল ঐ ছবিখানি নেবে?"

গোপাল উত্তর করিল "ঐ রকম এক খানি ছবি মার কাছে আছে, আমি আনিগে"।

এই বলিয়া যেমন পিতার ক্রোড় হইতে নামিবে, অমনি মাতার কথা মনে পড়িল, বলিল,—

"বাবা! মা কোথা গেছে?"

রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখের বিকারপ্রাপ্তি হইল, কিন্তু সে ক্ষণিক। তখনি স্থির স্বরে বলিলেন, "তোমার মা বাপের বাড়ী গেছেন।"

"সে কোথা বাবা আমি যাব।"

রাজকৃষ্ণ বাবু অনেক কষ্টে শিশুকে ভুলাইলেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু যে ঘরে বসিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বেই রাজপথ। জানালা খোলা থাকিলে প্রায় সকলই দেখা যায়। দেখিলেন, একটা মৃত মার্জ্জার-শাবক পথে পড়িয়া আছে। একটা বিড়ালী (তাহার গর্ভধারিণী হইবে) তাহাকে মুখে করিয়া পলাইতেছে। ভাবিলেন, জননীর এমন স্নেহ সন্তানে কি ভুলিতে পারে?

অপরাহ্ণ হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবু পুত্রকে কোলে লইয়া বাটীর পশ্চাৎস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। দুই মাস পরে রাজকৃষ্ণ বাবু (একক সকল কাজকর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পারায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক না হইলে সন্তানের যত্ন হয় না, এই ভাবিয়া) দেশ হইতে তাঁহার সেই মাতামহী ও তাঁহার বিধবা কন্যাকে কলিকাতায় আনাইলেন। যথার্থই স্ত্রীলোক না হইলে সন্তানের যত্ন হয় না। কবি যথার্থ লিখিয়াছেন :—

" প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর
করুণা নির্ঝর দয়ার নদী,
হত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি (রমণী) জগতে যদি ।"

রাজকৃষ্ণ বাবুর স্বদেশ হইতে উঁহাদের কলিকাতায় আনাইবার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, এই সময়ে রমাসুন্দরী রাজকৃষ্ণ বাবুর চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমাসুন্দরী সারদার নিকট হইতে পত্র লইয়া ভাবিলেন, এ পত্র খুলিতে আমার কি অধিকার? এ আমার পত্র নহে, তবে আমি কেন খুলিব? আবার ভাবিলেন, আমার পত্র নাই হউক, আমার প্রভুর পত্র। বিশেষতঃ গৃহিণী আমায় বড় স্নেহ করেন, আমার সমক্ষে কোন কথা গোপনে রাখেন না, তবে আমি ইহা কেন না খুলিব? বিশেষ আবার তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর এই পত্র আমাকে খুলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল সাত পাঁচ ভাবিয়া রমাসুন্দরী সারদার মৃত্যু পর্য্যন্ত পত্র খুলিলেন না।

পরদিন অপরাহ্ণে রমা আপন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া পত্র খুলিলেন। খুলিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। দুই চারি ছত্র না পড়িতে পড়িতেই কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে এ অবস্থায় কেহ তাঁহাকে দেখিলে মহা বিভ্রাট ঘটে, এই ভাবিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, পত্র লুকাইয়া রাখিলেন, এবং উন্মাদিনীর ন্যায় সেই গৃহে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কত বার বসিলেন, কতবার উঠিলেন, কতবার হাসিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার কত কাঁদিলেন, তথাপি হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। রমা এক্ষণে প্রকৃতা উন্মাদিনী। ভাবিলেন, তিনি (রাজকৃষ্ণ বাবু) আমায় অসময়ে আশ্রয়দান করিয়াছেন, তাঁহার এ অনিষ্ট কেমন করিয়া করিব—আমা হইতে হইবে না। তিনি আমাকে স্থান দান না করিলে, হয়ত, এত দিন আমার জীবনের শেষ হইত। যিনি আমার এত উপকার করিয়াছেন। আমি তাঁহার মনে ক্লেশ দিতে পারি না, পারিবও না। আমি এ পত্র তাঁহাকে দিব না, দিতে পারিব না। এই ভাবিয়া তিনি উদ্যানের দিকে ভ্রমণ করিতে গেলেন। সেখানে গিয়াও মনের তৃপ্তিলাভ হইল না। আর এক যন্ত্রণা আসিয়া তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল। মনে করিল, ' পত্র না দিলে

কি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে? না, এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই। আমি—পত্র ছিঁড়িব না, স্বীকার করিয়াছি; কখন নষ্ট করিব না, স্বীকার করিয়াছি; অন্য কাহাকেও দিব না, স্বীকার করিয়াছি; এ বাটীর বাহিরে লইয়া যাইব না, স্বীকার করিয়াছি; তবে আমি এ পত্র লইয়া কি করি? কোন নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দি, সেই উত্তম। এমন নির্জ্জনে রাখিতে হইবে যে, কেহই অনুসন্ধান করিলে পাইবে না' আমরা পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্যানের দক্ষিণ দিকের কতক গুলি জীর্ণ গৃহের উল্লেখ করিয়াছি। সে গুলিতে চাবি দেওয়া থাকিত। কেহই খুলিত না। এমন কি দশ পনর বৎসরের মধ্যে তাহা একবারও খোলা হয় নাই। রমা সেই স্থানেই ঐ পত্র লুকাইবার ইচ্ছা করিয়া চাবির তাড়া লইয়া (ইহা একটী ভগ্ন সিন্ধুকে পড়িয়া থাকিত) অনেক কষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা জীর্ণ কক্ষটীকে খুলিয়া সেই পত্র গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বের মত আবার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাড়া হইতে উক্ত গৃহের চাবিটী খুলিয়া সঙ্গে লইলেন, অবশিষ্ট গুলি ভগ্ন সিন্ধুকে যেমন ছিল, তেমনি করিয়া রাখিয়া দিলেন। ইহার কেহ বাষ্পও জানিতে পারিল না।

তখন প্রায় সন্ধ্যা আগত। রমা সেই চাবিটী সঙ্গে লইয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী হইতে পলায়ন করিল। অন্যূন চারি ক্রোশ ভ্রমণের পর একটী বিস্তীর্ণ জলাশয়পার্শ্বে আসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিয়া হস্তস্থিত চাবিটী জলাশয়ের অতল জলে নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষণকাল পরে চাহিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

যে রাত্রে রমা পলায়ন করে, সেই রাত্রেই রাজকৃষ্ণ বাবু তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজকৃষ্ণ বাবু ভাবিলেন, হয়ত রমাসুন্দরী কোন বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে। নতুবা তাঁহাকে বলিয়া গেল না কেন? বিশেষ আবার তাহার তিন মাসের মাহিনা বাকী ছিল, যাইবার সময় তাহাও ত তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইল না! পর দিন প্রাতেও তাহার অনুসন্ধানার্থ চারি দিকে লোক প্রেরিত হইল। তাহারাও পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় ফিরিয়া আসিল; দুই চারি জন সংবাদ আনিল, কিন্তু তাহা আমাদিগের রমাসুন্দরীর সংবাদ নহে। কেহ বলিল, তাহাকে ব্যাঘ্রে ধরিয়াছে; কেহ বলিল, সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে ইত্যাদি।

রাজকৃষ্ণ বাবু এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দুই মাস চলিয়া গেল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতামহী (সম্পর্কে) বিধবা কন্যা সহ কলিকাতায় আসিলেন। যে গৃহ গুলি পূর্ব্বে বাসোপযোগী ছিল, ইহারা কলিকাতায়

আসিলে সে গুলিতে স্থান না হওয়ায়, আমরা পূর্ব্বে দক্ষিণদিক্‌স্থ যে সকল জীর্ণ গৃহের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মেরামত হইতে লাগিল। ইহাদেরই একটীতে রমাদেবী সারদার সেই রাত্রের গুপ্ত পত্র লুকাইয়া রাখে। সে গৃহের চাবি রমা সঙ্গে লইয়া অতল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং সে গৃহের সংস্করণ শীঘ্র হইল না। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট সংবাদ গেল, দ্বার ভগ্ন করিতে হইবে, ইহাই পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল, এবং কার্য্যেও শীঘ্র পরিণত হইল। রাজকৃষ্ণ বাবু শুনিলেন যে, গৃহমধ্যে তাঁহার নামের এক খানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্র লইয়া বাহিরের গৃহে পড়িতে বসিলেন। কিন্তু পড়িতে বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। হস্তাক্ষর দেখিয়াই তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন, ইহা তাঁহার সারদার লেখা। আবার এরূপ গুপ্ত গৃহে থাকায় তাঁহার আরও ভয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে প্রথমে শিরোনামটি পড়িলেন :—

প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু—

একবার, দুই বার, তিন বার পড়িলেন, এমন সময়ে কাহার পদশব্দ হইল ; চাহিয়া দেখেন, এক জন অপরিচিত পুরুষ।

রাজকৃষ্ণ বাবু ঝটিতি পত্র পরিধেয়বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রমাদেবী পূর্ব্বোল্লিখিত জলাশয়পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখেন যে, এক জন পুরুষ তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান। সেই সময়ে যদি প্রবল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলেও তিনি এত চমকিত হইতেন না। বলিলেন, "একি স্বপ্ন? না স্বপ্ন নহে, সত্য।" অমনি বাতাহত ছিন্ন কদলীবৎ ভূমে পড়িয়া গেলেন। যুবা বলিলেন, "রমে, প্রিয়তমে, হৃদয়-ধন, উঠ।" এই বলিয়া যুবতীর হস্ত ধরিয়া তুলিলেন।

যুবতী বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

"আমি মরি নাই, আমার মৃত্যুর যে জনরব শুনিয়াছ, তাহা অলীক। আমি জলমগ্ন হইয়াছিলাম সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে সে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছি এখন আমার সঙ্গে এস।"

এই বলিয়া প্রতাপ রমাসুন্দরীকে জলাশয়ের অনতিদূরস্থ এক পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন।

রমা বলিল "আমার এত নিকটে থাকিতে তথাপি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে নাই?"

"সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম, কিন্তু করিলে কি হইবে? আমার স্বকার্য্য উদ্ধার হয় না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, এই ভয়ে করি নাই।"

"প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিয়াছ?"

"পারিবার আশা আছে, কিন্তু এখনও পারি নাই।"

"কত দিনে পারিব?"

"যত দিন না তোমার গৃহিণীর মৃত্যু হয়।"

"গত কল্য সারদাদেবীর মৃত্যু হইয়াছে।"

"তবে আমার আশারও ফুল ফুটিয়াছে।"

"তুমি এত অনুসন্ধান কোথা হইতে পাইলে?"

"কেন, তুমি কি ইহার কিছুই জানিতে পার নাই?"

"প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু এত আশা দিয়া মনকে প্রবোধ দি নাই। সারদাদেবী মরিলে সকল জানিতে পারিয়াছি।"

"সারদাদেবী মৃত্যুসময়ে তোমাকে কিছু বলিয়া গিয়াছেন?"

"এক খানি পত্র তাঁহার স্বামীকে দিবার জন্য আমার হস্তে দিয়া গিয়াছেন।"

"কৈ সে পত্র কোথায়? রাজকৃষ্ণ বাবুকে কি দিয়াছ?"

"না, আমি তা দি নাই, এবং দিতেও পারিব না।"

"তবে তুমি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিতে চাও না কি?"

"সেও আমার পক্ষে সহস্র গুণে উত্তম। আমি বনবাসিনী হইব, যোগিনী হইব, সংসারের সকল সুখের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিব, তথাপি স্বহস্তে সে পত্র তাঁহাকে দিতে পারিব না। তিনি আমাকে অসময়ে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার বক্ষে এ বিষম শেল আমি কেমন করিয়া আঘাত করিব? আমি কোন মতেই সে পত্র তাঁহাকে দিতে পারিব না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিলেন,—

"তিনি যদি আমাকে অসময়ে আশ্রয় না দিতেন, তাহা হইলে এত দিনে এ দেহের কণাংশও দেখিতে পাইতে না। অনাহারে হয়ত অভাগিনীর জীবনের শেষ হইত। আমি কি এমন কৃতঘ্ন, এই কয় দিবসের মধ্যে তাঁহার এ মহৎ উপকার ভুলিয়া যাইব। অভাগিনী হইতে তাহা হইবে না। আমি সে পত্র তাঁহাকে দিতে পারিব না।"

"তুমি নাই দাও নাই দিবে। আমি দিতে প্রস্তুত আছি। পত্র কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

"এরূপ নির্জ্জন ও গুপ্ত গৃহে; যে শতবর্ষ অনুসন্ধান করিলেও কেহ খুঁজিয়া পাইবে না।"

"পত্র ত নষ্ট কর নাই?"

"না, নষ্ট করি নাই। নষ্ট করিব না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, নতুবা নষ্ট করিতাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্যানের দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে তাহা রাখিয়া আসিয়াছি।"

"তাহাতে ত সর্ব্বদাই চাবি দেওয়া থাকে?"

"আমি দুই তিন দিন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছি, সে গৃহের চাবি

কোথায় থাকে। আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়াছি।”

প্রতাপের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। বলিলেন, “একাজ তুমি কেন করিলে?”

রমাদেবী মৌন হইয়া রহিলেন।

“আচ্ছা আমি স্বয়ং যাইব। গত রাত্রে সারদাদেবীর নিকট গিয়াছিলাম। আগামী কল্য আর এক বার সেই বাড়ীতে যাইব। কোন চিন্তা নাই। কিন্তু আমার আসিতে যদি বিলম্ব হয়, যত দিন আমি ফিরিয়া না আসি, তত দিন তুমি এই পর্ণকুটীরে থাকিও। এই খানে একটী বৃদ্ধা দাসী আছে, সেই তোমার সেবা করিবে।”

এই বলিয়া প্রতাপ রমাকে কুটীরের অন্যতম কক্ষে লইয়া গেলেন, এবং সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, “দেখ, আমি আগামী কল্য কোন বিশেষ কার্য্যে যাইব। এই স্ত্রীলোকটী রহিল, দেখিও।

রামমণি (বৃদ্ধার নাম) উত্তর করিল, “কোথায় যাইবে?”

“এখন শুনিয়া কাজ নাই, পরে জানিতে পারিবে।”

রমাদেবী স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া এক বারে বিহ্বলা হইলেন। সে কোথায় থাকে, কি জন্য তাহার স্বামীর নিকটে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্বামীকে বলিলেন,—

“দেখ, আমার একটী অনুরোধ রাখ। যখন সারদাদেবীর গৃহ হইতে তুমি ফিরিয়া আসিতেছিলে, তখন সারদাসুন্দরী একটী কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তুমি ফিরিলে না। সেই কথাটী শুন,—দুই মাসের মধ্যে তুমি স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট যাইও না, পরে যাইও।”

“তুমি এ সকল কথা কি রূপে জানিলে?”

“পত্রে সকল লেখা আছে।”

“তবে কি তুমি পত্র পড়িয়াছ?”

“হাঁ, পড়িয়াছি।”

আচ্ছা তাহাই করিব বলিয়া প্রতাপ দুই মাস অপেক্ষা করিলেন। পরে রাজকৃষ্ণ বাবুর আলয়ে গেলেন। যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজকৃষ্ণ বাবু পত্রের শিরোনামটী মাত্র পড়িয়াছেন আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে অপরিচিত পুরুষের উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই এই প্রতাপ।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই বলিলেন, “মহাশয়! আমি কক্ষান্তর হইতে আসিতেছি, আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।”

প্রতাপ কহিলেন, “কোথায় যাইবেন, আমি বিশেষ প্রয়োজনার্থ আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে যথেচ্ছা গমন করিবেন, কোন বাধা দিব না।”

রাজকৃষ্ণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এবং অগত্যা সেই স্থানেই রহিতে হইল।

প্রতাপ বলিলেন, "আপনি আমায় চিনিতে পারেন?"

"না,—আপনাকে যে কোথাও দেখিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। কি রূপে চিনিব?"

"আমার নাম প্রতাপচন্দ্র রায়। আমি ব্রাহ্মণতনয়,—রমাসুন্দরী আমার স্ত্রী। আপনি বোধ হয় রমাকে চেনেন?"

"হাঁ, আমি তাহাকে চিনি। সে এই বাড়ীতে বহু দিন রন্ধনকারিণী ব্রাহ্মণী ছিল। সম্প্রতি দুই মাস হইল, কোথায় গিয়াছে। বলিতে পারি না। অনেক অনুসন্ধান করা গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল ফলে নাই। আপনি তাহার অনুসন্ধানার্থ আসিয়াছেন? আপনি তাহার স্বামী? ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল যে, 'তাহার স্বামী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে'।"

"সে অনেক কথা। আমি তাহার অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসি নাই। আমি তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আমি আপনার সংসার-সুখোদ্যানে কণ্টক-বৃক্ষ রোপণ করিতে আসিয়াছি। রাগ করিবেন না।"

রাজকৃষ্ণ বাবু এক দৃষ্টে প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, "আপনার সুখের সংসারে কণ্টক দিব, রাগ করিবেন না। সুখ ও দুঃখ পৃথিবীর নিয়মানুসারে একটীর পর আর একটী আসে। আপনি অনেক দিন সুখভোগ করিয়াছেন, এক্ষনে দুঃখভোগ করিতে প্রস্তুত হউন।"

এই বলিয়া তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর পরিধেয়-বস্ত্র-মধ্যস্থিত পত্রের উল্লেখ করিলেন।

রাজকৃষ্ণ বলিলেন, "এ পত্র কাহার, তাহা আমি জানি না। বোধ করি আমার স্ত্রীর হইবে। রমাসুন্দরী বোধ হয়, ইহার সবিশেষ অবগত আছে। কারণ এ পত্র যে স্থলে ছিল, তাহা রমা ভিন্ন আর কাহারও রাখিবার ক্ষমতা নাই। তাহাতে আবার সে নিরুদ্দেশ। আপনি বোধ হয় আপনার স্ত্রীর নিকট হইতে এ সব জানিতে পারিয়াছেন।"

"পত্রে যাহা লেখা আছে, তাহা আমি অনেক দিবস হইতে জানি। আপনিও এখনি জানিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র পড়িতে অনুরোধ করিলেন।

পত্র পড়িবা মাত্র রাজকৃষ্ণ বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, বস্ত্রে মাথা ঢাকিলেন। পত্র হস্ত হইতে স্খলিত হইল; প্রতাপ তাহা কুড়াইয়া লইল।

রাজকৃষ্ণ বাবু বিলক্ষণ চিত্ত সংযত করিতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু এবারে সে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেন। যখন বস্ত্র হইতে মুখ তুলিলেন, দেখা গেল, তাঁহার দুই চক্ষে দুই বিন্দু জল।

তিনি প্রতাপকে পর দিন প্রাতে আসিতে অনুমতি করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি রাজকৃষ্ণ বাবুর নিদ্রা হইল না। যথাসময়ে প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকৃষ্ণ বাবু মাতামহীর সেই বিধবা কন্যাকে ডাকাইলেন। এই কয় জন ভিন্ন সে স্থলে আর কেহই ছিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,

"দেখ সৌদামিনী——"

সৌদামিনী রাজকৃষ্ণ বাবুর অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা। সুতরাং তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন,—

"দেখ সৌদামিনী, তোমার বাক্যের উপর আমার পৃথিবীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। অতএব সত্য কথা কহিও।"

এই বলিয়া তিনি পত্র পড়িতে লাগিলেন।

"আমি বহু দিন হইতে একটী কথা তোমার নিকট গোপন করিয়া আসিতেছি। সেই কথাটী আজি বলিব। ভাবিও না, আমি বিশ্বাসঘাতিনী। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা তোমার জন্য করিয়াছি, তোমার মঙ্গলের জন্য করিয়াছি, তোমার সুখের জন্য করিয়াছি। এ সংসারে তুমি বই আমার আর কে আছে? বলিব, কিন্তু রাগ করিও না।

তোমার স্মরণ হইতে পারে১২৭২সালের বৈশাখ মাসে আমি কাশীতে যাই। সেই সময়ে আমার গর্ভ হয়, তাহাও তুমি জান। সেখানে যাইয়াই একটী অমূল্য রত্ন প্রসব করিলাম, কিন্তু সে রত্ন গোপাল নহে। সে রত্ন দশ দিন মাত্র ভোগ করিয়াছিলাম। একাদশ দিবসে নিষ্ঠুর কালান্তক অকালে তাহাকে এ সংসার হইতে লইয়া গেল। তুমি এক জন প্রকৃত হিন্দু। পুত্রের জন্য কত পূজা, দান, ধ্যান করিয়াছ। অনুকূল দেবতা তোমার আশা সকল করিলেন বটে, কিন্তু তখনই সে ইহ সংসার ছাড়িয়া চলিল, এ কথা তোমাকে সে সময় বলিলে, হয়ত তুমি জন্মের মত জীবনত্যাগ করিতে। এই জন্যই নিকটস্থ গ্রাম হইতে একমাসবয়স্ক একটী বালককে হরণ করিয়া লইয়া আসি। সেই ওই গোপাল। গর্ভধারিণীর নাম রমাসুন্দরী, পিতার নাম প্রতাপচন্দ্র রায়। আমাদের রন্ধনকারিণী রমাই যে সেই রমা, তদ্বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। রমাকে বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমি ইহার মধ্যে আর কোন সন্দেহ প্রবেশ করাইতে পারি নাই। তুমিও কিছু মাত্র সন্দেহ করিবে না। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সৌদামিনী মাসী এ সকল বিশেষ অবগত আছেন। তাঁহার নিকট হইতেও কিছু কিছু জানিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি হরণ করিয়া আনে, তাহার নাম বলিলে প্রতিজ্ঞা-বিরুদ্ধ কাজ হয়; সুতরাং সে কথা বলিলাম না, ক্ষমা করিবে।

প্রতাপের সঙ্গে আমার অনেক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চারি বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। অতএব গোপালকে শীঘ্র ফিরাইয়া দিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।

অদ্য আমার সহিত তাহার আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, দুই মাস পরে তিনি যেন সন্তান লইতে আসেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাই। কিন্তু এ কথাটী প্রথমে মনে পড়ে নাই। তিনি আমার গৃহ হইতে প্রত্যাগমন কালীন ইহা আমার স্মরণ হইল। তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম; তিনি শুনিলেন না, ফিরিলেন না।

আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। বোধ হয়, আমি আর বাঁচিব না। তোমার হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিলাম। ভরসা করি ইহার যন্ত্রণা তুমি সহ্য করিতে পারিবে। আমি চলিলাম, মনে রাখিও।

তোমার—সারদা।"

পত্র শুনিয়া সৌদামিনীর মুখ মলিন হইয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই বলিল, "আপনি কিসের সত্য কথা বলিতেছেন, আমি কি বলিব? কি হইয়াছে? আমি ইহার কিছুই জানি না। এ পত্র কে লিখিল? এ ত সারদার লেখা নহে।

কথা শুনিয়া প্রতাপের কিছু ক্রোধ হইল, কিন্তু তিনি তাহা সংযত করিয়া বলিলেন:—

"এরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত নহে। আপনি ভুলিয়া যাইতে পারেন। এ অনেক দিনের কথা। স্মরণ করিয়া দেখুন।"

সৌদামিনী সক্রোধে বলিল,—"এরূপ কথা কি কেহ কখন ভুলিয়া যায়?" বলিয়াই প্রতাপের দিকে এক কটাক্ষ করিল। প্রতাপ অধোবদন হইল।

রাজকৃষ্ণ বলিলেন, "যাহা জান সত্য বল।"

"সত্যই বলিয়াছি।"

এমন সময় সৌদামিনী চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ। গৃহে দুইটী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়াছে। অমনি ভূমে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

স্ত্রীলোক দুইটী—রমাসুন্দরী, এবং সেই পর্ণকুটীরস্থ বৃদ্ধা রামমণি।

প্রতাপ রমাসুন্দরীকে দেখিয়া এক বার ভ্রুকুটী করিলেন মাত্র।

সৌদামিনী ভূমিতল হইতে উঠিয়া একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছি, সকলই মিথ্যা। পত্রে যাহা লেখা আছে, তাহার কণাংশও অলীক নহে। জগদীশ্বর সাক্ষী।"

রাজকৃষ্ণ বাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন। বহু কষ্টে বিস্ময় দমন করিয়া সকল বিষয়ের তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌদামিনী বলিল:—

"পত্রে যাহা লেখা আছে, তাহার সকলই সত্য। আপনার পুত্রের মৃত্যুর পর আমরা এই বৃদ্ধাকে (রামমণির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) দিয়া এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধিত করি। আমি ইহাদের উভয়কেই চিনি। (রমাদেবীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ইনিই গোপালের গর্ভধারিণী।"

রাজকৃষ্ণ বাবু আরক্তলোচনে রামমণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কাজ কেন করিলে?"

বৃদ্ধা বলিল " অর্থলোভে। "

রাজকৃষ্ণ বাবু সক্রোধে বলিলেন,—" আর শুনিতে চাই না। যাহা শুনিবার, তাহা শুনিয়াছি। এত পূজা করিলাম, এত দান ধ্যান করিলাম, তথাপি পোড়া বিধি আমার কপালে সুখ লেখেন নাই। আমি সুখ চাই না। "

এই বলিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু গোপালকে লইয়া প্রতাপের হস্তে দিয়া বলিলেন, " যাও বাছা, তোমার পিতার কাছে যাও। আমি তোমার কেহ নই। জন্মের মত বিদায় হইলাম। আর বোধ হয় তোমাকে দেখিতে পাইব না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করিও। বোধ হয় আমার দেখা পাইবে না। আমি জন্মের মত চলিলাম। আমার আর কেহ নাই। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমাকে দিয়া যাইলাম। তুমি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিও। হায়! যে গ্রন্থিতে হৃদয় বাঁধিয়া ছিলাম, সে হৃদয়-গ্রন্থি এত দিনে ছিঁড়িল !! "

তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কাঁদিল।

এত দিনে প্রতাপ আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ করিল। হরণাবধি যে পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, সে পুত্রকে এত দিন পরে ফিরিয়া পাইলেন।

দুই চারি দিনের মধ্যে রাজকৃষ্ণ বাবু সে বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানে না। কলিকাতা হইতে প্রথমেই তিনি কাশীতে গমন করেন। সেখানে দুই দিন অবস্থান করিয়া সম্প্রতি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। আমরা সমস্ত ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমঃ

শুকপক্ষী।

ভাগ্যে আজ আসিলাম সুরধুনী-তীরে রে,
ওরে পাখি, তোরে তাই দেখিনু শাখায়!
কি হেতু নীরব হলি ? গাও ফিরে ফিরে রে,
কেন ভয় ? ভালবাসি আমি রে তোমায়!
জুড়াতে তোমার গানে, কতবার এইখানে
আসিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়,
কিন্তু হায়, একদিনও দেখিনি তোমায়।

আজি পাইয়াছি তোরে বিহঙ্গভূষণ রে,
অমিয় জিনিত গলে বারেক শুনাও
সেই গান, যেই গানে পূরাও গগন রে,
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও।
কোন ক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,
গাও গান, না গাইলে মোর মাথা খাও,
শাখি-শাখে ব'সে পাখী একবার গাও!

৩

স্থলে জলে ধীরি ধীরি বহিছে পবন রে,
ঝুরু ঝুরু রব হয় পাতায় পাতায় ;
কলরবে কল্লোলিনী করিছে গমন রে,
চঞ্চল লহরী কোলে লহরী খেলায় ;
নব কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে ;
সমীর অধীর হয়ে চুম্বিয়া তাহায়,
উড়ায়ে সুরভিরাশি আকাশে ছড়ায়।

৪

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,
অই দ্যাখ্, উঁকি পাড়ে পূরব গগনে ;
নয়ন-বিভায় তাঁর পল্লব তরুণ রে
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে।
ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসর ভেদাভেদে,
পড়িছে ভানুর কর জাহ্নবী-জীবনে ;
সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে।

৫

এমন সুখের স্থলে—সুখের সময় রে,
যে আশা করিয়া আমি আসিয়াছি আ'জ ;
সে আশা পূরাও, পাখি, হয়ো না নিদয় রে !
পর-উপকার করা দয়ালুর কাজ।
বনের বিহঙ্গবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর
আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,
তৃষ্ণা নাশ রস-ধারা করিয়া সিঞ্চন।

৬

বহুদিন মধুময় গান শুনি নাই রে,
তেঁই সে তোমার কাছে মিনতি আমার ;
নরের সাধিত কণ্ঠে, শুনিতে না চাই রে,
কৃত্রিম সঙ্গীত ; গুণ কি আছে তাহার ?
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি
শুনিতে তোমার গলে সুধার ঝঙ্কার ;
গাও রে গায়কবর, গাও একবার।

৭

পুরুষের কণ্ঠরব বিষ বোধ হয় রে,
আমারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় রে,
শুনাও, শুনিয়া পুন গৃহে ফিরে যাই !'
যদি, পাখী, বল তুমি,—'সঙ্গীতে ভারতভূমি
অদ্বিতীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই,'
বাস্তবিক ছিল আগে ; এখন বড়াই !

৮

রমণীর কণ্ঠ, পাখী, জানি সুধাময় রে,
কিন্তু এবে কোন্ নারী সে সুধা বিলায় ?
খেম্‌টা-বাইর গলে—শুনে ঘৃণা হয় রে !—
যদিও রমণী কণ্ঠ—কে শুনিতে চায় ?
যে শুনিতে চায় চা'ক্, সে সুধা যে খায় খা'ক্ !
আমি তা চাহি না, পাখী, তুমিই আমায়
শুনাও : তোমারি গান মধুর শুনায়।

৯

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গভবনে রে,
অই দ্যাখ্, ঘরে ঘরে বিবাহ, পূজায়,
খেম্‌টা বাইরে লয়ে বঙ্গসুতগণে রে,
মাতিছে রসিত হয়ে সবিষ সুরায় !
মন খুলে লাল জলে, উঠিছে রমণী-গলে
গীত-ছটা ! শ্রোতাগণ সাবাসে তাহায় !
নরকে ভূতের দল পেত্নিনী নাচায় !

১০

ভারতের সে সুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,
পুরনারী গীত-ধারা বরষে না আর !
উত্তরা বিরাট-সুতা এবে কেউ আছে রে,

শুনাতে বিশুদ্ধ গান ভারত মাঝার ?
বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,
মদিরার গন্ধ উঠে !—উঠে রে উদ্গার !
ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার !

১১

তাই রে, বিহগ, তোর মনভোলা গান রে
শুনিতে এসেছি আ'জ ত্যজিয়া ভবন;
গাও সুখে একবার জুড়াক্ পরাণ রে,
মিটুক্ বাসনা—সুখী হউক্ শ্রবণ !
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ জাতকবিগণ
গেয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন।

১২

তার পর, জয়দেব কবিতা-কাননে রে
'রাধাকৃষ্ণ' বুলি—চির মিশ্রিত সুধায় !—
ঢুলি ঢুলি ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে,
নিদাঘ-তৃষিত কণ্ঠে অমৃতের প্রায় ;
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস,
ভারত মুকুন্দরাম, প্রসাদ * ঈশ্বর,
গায়িলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর ;

১৩

আর এক পাখী, পাখি, কি কব তোমায় রে,
সে পাখীর নাম ছিল ' শ্রীমধুসূদন ' ;
ডুবায়ে গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় সুধায় রে,
সে সুধায় বসুধায় সুখী সব জন ;
কি যে মধুরিম গান, কি যে মধুরিম তান
ছাড়িত সে কলকণ্ঠী, হবে কি তেমন ?
সে পাখী গিয়াছে উড়ি ছাড়িয়া কানন !

১৪

সেই পাখী শেষ পাখী বঙ্গের কাননে রে,
গাইতে গাইতে গান পালাল যে দিন ;
সে দিন হইতে সুধা পশে না শ্রবণে রে !
তেজাল বাসনা মোর হয়েছে মলিন !
আধুনিক কবি যারা, ছাতারে, বায়স তারা !
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন !
শ্রুতিমূলে বাজে যেন তন্ত্রহীন বীণ !

১৫

এসেছি সে হেতু তোর গান শুনিবারে রে,
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন !
কেন দেরি, ওরে পাখি ? সুমধুর ধারে রে
নীরস মানসে রস কর বরিষণ।
প্রেয়সী-বিরহে কেহ ত্যজিয়া সংসার গেহ,
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিঞ্চন
শুনিতে তোমার গান ভুবনমোহন !

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি সুধা বরিষণে রে,
নিদাঘে নীরস গাছে যেন জলধর
মধুর শীতলতর সলিল সিঞ্চনে রে
নবীন পল্লবময় করে কলেবর।
যতক্ষণ তুই তারে ভিজাস্ সঙ্গীতধারে,
বিরহ-যাতনা তার হয়রে অন্তর ;
দুখের জগতে তুই সুখের আকর ।

১৭

কিন্তু, পাখি, বিরহের যাতনা কেমন রে,
(প্রেয়সী-বিরহ !)আ'জো জানিনা তাহায় !
বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে ;
যার যা বাসনা যায়—তাহারে সে চায়।
অতএব যে আশায় এসেছি, পূরাও তায়

---

* রামপ্রসাদ সেন।

সঙ্গীত মাধুরী ঢালি ; নিবেদি তোমায়,
তুমি বই সে সঙ্গীত কে আর শুনায় ?

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি শুকবর রে,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও ;
সেই গান ভাল বাসে আমার অন্তর রে,
বারেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও।
সে গান তুমি না হ'লে ভাল লাগে কার গলে?
তাই বলি, বনমণি, একবার চাও,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও।

১৯

ভারত এখন, পাখি, পরের অধীনী রে,
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবর !
অধীনো আমরা ! অই দুখ-নিশিথিনী রে
করেছে আঁধার, হায়, হৃদয়-অম্বর !
দেখ্, পাখি, পলে পলে, নয়ন ভাসিছে জলে,
অধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর !
বড় দুখী, পাখি, মোরা জগত ভিতর !

২০

আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে,
পরের পাদুকা তাই শির পাতি বই !
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হয়েছে হৃদয় রে,
না পারি সহিতে তবু ম'রে ম'রে সই !
খেতে,শুতে,দিনে রেতে,বিষম যাতনা পেতে
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই ?
সবাই স্বাধীন, সুখী ;—আমরাই নই !

২১

এ ভারত একদিন, বিহঙ্গ-রতন রে,
ভূতলে স্বরগ ছিল ; কে ছিল তেমন ?
পশ্চিমে দক্ষিণে পুবে জলধি বেষ্টন রে ;
উত্তরেতে হিমালয় ভূধর-রাজন ;
বাঁধা ছিল আট ঘাট, দুই দিকে দুই ঘাট,
শত্রু-বল-অবরোধী প্রাচীর মতন,
তিন ধারে জলধির পরিখা বেষ্টন।

২২

যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী নিচয় রে,
রজত জিনিত হার ভারত-গলায় ;
সুবিশাল দেহ খানি মণি-খনি ময় রে,
কবরী শোভিত নব লতিকা মালায় ;
সুবাস কুসুম বাস, পূর্ণেন্দু মধুর হাস,
পরাজিত সব দেশ ভারত বিভায় ;
শশাঙ্ক জোনাকি ভাতি যেমতি নিভায়।

২৩

হায় রে, বিহঙ্গবর, বিধি-বিড়ম্বনে রে,
ভারতের সে মুরতি মলিন হয়েছে !
নিয়ত পীড়িতা হয়ে বিজাতি শাসনে রে,
সেরূপ ঘুচিয়া গিয়া কঙ্কাল রয়েছে !
আজিও সাগর নাচে, আ'জো ফুল ফুটে গাছে,
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত রয়েছে ;
কিন্তু সে অমর ভাব ঘুচিয়া গিয়েছে !

২৪

আজিও ধাইছে অই জাহ্নবী যমুনা রে,
দুলায়ে লহরীমালা অস্ফুট বাদনে ;
আজিও লতিকাকুল কুসুম-ভূষণা রে,
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে ;
কিন্তু রে তেমনতর হৃদয় শীতলকর
দৈবীভাব নাহি আর ভারত ভবনে !
'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে করাল বদনে।

২৫

মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে,
কিম্বা চির অমানিশি হয়েছে বিস্তার ;
অথবা অযুত দীপ পূর্ণালোকময় রে,
নিবেছে ভারত-মুখ করিয়া আঁধার !
নিশাচরী অধীনতা ভারত কনকলতা
বিশাল বিষাল দাঁতে চর্ব্বি অনিবার,
করেছে কি দশা, হায়, অস্থি চর্ম্ম সার !

২৬

ত্যজিয়া ভারত-লক্ষ্মী ভারত ভবন রে
অপার জলধি পারে করেছে গমন ;
ত্যজিয়া চন্দ্রমা যেন সুনীল গগন রে,
দৃষ্টি অবরোধী জলে হয়েছে মগন !
অন্ধকার চারি ধার, অন্ন বিনা হাহাকার,
পীড়নে ভারতবাসী করিছে রোদন !
ভারত-সন্তান এবে মলিন বদন !

২৭

পাখি রে, হবে কি পুন সুদিন উদয় রে ?
পুন কি ভারতে, পাখি, আনন্দ ছুটিবে ?
পুন কি ভারত-দুখ হইবে বিলয় রে ?
স্বাধীনতা-জয়-গান পুন কি উঠিবে ?
পুন কি গৌরব-রবি, দেখায়ে উজ্জ্বল ছবি
এ আঁধার বিনাশিয়া গগনে ফুটিবে ?
বোধ হয়, সে সুদিন আর না ঘটিবে !

২৮

তাই রে, হতাশ হয়ে তোমার নিকটে রে
এসেছি ; গাও রে গান—গাও একবার ;
স্বাধীনতা এ কপালে যদিও না ঘটে রে,
তবুও সে গানে সুখ হইবে সঞ্চার।
স্বাধীনতা-গান বই, কোনো গানে সুখী নই ;
তাই রে, স্বাধীন পাখি, মিনতি আমার,
অধীনের কাণে কর সে গীত আসার।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য ও বহুবিবাহ।

ভারতভূমি রত্নগর্ব্ভা সুবিশাল পৃথিবীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী। প্রায় এমন দ্রব্য দেখা যায় না, যাহা ভারতবর্ষ প্রচুররূপে প্রদান না করে। এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, দেশ দেশান্তরের মানবগণও ইহার প্রসাদে জীবনযাপনোপযোগী অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠমুনির কামদুগ্ধা নন্দিনী গাভীর ন্যায়, স্বর্গীয় কল্পতরুর ন্যায় ভারতভূমি আবহমান কাল , খনিজ, প্রাণিজ, প্রভৃতি প্রভূত দ্রব্যনিচয় উৎপাদন করিয়া সূর্য্যতলে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে, এ কথা কেহই অসঙ্গত বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রকৃতিদেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন এবং উত্তরকালেও যে এইরূপ থাকিবেন, অনুভববৃত্তি তাহা এক প্রকার আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে। যদিও কালের অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতভূমি প্রাক্তন সৌভাগ্যসুখে দুষ্প্রাক্তন হইয়াছে, যদিও

স্বাধীনতা রত্ন হারাইয়া আজি সপ্তশত বর্ষাধিক পরাধীনতার চিরক্লেশসম্ভূত উৎপীড়নে শক্তিশূন্য হইয়াছে এবং যদিও সুখ-শশাঙ্ক-জাত অমৃতময়ী বিশ্বশোভিনী জ্যোৎস্না রজনীর সহবাস পরিবর্ত্তে চিরদুর্ব্বিসহ অসুখময়ী অমাবস্যা রাত্রির গাঢ় তমসে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি বহুরত্নপ্রসবিনী। ঈদৃশ অবস্থাতেও যখন "যা চাই, তাই পাই" তখন সাত শত বৎসরের পূর্ব্বে ভারত যে কত রত্ন, কত জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য এবং কত অমৃত প্রসব করিত, তাহা মনোহভিনিবেশ পূর্ব্বক একবার চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই চূড়ান্তরূপে মীমাংসিত হইয়া যায়। প্রতীচ্য মিসরীয় ও ফিনিসীয় জাতিই ভারতপ্রসবিত দ্রব্যনিচয় প্রথমে বিদেশে লইয়া যায় (১) কিন্তু সেই জাতির পূর্ব্বে ভারতের ধন ভারতেই ছিল।—সুখসৌভাগ্যেরও ইয়ত্তা ছিল না।—কিন্তু কালেতে করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষজাত অপরিমিত উৎকৃষ্টতর সামগ্রী সকল পররাষ্ট্রে নীত হওয়াতে, বিদেশীয়দিগের নেত্রোন্মীলিত হইল; ক্রমে ক্রমে তাহারা ইহার সহিত স্থায়ী বাণিজ্য আরম্ভ করিল। মিসরীয় ও ফিনিসীয়দিগের পরে পারস্য গ্রীক্ ও রোমীয় জাতি পর্য্যায় ক্রমে এ দেশে আগমন করে। রোমীয়েরা নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন, উৎকৃষ্ট রেসম, সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি, ভারতবর্ষ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে লইয়া যাইত তত্তৎ দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগের স্বদেশের বহুল রূপে উন্নতিসাধন করিয়াছিল (২)। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ, রোম সভ্য হইবার অনেক পূর্ব্বে সর্ব্বোচ্চ সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। এমন কি গ্রীক্দিগের নিকট হইতে সভ্যতা-সম্বন্ধে রোম অনেকাংশে ঋণী এবং গ্রীক্জাতিও উক্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ ও মিসরের নিকট বহুল শিক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ কাহারও নিকট কিছুই লয় নাই। বরং মিসরও এ দেশ হইতে বাণিজ্যবশতঃ অনেক বিষয়ে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল, সুতরাং রোমের সভ্যতা-সোপান আরোহণের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কি বিদ্যা, কি শিল্পবিদ্যা, কি রাজনীতি, কি সামাজিক ব্যাপার, সকল

(১) We find, accordingly, that the first voyages of the Egyptians and Phœnicians, the most ancient navigators mentioned in history, were made in the Mediterranean. Their trade, however, was not long confined to the countries bordering upon it. by acquiring early possession of ports on the Arabian Gulf, they extended the sphere of their commers, and are represented as the first people of the West, who opened a communication by sea with India. *Robertson's Ancient India.* Sect. I. p. 5.

(২) Robertson's Ancient India. Sect. II. p. 55.

বিষয়েই ভারতবর্ষ উচ্চতম স্থানের অধিকারী হইয়াছিল।

এক্ষণে আর একটি কথা হইতেছে, রোম কি কেবল ভারতবর্ষের প্রসাদেই সুসভ্য হইয়াছিল? অন্যান্য দেশের সহিত কি তাহার সমাজোন্নতি সম্বন্ধে বাণিজ্য-বিষয়িণী ঘনিষ্ঠতা ছিল না? তাহার উত্তর, ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা রোমের প্রতি প্রভূত পরিমাণে মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল (৩)।

পাশ্চাত্য প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিৎ এরিয়ান্ (Arrian) বলেন, গ্রীক্, রোমীয় প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের অ-জানিত কতক গুলি স্বল্পমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে নানাবিধ উৎকৃষ্ট সুগন্ধ দ্রব্য, নীলকান্তমণি, অয়স্কান্তমণি, পদ্মরাগমণি, হীরক প্রভৃতি রত্ন; চিত্রিত কৌশিক ও সূত্র বস্ত্র; রেসমী সূত্র; হস্তিদন্ত প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ লইয়া গিয়াছিল (৪) ফলে ভারতবর্ষের প্রসাদেই রোমেশ্বর জুলিয়াস্ সিজার ব্রুতাসের মাতা সার্ভিলিয়াকে ৪৮৩৫৭০৲ টাকা মূল্যের একটি বৃহৎ মুক্তা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রাণী ক্লিওপেত্রার প্রসিদ্ধ মৌক্তিক কর্ণভূষণের ১৫১৪৫৮০৲ টাকা মূল্য হইয়াছিল (৫)। সুতরাং, যে ভারতবর্ষের কৃপায় পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এতাদৃশ বহুমূল্য দ্রব্য লাভ করিয়াছিল, সে ভারতভূমি যে কতদূর ঐশ্বর্য্যশালিনী, তাহা আর বাহুল্য রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতভূমির ধন প্রাচীন কালাবধি আজি পর্য্যন্ত প্রতীচ্য জাতিরা আবহমান দোহন করিয়া আসিতেছে, তথাপি, নিঃশেষ করিতে অক্ষম। শত শত বিদেশীয় রাজা, ভারতের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইহার প্রতি বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন, কিন্তু ভারতভূমি চিররত্নপ্রসবিনী। ভারতবর্ষ পুরাকালে গ্রীক, রোমীয় পারস্য প্রভৃতি জাতিদিগকে সমৃদ্ধ করাছিল, এক্ষণে ইংলণ্ডের দেহপুষ্টি সংসাধন করিতেছে। বলিতে কি, এক ভারতের সহিত প্রথম সূত্রে বাণিজ্য সম্বন্ধ করিয়া ইংলণ্ড ভূমি অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বরী হইয়াছে, ইহা ইতিহাস সকলকেই দেখাইয়া দিতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, পাশ্চাত্য জাতীয়েরা বাণিজ্যবলে যে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যে স্বস্ব দেশের মহতী উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষের নিজ বাণিজ্য কিরূপ ছিল। বাণিজ্য দুইপ্রকার—বহির্ব্বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এই দুয়ের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই লিপ্ত ছিল। কেন যে ভারতবর্ষ বহির্ব্বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া অন্তর্ব্বাণিজ্য করিত, অনুসন্ধান করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বকল্ প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে যে দেশে প্রকৃতি মুক্ত-

(৩) Ibid Sect. II. p. 58 and 59.

(৪) Robertson's Ancient India. Sect. II. p. 61 and 62.

(৫) Ibid. Sect. II. p. 58.

হস্তা—যে দেশে প্রকৃতির প্রসন্নতায় অনতি ক্লেশে আশানুরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, সে দেশের লোক বিদেশজাত দ্রব্যের আশা করে না (৬)। সুতরাং প্রভূতরত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমির বহির্বাণিজ্যে ঘনিষ্ঠতা না থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই জন্যই এ দেশে প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধে যত কিছু দেখা যায়, তাহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। যে দেশে "এক আছে এক নাই" সেই দেশ দেশ দেশান্তরে আশানুরূপ দ্রব্য লাভের জন্য, স্থল পথেই হউক, আর জল পথেই হউক, বাণিজ্য ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট হইয়া যাতায়াত করে। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশ ভিন্ন বিদেশজাত কিছুরই উপযোগিতা বা আবশ্যকতা জ্ঞান করিতেন না। বিশেষতঃ, স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত, এ দেশীয় শিল্পমণ্ডলী লৌকিক ব্যবহারের জন্য এত উৎকৃষ্ট শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিত যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা কতিপয় ধাতবদ্রব্য ভিন্ন বিদেশের মুখাপেক্ষা করিতেন না (৭)। কিন্তু যে কতিপয় ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য জাতিরা স্বয়ং আনিয়া যোগাইত। কবিবর কবিকঙ্কণের কবিতার্দ্ধ "জীরার বদলে হীরার" ন্যায় বিদেশীয়েরা উল্লিখিত দ্রব্য গুলির বিনিময়ে অপর্য্যাপ্ত মণি মুক্তা প্রভৃতি লইয়া যাইত। ফলকথা, ভারতবর্ষবাসিগণের যাহা কিছু অল্প স্বল্প প্রয়োজন হইত, তাহা "পায়ের উপর পা দিয়া" ঘরে বসিয়া পাইতেন; সুতরাং বিদেশে যাইবার আবশ্যক হইত না।

যাহা হউক, ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য এই দুয়ের মধ্যে কেবল শেষোক্ত বাণিজ্যতেই যে কেন আসক্ত ছিল, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক্। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের নিমিত্ত ভারতবর্ষকে পর দেশের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত না, প্রকৃতি তত্তাবতের পূরণ করিয়া দিতেন। সুতরাং সুদূর বিদেশে গমন করিয়া বহির্বাণিজ্য করিবার আবশ্যকতা ছিল না। তাহাতে আবার "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই কবিতার্দ্ধ প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বাধীন হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল। স্বদেশের প্রতি মমতা চিরস্থায়িনী করিবার জন্য ঐরূপ অপূর্ব্ব কবিতার সৃষ্টি, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং ঐ কবিতার মাহাত্ম্য-বশতঃই প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশের প্রচুর পরিমাণে সম্যক্ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বোধ করি, তৎকালে এই রূপ না করিলে—ভারতের যে প্রাচীন গৌরব আজি পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান এবং অধুনাতন ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মানস-মুকুরে যাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া কত উপকার

(৬) Buckle's History of Civilization.

(৭) Robertson's Ancient India. Sect. II. p. 63.

করিতেছে তাহা এত অধিক পরিমাণে হইতে পারিত না। কেহ কেহ বলিবেন যে, প্রাচীন মিসর, গ্রীক্, ও রোমীয়েরা তবে কি রূপে দূর দেশান্তরে গমন করিয়া ভূয়সী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন? তদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তত্তৎ দেশে যে যে বিষয়ের অভাব ছিল, সেই গুলির পরিপূরণ করিবার জন্যই তাহারা এ দেশ সে দেশ করিয়া বাণিজ্য করিত। যদ্যপি ভারতের ন্যায় ঐ সকল দেশেও প্রকৃতির প্রকৃত প্রসন্নতা দৃষ্ট হইত বোধ করি তাহা হইলে তাহারা কখনই বিদেশ ভ্রমণ করিত না। ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত অবস্থা ভাল, সুতরাং ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশীয়দিগের দ্বারে গিয়া প্রার্থী হইতেন না। ফলকথা, ভারতবর্ষের উন্নতির পথ ভারতবর্ষেই ছিল, তাহা না থাকিলে, ভারতবর্ষীয়েরা অবশ্যই বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেন।

কিন্তু আবার দেখা যায়, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি লোক দূর দেশান্তরে পোতারোহণে বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুমাত্রা, জাবা, বালী প্রভৃতি দ্বীপে এখনো তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের কতকগুলি দেবমূর্ত্তি জাবাদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে এবং এখনো বালীদ্বীপে হিন্দুরা বাস করিতেছে, তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, সকলাংশে না হউক, অনেকাংশে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ন্যায় দৃষ্ট হয় (৮)। অতএব তত্তৎ স্থানে হিন্দু বসবাস অবশ্য বহির্বাণিজ্য প্রযুক্তই হইয়া থাকিবে। তবে এক্ষণে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা ভারতবর্ষের দূরস্থ দেশেও বাণিজ্য করাতে তাঁহারা বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এ দিকে মনু প্রভৃতি মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে আর্য্যজাতির স্বদেশ ব্যতীত গমন বা বিদেশে তথায় বাণিজ্যাদি করিবার বিধানাদি দৃষ্ট হয় না। যদিও দুই এক স্থানে আভাসিতরূপে কিছু কিছু লক্ষিত হয়, বটে, কিন্তু তাহা চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্রের প্রতি। কিন্তু তাহাও আবার নিতান্ত বিরল। উত্তরোত্তর উচ্চস্থ তিন বর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ, ইহাঁদিগের ভারতবর্ষ বহির্ভূত দেশে গমনাগমনাদি বিষয়ে আদৌ কোনো বিধান ছিল না। তবে যে সকল হিন্দু দূর দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার শাস্ত্র সম্মত নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃই সেরূপ ঘটিয়াছিল। ব্রাত্য (পতিত অর্থাৎ দশ সংস্কার বর্জ্জিত) হিন্দুরাই ভারতবর্ষের বহির্ভূত দেশে গিয়া বাস করিতেন। কারণ, সমাজচ্যুত (এক ঘ'রে) হইয়া প্রতিবেশীদিগের নিকট অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর ও অসহ্য, তদপেক্ষা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে বসবাস করা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর; এই জন্যই জাবা প্রভৃতি দ্বীপে ব্রাত্য হিন্দুগণ গমন করিতেন। এবং এখনো যে সকল হিন্দু বালী দ্বীপে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীন ব্রাত্য হিন্দুদিগের বংশোদ্ভব।

(৮) Thomson's Gazatteer.

অতএব এতদ্দ্বারা এই প্রতীতি হইতেছে, পুরাকালে যে সকল হিন্দু বিদেশে গিয়া বাস করিতেন, তাঁহারা পতিত এবং লজ্জা ও ঘৃণাবশতঃই দেশত্যাগী হইতেন—শাস্ত্রানুসারে বা বহির্বাণিজ্য করিবার জন্য নহে। আবার দেখা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ কোন অলঙ্ঘনীয় অপরাধ বা নরহত্যাদি করিতেন, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাসিত করা হইত। সুতরাং হিন্দুদিগের বিদেশবাসী হইবার ইহাও একটি বলবৎ কারণ। যাহা হউক, কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, বঙ্গেশ্বরের পুত্র বিজয়সিংহ পোতারোহণে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তো পতিত হইয়া গমন করেন নাই? তদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি পতিত হইয়া সিংহলে যান নাই বটে, কিন্তু পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সুতরাং বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা শাস্ত্রসম্মত নহে। আবার রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থের মতে যদিও সিংহল (Ceylon) বা লঙ্কাদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান আছে, তথাপি সিংহল ভারতবর্ষের বহির্ভূত নহে। ইহা স্বীকার করিলে, বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায়, যে, ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল না; ইহার এক প্রকার প্রমাণও উপরে দেখান হইল। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রণয়-প্রলাপ।

কি দোষেতে প্রেয়সি লো হেন ভাব ঘটিল।
আচম্বিতে সুখ চিতে বিষ বাণ বাজিল॥
কি কারণে তব মনে কাল মেঘ ছাইল।
কি হেতু হতাশ হায় মনোমাঝে পশিল॥
দুখের প্রণয় তাই এত বুঝি বাড়িল।
জগত যুড়িয়া লোকে নিবারিতে নারিল॥
নয়নে নয়নে কেন দেখা দেখি করিল।
কাঁদিতে মহিতে হেন তাই বুঝি হইল॥
কত দিন কত মধু অধরেতে ঝরিল।
নাহি তার এক বিন্দু সকলি ত যাইল॥
সে চারু নলিনী মুখ কেন আজ সরিল।
বিরলে বসিয়া মরি কত হাসি হাসিল॥
এক মন এক ভাব সব দেখি যাইল।
হায় বিধি একি বিধি মোর ভালে লিখিল॥
ছিল এক, ছিন্ন ভিন্ন ভাবান্তর হইল।
খণ্ড খণ্ড যেন মেঘ গগনেতে ভাসিল॥

ছিল এক, ছিন্ন ভিন্ন ভাবান্তর হইল।
ঝরণা উঠিয়া যেন চারি দিকে চলিল॥
প্রণয় প্রসূন কম যাই মরি ফুটিল।
কালকূট ভরা কীট তায় আসি নাশিল।
পবিত্র প্রণয় আজ এত লঘু হইল।
তৃণসম বাতাঘাতে তাই যে রে ছিঁড়িল।

প্রণয় বন্ধনী গুরু লূতাতন্ত হইল।
কি আর জগতে তবে দৃঢ় পাশ রহিল॥
মনে মনে মানবেরে কিসে আর বাঁধিবে।
প্রকৃতি কোমল ভাব কেমনেতে রাখিবে॥
প্রণয় প্রলাপ কিহে সত্য সত্য হইল।
এই ছিল এই গেল নাহি আর রহিল॥

এই ছিল এই গেল এ কি দায় হইল।
উহু উহু মরি মরি মন প্রাণ দহিল॥

শ্রীভুঃ।—

দেশোন্নতির প্রকৃত উপায়

যশঃ ও তদানুষঙ্গিক উৎসাহই দেশের উন্নতি সাধনের প্রকৃত উপায়। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থ সভ্যদেশমাত্রেই উল্লিখিত বৃত্তিদ্বয়ের বিশেষ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। যদি অপরাপর বৃত্তির সহিত এই দুইটির আলোচনা না থাকিত, তাহা হইলে কখনই প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন মিসর, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন রোম, প্রাচীন পারস্য ও প্রাচীন আবিসিনিয়া এবং অধুনাতন কি ইউরোপীয়, কি আমেরিকীয় এবং কি আসিয়াস্থ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সমুদয় কখনই সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিতে পারিত না। জগদীশ্বর তদীয় বিশ্বরাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনের জন্য তৎসৃজিত মানবমণ্ডলীর হৃদয়ে যে সমুদয় উপায় স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে যশোবৃত্তি ও উৎসাহিতাবৃত্তি মনুষ্যকে এই মহা রত্নদ্বয় প্রদান না করিলে, বোধ হয়, উল্লিখিত প্রাচীন ও বর্ত্তমান দেশ সকলের এতদূর উন্নতি হইত না।

এমন লোক দেখা যায় না বা শ্রুতি-গোচর হয় না, যাহার অন্তঃকরণ যশোরত্ন লাভের জন্য ইচ্ছুক নহে। সংসারবিরাগী যোগী ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়াও যশো-বাসনা ভুলিতে পারেন নাই। নিবিড় অরণ্য-মধ্যে বা তমসাচ্ছন্ন গিরিগুহায় তাঁহারা নিরাহারে, অনিদ্রায় যাবজ্জীবন তপস্যা করিতেন। কিন্তু যদিও তাঁহাদিগের তপস্যার প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিকামনা, কিন্তু—তাহাতেও যশোলাভেচ্ছার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মনে মনে কি এরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই যে, আমরা ঈদৃশ কঠোর কার্য্যে নিবিষ্ট-চিত্ত হইলে জাতি সাধারণ আমাদের প্রশংসাবাদ করিবে? আবার দেখা যায়, সৎকার্য্য করিলে সকলে স্বভাবতঃই সুখ্যাতি করিয়া

থাকে; তবে যোগীদিগের মুক্তিলাভের জন্য তাদৃশ কঠোর তপস্যা অবশ্য যশোবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট, ইহা কে—অস্বীকার করিবে? সুতরাং এই জন্যই বলিতে হয়, জগতে এমন লোক নাই যাহার চিত্ত কোনো প্রকারে যশোলাভে. ধাবিত ও চেষ্টিত নহে। যে কালে সর্ব্বত্যাগী পরম যোগিগণের হৃদয়েও ইহা বিচ্ছিন্ন ছিল না, তবে সমাজস্থ জাতি-সাধারণের ত কথাই নাই। অপিচ যখন এ বৃত্তিটি ঈশ্বরদত্ত, তখন ইহা প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ে অটল ভাবে থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—না থাকিবার অণুমাত্রও কারণ নাই। যদি বল, যদি যশের দ্বারা দেশের উন্নতি সংসাধিত হয়, তবে ঋষিগণ সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া কি উন্নতি সাধন করিতেন? তদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে যে উপাদানে দেশের উন্নতি হয়, ধর্ম্ম তাহার অন্যতর উপাদান। যেমন কোন সামগ্রীকে বন্ধন করিয়া রজ্জুতে একটি মাত্র গ্রন্থি দিলে, তাহা দৃঢ় হয় না, সুতরাং দুই বা ততোঽধিক গ্রন্থির আবশ্যক; সেইরূপ দেশের বা সমাজের প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন করিতেও কেবল সামাজিক নিয়মাদিতে সম্যক্ রূপে সঙ্কুলান হয় না—ধর্ম্মের আব-শ্যক।—সুতরাং ঋষিদিগের নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম-চর্চ্চাতে দেশের উন্নতি বৃদ্ধির অন্যতর উপায় দৃষ্ট হয়।

মনুষ্যের যশোলাভেচ্ছা দেশের যেরূপ উন্নতিবিধায়িনী, আমাদের বিবেচনায়, বোধ হয়, সেরূপ আর কিছুই নহে। যদিও দেশোন্নতির জন্য অপরাপর সদ্বৃত্তির প্রয়োজন হয়, তথাপি যশোলাভেচ্ছাকেই অপেক্ষাকৃত মহদুপায় বলিতে হইবে।—আবার যশোলাভেচ্ছা যদি কার্য্যে পরিণত হইয়া উপযুক্ত উৎসাহ ও পুরস্কারভাগিনী হয়, তাহা হইলে তো "সোণায় সোহাগা" বা "মণি কাঞ্চনযোগ" হইয়া উঠে। বাস্তবিক, মনুষ্য একটি সৎকার্য্য-দ্বারা কিয়দংশে যশোভাগী হইলে যদি তাহাকে তদনুযায়ী উৎসাহ প্রদত্ত হয়, তবে তাহার অন্তঃকরণ বিশিষ্টরূপ আহ্লাদিত ও সফল-প্রযত্ন হইয়া তদপেক্ষা আর একটি সৎকার্য্য সাধনে যত্নবান্ হয়। তাহাতেও যদি উৎসাহিত হয়, তাহা হইলে অপর একটি সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে এটি সেটি করিয়া সৎকার্য্য সংসাধিত ফলের উপযুক্ত উৎসাহ লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং উৎসাহ-কেই যশোবৃদ্ধির মূল বলা অসঙ্গত নহে। এবং এই দুয়ের সমষ্টিকে দেশের উন্নতি বৃদ্ধির যথার্থ কারণ বলিয়া অনুধাবন করা আমাদের বিবেচনায় অযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

যে দেশকে উন্নতিশালী সভ্যদেশ বলিয়া জান; যদি সেই দেশে কিরূপে তাদৃশ উন্নতি ও সভ্যতা প্রবেশ করিল, তাহার অনুসন্ধান কর; তাহা হইলে দেখিবে যশঃ ও উৎসাহই তাহার মুখ্য কারণ। যে দেশের মানবগণ যশঃপ্রার্থী হইয়া নানাবিধ সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং সকলে তাঁহা-

দিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকে; সেই দেশ সভ্যতা-সোপানে আরূঢ় হয়। যদি বল, একজন যশের জন্য যে সকল কার্য্য করিবে, অপর ব্যক্তির তাহাকে উৎসাহ দিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কাহার গুণ গান করিয়া উৎসাহ দান করে না। বিবেচনা কর, এক ব্যক্তি একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিলেন। তুমি সেই পুস্তক হইতে তোমার অজ্ঞাত বিষয় কতকটা অবগত হইলে, সুতরাং অবশ্যই তুমি সেই উপকার প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে প্রশংসা ও উৎসাহ দান করিবে। —সেইরূপ তোমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তি তাহা হইতে নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া গ্রন্থকারের যশোঘোষণাপূর্ব্বক উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা ক্রমশঃ প্রাপ্তযশাঃ হইয়া অপরাপর পুস্তক প্রণয়ন করিতে থাকিবেন। তাহা হইলে দেশের কতকটা উন্নতি সাধিত হইবে। এই রূপ অন্যবিধ বিষয়েও ভিন্নরুচির লোক যশঃপ্রার্থী হইয়া নানা প্রকার কার্য্য করেন এবং ভিন্নরুচি বিশিষ্ট জন সাধারণ সেই সকল কার্য্য হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা যে দেশ ও সমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে দেখা যাইতেছে যশঃ ও তদানুষঙ্গিক উৎসাহই দেশোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। এই দুইটি অমূল্য রত্ন না থাকিলে বোধ করি, আজি পর্য্যন্ত সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানিত না। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তদীয় বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টির উত্তর কালে সভ্যতা ও উন্নতি বৃদ্ধির মৌলিক উপায় স্বরূপ এই রত্নদ্বয় পূর্ব্বেই মানব-হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

চিন্তাশীলতা।

এই রূপ বিষয়ে এখন আন্দোলন করা অনেক উপকারক। এই জন্য এবম্বিধ প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশোপরি আত্ম-গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? জর্ম্মণি যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহার হেতু কি? সর্ব্বদেশীয় লোকে যে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করে, ইহারই বা কারণ কি? কেবল জীবিকাসংস্থানই কি ইহার হেতুভূত বলিয়া নির্ণীত হইবে? কখনই নয়। নির্জীবপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত, ইংরেজী ভাষায় যথার্থ-সুশিক্ষিত ব্যক্তির কি কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর কোন যথার্থদর্শী বিজ্ঞ জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? তিনি বলিবেন, পার্থিব উন্নতি, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিই অগ্রণী বলিয়া গণনীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। যদিও প্রস্তাবলেখক ভাষাবিৎ নন, তথাপি অভিজ্ঞতাদ্বারা এরূপ বলা যাইতে পারে, পৃথিবীর মধ্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড জর্ম্মনি ও আমেরিকা যে উৎকৃষ্ট পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি জ্ঞানচক্ষু নিক্ষেপ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তত্তদ্দেশে এরূপ মহামনা চিন্তাশীল ব্যক্তি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রাগ্‌বর্ণিত দেশ সকল শ্রেষ্ঠতার চরম সীমায় নীত হইয়াছে। অন্য কোন দেশের লোকে তদ্রূপ চিত্তোন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদবীতে আরূঢ় রহিয়াছেন। ভাষা, দেশীয় উন্নতি অন্যের আদর্শস্থানীয় হইবার একমাত্র কারণ কি? কেবল চিন্তাশীলতা। যে আধারে চিন্তাশীলতা চিরবিরাজ করে, সে আধার জগতে সকলের প্রভু হইয়া গরিমা প্রকাশ করে। আমরা সুমিষ্ট শব্দ—প্রাঞ্জল সাহিত্য-গাথাদ্বারা মনের অনেক আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছি। তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বর-মাধুরীতে অনেকবার হৃদয়-তন্ত্রী নর্ত্তিত করিয়াছি। সুকবিগণের সদ্ভাব প্রবাহে দেশকে ভাসাইয়া দিয়াছি, আমোদের দাস হইয়া জীবনকে ঘৃণ্য করিয়াছি, কিন্তু এই সকল কার্য্যদ্বারা জড় জগতের বা মনোজগতের কি মহোপকার সাধিত হইয়াছে? কিছুই নয়; বরং কোন কোন বিষয়ের অত্যধিক আসক্তিতে বংশ-পরাম্পরা, ক্রমে চিরকালের জন্য ঘোর অবনতির হস্তে পতিত হইয়াছে। কবে উদ্ধার পাইবে, তাহার আশাও মনোমধ্যে করিবার শক্তি নাই।

ধন্য ইউরোপ ভূমি! তুমি সময়ে সময়ে যে সকল চিন্তাশীল কৃতী সন্তান প্রসব কর, তদ্দ্বারাই তোমার মহামূল্য কুক্ষির অতি-

বর্ণনা করিলেও চাটুবাদের অপবাদগ্রস্ত হইতে হয় না। তোমার পুণ্যগর্ভপ্রসূত সন্তানগণ, অনেক বিষয়ে (শিল্প, বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন) দ্বিতীয় জগৎ সৃজন করিয়াছে বলিলে কোন দোষ স্পর্শে না। নির্জ্জীব দেশ সকল তোমারই সন্তানগণের বিশুদ্ধজ্ঞানে অনেক অংশে উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং অনাগতকালে আরও যে কত উন্নতি লক্ষিত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন দিন নাই, এমন সপ্তাহ নাই, যাহাতে দেখিতে না পাওয়া যায়, অদ্য অমুক জ্যোতির্ব্বিৎ অমুক গ্রহ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, অদ্য অমুক রাসায়নিক গূঢ় তত্ত্ব গবেষিত হইয়াছে; আর অন্য দেশীয় লোক, মুখপ্রত্যাশী হইয়া কেবল সেই পরোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া সগর্ব্বে পাদক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু তাহাদিগের এমত বিবেচনা নাই যে, আমরা কি করিতেছি, কেনই বা সৃষ্ট হইয়াছি। অস্মদ্বিধ লোকদিগের দ্বারা পার্থিব উন্নতি অণুমাত্র হইবেক কি না, এ সকল চিন্তা, তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। দেশের উন্নতির জন্য যে কয়েকটী ইংরেজী বা ইউরোপীয় রীতি, নীতি, শিক্ষা করিয়াছি, তাহা স্বদেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগিনী কি না, সে চিন্তা করে কে? আমাদিগের কোন ক্ষমতা নাই, ইহার প্রমাণ আমরা ও আমাদিগের কার্য্যজাত।

চিন্তাশক্তি না থাকিলে মনুষ্য কখনই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। চিন্তাশক্তি ইহ লোককে সুখময় স্বর্গলোক করিয়া তুলে। চিন্তাশক্তিশূন্য জ্ঞানী সংখ্যায় অধিক বর্দ্ধিত হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক প্রকার উন্নতির চিহ্ন মাত্র দেখিতেছি, নব নব প্রস্তাবের দ্বারা কত প্রকার সম্বাদপত্রের স্তম্ভ পরিপূরিত হইতেছে, কিন্তু একটুকু তলস্পর্শী হইয়া দেখিলে বোধ হইবে, উক্তরূপ প্রস্তাব কোন দেশীয় মহাত্মার মস্তিষ্কনিঃসৃত নহে, উহা প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি মাত্র, কিম্বা পিষ্টপেষণ অথবা চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। কি দুঃখের বিষয়! কি পরিতাপের বিষয়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে এপর্য্যন্ত কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তাশীলতার আভাস মাত্রও পাওয়া যায় নাই। কেবল অনুচিকীর্ষা।

অনুকরণে দেশ উৎসন্ন যাইবার জন্য প্রায় প্রস্তুত। আমি আহার, ব্যবহারবিষয়ে অনুকরণ-জনিত অনিষ্টকে তাদৃশ অনিষ্ট বলি নাই, কিন্তু চিন্তাশীলতার অসদ্ভাবে আমরা একান্ত উপহসিত হইতেছি, অনুকরণ বৃত্তি দ্বারা আমরা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছি। অন্যে তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতেছে; ইংলণ্ড হইতে কোশা, কুশী প্রস্তুত হইয়া আসিতে চলিল, কিন্তু এদিকে বঙ্গ দেশ, সাহেব হইয়া বসিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক্‌গণ ঢাকাই আদি সমস্ত বস্ত্রের অনুকরণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, এদিকে আমরা

পত্নীকে, বিবি করিবার জন্য ব্যস্ত !!! বৃদ্ধ ম্যাল্থস্ পৃথিবীর জন্য বার্ত্তা-শাস্ত্রের চিন্তায় মস্তিষ্কশূন্য হইয়া গেলেন, আমরা পরকীয় অনিষ্টকর অনুকরণে অসার, নির্জ্জীব জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেছি।

দেশের বাণিজ্য স্রোত অন্যভাবে পরিচালিত হইয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতেছে, মনুষ্যসংখ্যা ম্লান করিতেছে, কিন্তু আমরা সে বিষয়ে অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া কালযাপন করিতেছি। যিনি বিশেষ চিন্তাশীল, তিনি এ সকল দেখিয়া বিরলে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভাসাইতেছেন, অপর দেশের অশেষ উন্নতি হইয়াছে, স্থির করিয়া সানন্দ পদক্ষেপ করিতেছেন, অধ্যাপক ফসেট্, মহাত্মা ষ্টুয়ার্ট্‌মিল্, বার্ত্তা শাস্ত্রের অশেষ উন্নতি করিয়া নব যুগের আবির্ভাব করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা চিন্তাশক্তির পরিচয় কি দিব, বরং যাহাতে দেশভাষা তিরোহিত হইয়া পুরস্ত্রীবর্গমধ্যে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীজনদিগের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বার্ত্তা হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছি। বঙ্গকার্য্য, বঙ্গগ্রন্থাবলী, অহরহঃ প্রকাশিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র এ পর্য্যন্ত যত গুলি বঙ্গীয় পুস্তক প্রসব করিয়াছে, তন্মধ্যে এমন একখানি পুস্তক কি বাহির হইয়াছে, যাহাতে চিন্তাশক্তির অণুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়? যে চিন্তার বলে ব্যোমযান, বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় যন্ত্র, মাধ্যাকর্ষণ, পূর্ব্ববৎ সাধন, শরবৎ সাধন, হিতবাদ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে, তাদৃশ চিন্তাশীল ব্যক্তি কয় জন ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? এখন আমরা কেবল কবিবর কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস, বাল্মীকি, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতিকে লইয়া সংবাদপত্র রূপ বঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছি মাত্র।

বহু পূর্ব্বে রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য যে চিন্তাশক্তি বিমিশ্রিত রাজনীতিজ্ঞতায়, রসায়ন বিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অধুনা কয় জন তাঁহার তুল্য রাজনীতিজ্ঞ হইয়াছেন? কেবল রাজনীতি কেন, অর্থ শাস্ত্র বিষয়েই বা কয়জন সুনাম প্রকাশিত করিয়াছেন? আত্ম পরিবার পোষণের চিন্তায় যাঁহাদিগের লালায়িত ভাব পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাঁহারা কি চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন? না, তাঁহাদিগের সে প্রকার চিন্তা করিবার অবসর আছে?

পূর্ব্বকালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আমরা সাংসারিক অবস্থাসম্বন্ধে কত বিপন্ন হইতেছি। পূর্ব্বে একজন ঢাকানিবাসী তন্তুবায়, কত স্বচ্ছন্দে স্বাবলম্বিত ব্যবসার দ্বারা দিনপাত করিত, এখন, তাদৃশ ব্যক্তি হয়ত অন্নাভাবে স্বীয় যন্ত্র বিক্রয় করিয়াও উদরজ্বালা নিরাকরণে সমর্থ হইতেছে না। আমরা উন্নীত হইতেছি কি প্রতারিত হইতেছি, তাহা যদি দেশের চিন্তাশক্তি সম্পন্ন জনগণ ভাবিতেন, তবে দুর্দ্দশা এত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না।

চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সকল ভাবিলে অবগত হইবেন যে, দেশের কি প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ফণী যেরূপ মোহ-

মন্ত্র সম্বলিত ধূলি প্রক্ষেপে বিচেতন হইয়া থাকে, আমরাও তদ্রূপ হইয়াছি মাত্র। চিন্তাশীলতা ভিন্ন পার্থিব উন্নতি অবনতির নির্ণয় কে করে? যাহা হউক কোন বিষয়ে চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রদান করাও অনেক অংশে উপকারক সন্দেহ নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মবিষয়ে তদানীন্তন সময়ে চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবিনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, অধুনা সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা উক্ত ধর্ম্ম বিভিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে, তবে কি উক্ত সম্প্রদায়কর্ত্তা নিজ চিন্তাশক্তির বলে এরূপ করিয়াছেন? কখনই নয়। ধর্ম্মবিষয়ে তিনিও ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকদিগের কিয়দংশ মত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ধর্ম্মবিষয়ে কিছুমাত্র বলিতে চাহি না, এ জন্য নীরব হইলাম। ফলতঃ চিন্তাশীল না হইলে জড় জগতের উন্নতি কখনই সম্ভবেনা। কি রূপে দেশের অর্থ নিযোজিত হইলে সাধারণের মঙ্গলবর্দ্ধন হইবে, কি রূপে অকৃষ্ট ভূমি সকল হলতলে আনীত হইলে কৃষিজীবীদিগের অন্ন সংস্থান নিরাপদ্ হইবেক, কি রূপে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যে দেশের শিল্পীদিগের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ হইবেক, এই সকল কঠিন তত্ত্ব, বার্ত্তাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কার্য্যে পরিণত করা চিন্তাশীলতার একমাত্র পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কেনই বা দেশে পরোপজীবী দাসের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, দাসত্ববৃত্তি ভিন্ন কেনই বা লোকের সংসার অচল হইতেছে, এই সকল বিষয় চিন্তা করা ও চিন্তা করিয়া তদুপায় নির্দ্দেশ করা যত দূর কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না, নতুবা কেবল দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া, অনুকরণ করিয়া সম্বাদ পত্রের স্তম্ভ পূরণ করিলে দেশের অণুমাত্র উপকার করা যায় না। আমাদিগের স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন এত ন্যূন যে আমরা নিজের বিষয় কতক ভাবিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি, কিন্তু সাধারণের গৃহস্বরূপ সমস্ত ভারতের সর্ব্ব বিষয়ের চিন্তা করা আমাদিগের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, ইহা লিখিবার বা বলিবার আবশ্যক-বিরহ। রাজনীতিবিষয়েও আমরা অনেক পশ্চাৎপদ আছি, প্রধান প্রধান স্থানে রাজনৈতিক সভা হওয়া আবশ্যক, কারণ এতদ্দ্বারা অভিলষিত সিদ্ধির অনেক অনুকূলতা লাভ করা যাইতে পারে, রাজনীতির সহিত বার্ত্তাশাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ, পরস্পর এত দূর হিতসাপেক্ষ যে, একের অবনতিতে অন্যের সম্পূর্ণ হানি হইতে পারে। আমরা ধর্ম্মভীরু মিশনরিদিগের প্রলয়ের চিন্তার মত চিন্তা করিতে কাহাকেও অনুরোধ করি নাই। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ চিন্তা করিয়া, অধুনা আমাদিগের দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি অবনত হইতেছে কি উন্নত হইতেছে, এই চিন্তা করাই বিশেষ কর্ত্তব্য, নতুবা এ সকল বিষয় পরে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া দিবেক, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

মনশ্চিত্র।

আত্ম-জিজ্ঞাসা।

জগতে চিন্তাবিহীন মানব নিতান্ত দুর্লভ; সকলেরই কোন না কোন বিষয়িণী চিন্তা আছেই আছে; সে চিন্তা কি? কিসের চিন্তা? সকলেরই কি একরূপ চিন্তা? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। চিন্তা দুই প্রকার; একটীর নাম শরীর-শোষিণী; অপরটীর নাম শরীরপোষিণী; ইহার কোনটী না কোনটী নিয়তই মানব-হৃদয়ে বিচরণ করিতেছে। ইহার আয়ত্তি হইতে কোন হৃদয়ই দূরস্থিত নহে। যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তাহার মূলে চিন্তা; চিন্তাই সমস্ত কার্য্যের সাধিকা। সৎকার্য্য বল, অসৎকার্য্য বল; সমস্তই চিন্তার উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে। যে চিন্তা দ্বারা শরীর শুকাইয়া যায়, যাহার দ্বারা মন নিস্তেজ হয়, যাহাকে পণ্ডিতেরা চিতার সহিত উপমা দিয়া থাকেন, যাহাকে (Anxiety বা care) বলে, তাহাকে শরীরশোষিণী নামে আখ্যাত করা অসঙ্গত হইতেছে না; আর যাহার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সোপান রচিত হয়, যাহার দ্বারা মনের প্রফুল্লতা সাধিত হয়, যাহা দ্বারা উদ্ভাবিনী শক্তি নবীভূত হইয়া উঠে, যাহাকে (Meditation বা reflection) বলে, তাহাকে শরীরপোষিণী বলা অযুক্ত নহে। ইহার প্রকৃতি একরূপ হইলেও বিষয় বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া ভীষণ ও প্রশান্ত আকার ধারণ করিয়া থাকে। আমি অদ্য শরীরশোষিণী চিন্তার বিষয় আলোচনা করিব।

চিন্তার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় আছে; যখন তখন, মনে করিলেই, চিন্তা করিতে পারা যায় না। নির্জ্জনে হৃদয় গৃহীতাবসর হইলে চিন্তা অবলম্বনীয় ও চিন্তনীয় বিষয়টী লইয়া উপস্থিত হয়; তখন সে বালিকার ন্যায় কর্দ্দমপিণ্ডের সহিত ক্ষণভঙ্গুর অভিলাষানুরূপ কিম্বা গোধূলিকালীন আকাশ-হৃদয়ে শোভমানা কাদম্বিনীর সহিত সান্ধ্য-সমীরণের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকে। একদা আমি মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া, ডাবাহস্ত ও খট্টোপরি অর্দ্ধ শয়ান হইয়া, নলসংযোগে তাম্রকূট পান করিতেছি; ধূমরাশি বদন-বিবর হইতে নবোদ্ভিন্ন তাল শস্যের ন্যায় উদ্গীরিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইতেছে; একটী গুরুতর বিষয় চিন্তা করিব করিব মনে করিতেছি, কিন্তু ডাক্তা পিতার কনিষ্ঠ সহোদরকে তারস্বরে আহ্বান করিয়া আমার সমস্ত কল্পনা গোল-মাল করিয়া দিতেছে; বারম্বার অতিশয় বিরক্ত হইয়া উহা পরিত্যাগ করিব মনে করিতেছি, কিন্তু স্বাদ ভুলিতে পারিতেছি না; এমন সময়ে একটী চাপরাশ-বক্ষ মফস্বল হুজুর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, সঙ্গে একটী লোক, পরে জানিলাম তিনি

মহাজন। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আমার সম্মুখে একটী নথি ফেলিয়া দিল, আমি প্রথম উদ্‌ঘাটনে দেখিলাম, উহা ভারতবিজয়িনী, মুদ্রাঙ্কিত, অভ্যন্তরে দৃষ্টি চালনা করিয়া দেখিলাম, কিছু দিন হইল আমি একটী মিথ্যা ঋণলেখ্যের অভিযোগে পরাজিত হইয়া কতকগুলি টাকার দায়িক হইয়াছি, ইহা তাহারই বিজ্ঞাপন।

মনের আবেগে অনুষঙ্গী মহাজনের প্রতি কিছু নরম গরম প্রয়োগ করিলাম, তিনি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর না দিয়া আমার প্রদত্ত টাকাগুলি এক দুই করিয়া গুণিয়া লইলেন; এবং মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। মনের বড় উদ্বেগ জন্মিল, সে দিন আর নিদ্রা হইল না। পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, বসুন্ধরে! এরূপ পাপীর ভার আর কত কাল সহ্য করিবে? উঃ কি শঠতা! কি ভয়ানক প্রতারণা জাল! ধর্ম্ম স্বয়ং এই জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ নহেন, বিচারকেরা কি করিবেন? তাহাদের চক্ষুত প্রমাণরূপ পরিবীক্ষণ সুমণ্ডিত; আবার এই ব্যবধানে ব্যবহারী জীবগণ নিজ নিজ অবলম্বিত বিষয়টী বচন-পটুতায় সুশোভিত করিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এইরূপে দৃশ্যের গুণ প্রস্তরের গুণের সহিত একত্র সমাগত হইয়া মণি ও কাঞ্চনসংযোগের ন্যায় বিলক্ষণ সুসঙ্গত ও সুদর্শনীয় হইয়া উঠে। ভাল, এ সকল অন্যায়াচরণ নিবারণের কি উপায় নাই, অথবা হইতে পারে না? অথবা আমার এ অনধিকার চর্চ্চায় প্রয়োজন কি? আমিত আইনকর্ত্তা নহি—অথবা আমার বিধি কে শুনিবে? হয়ত এইরূপ অন্যায়াচরণে অন্যের সুখ আছে; যাহাদ্বারা অন্যে সুখ পায়, তাহাতে আমার বিরুদ্ধ ভাবনা কেন? তবে আমি ক্লেশ পাইলাম—মর্ম্ম-পীড়া পাইলাম; যদি নিজে পীড়িত হইয়া অন্যকে সুখী করা ধর্ম্ম হয়, তবেত আমি সুমহান্ ধর্ম্মাত্মা; পণ্ডিতেরা নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াও পরের উপকার করিতে বলিয়াছেন, জীবন ত্যাগ দূরে থাকুক, আমি সামান্য ক্লেশিত হইয়াও কি পরের উপকার সাধন করিতে পারি না? যদি বল, ইহাতে তাহার উপকার কি,—আর্থিক সহায়তা,—এ সাহায্যে প্রয়োজন কি,—সাংসারিক অনাটন,—অনাটন কেন,—একান্নবর্ত্তী পরিবার অনেক,—সকলেই ত শ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারে,—ভারতীয় লোকের স্বাবলম্বন কোথায়?—সকলেরই জীবনের উপাদান চাকুরী,—আজ কাল তাহা আবার মহার্ঘ,—সকলেরত জুটিয়া উঠা কঠিন,—যাহারা উচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত তাহাদেরও ঘটিয়া উঠিতেছে না,—সুতরাং পৈতৃক-বিভব-বিহীন একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যগত নিষ্কর্ম্মা লোকের কাজ কি?

জাগতিক সুনিয়ম ব্যবস্থিত করিয়া নিজে সুখী হওয়া বড় কঠিন। সেরূপ আশা করাও বৃথা; তবে নিজে সকল কার্য্য হইতে

পৃথক্ থাকাই কর্ত্তব্য; আমি যেন থাকিলাম, আমার বাসনাও তাই, কিন্তু অন্যে ছাড়িবে কেন? তরুশাখা হইতে ফল কি স্বেচ্ছায় ভূপতিত হইয়া থাকে? তবে কি লোকসংসর্গ ত্যাগ করাই সহজ উপায়? তবে আর বাঁচিয়া ফল কি? তবে কি মৃত্যুই সকল সুখের নিদান? মরণ কি জগতের মঙ্গলজনক? তবে একবার জীবন মৃত্যুর তুলনা করিয়া দেখা যাউক। মরণটা কি?—মহানিদ্রা—যাহার আদি অন্ত কিছুই নাই, যাহার জাগরণ নাই, যে অবস্থায় কাহারও আহ্বান কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের চেতনাদি কিছুমাত্র অনুভূত হয় না—সেই মহানিদ্রা লাভের নাম মৃত্যু—যদিও ইহা সুপ্ত্যুত্থানধর্ম্মক নিদ্রার সহিত তুলনীয় নহে, তথাচ উপমার কিয়দংশে সাদৃশ্য লাভ করিলে উপমেয়ের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম সকলের কিছু না কিছু অবশ্যই উপলব্ধি হইতে পারে। আমরা যখন নিদ্রা যাই, সাংসারিক যাতনাদি কিছুই আমাদের মনে থাকে না, সাংঘাতিক আহত ব্যক্তিও দৈহিক যাতনা ভুলিয়া যায়, ফলতঃ আমরা নিদ্রার ক্রোড়স্থ হইলে আর কোন সুখেরই অভাব থাকে না। তবে আর এতদপেক্ষা সুবিধাজনক কি আছে? কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন বস্তুই নির্ব্বিঘ্ন নহে; তিনি মানবের এই একমাত্র সুখের সামগ্রীটীতেও স্বপ্নরূপ বিষম ব্যাঘাত প্রদান করিয়াছেন, কেহ স্বপ্ন দেখিব এরূপ বলিতে পারেন না, দেখিব না এরূপ কথাও অগ্রাহ্য, কবে দেখিব তাহারও নিশ্চয়তা নাই; হয়ত স্বপ্নে এরূপ দেখিতে পারি যে আমরা সুগন্ধি সকুসুম নন্দনকাননে বিচরণ করিয়া মন্দাকিনীর শীকরবাহী সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতেছি; অপ্সরাগণ তানলয়বিশুদ্ধ সংগীত সুধায় কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে; হয়ত কোথায় একেশ্বর চক্রবর্ত্তী হইয়া শিরোদেশে রাজ-মুকুট ধারণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়াছি, অনুচরগণ নিয়ত আজ্ঞাবহ থাকিয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে; আবার হয়ত কোন দিন ভীষণ অরণ্যানীমধ্যগত হইয়া সিংহকর্ত্তৃক ভীত হইতেছি, হয়ত জলমগ্ন হইয়া অবলম্বন আশয়ে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছি, ইত্যাদি ভয়ানক স্বপ্নে আমরা কতদূর ব্যাকুল হই, নিদ্রোত্থিত হইয়া কিরূপ কাতর্য্য প্রদর্শন করি; তাহা মানব মাত্রের কাহার না বিদিত আছে? যদি এই নিদ্রায় উত্থান না থাকিত, যদি স্বপ্নকে অমূলক বলিয়া কাহারো বিদিত না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর শোচনীয় অবস্থার সীমা থাকিত না।

যখন এই সুপ্ত্যুত্থানধর্ম্মক নিদ্রা এরূপ বিঘ্ন সঙ্কুল; তখন না জানি জাগরণ রহিত মহানিদ্রাতে কত ব্যাঘাতই নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তার এই বাধাই কি মরণের বাধা? এই জন্যে কি ভূমণ্ডলে আত্মহত্যা লঘু কৃতা? হয়ত উপস্থিত বিপদ্ হইতে কোন ভয়ানক নূতন বিপদেই বা আপন্ন হইতে

হইবেক, এই অসাধারণ ভীতিই কি মরণের অন্তরায়? পণ্ডিতেরা ইহার নিশ্চয়াবধারণে অসমর্থ হইয়াই কি আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? নতুবা সাংসারিক মনস্তাপ সহ্য করা কি সহজ ব্যাপার? সকলের হস্তেই ত আত্মহত্যার সহজোপাদান প্রতিনিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেইত নিজ নিজ প্রাণনাশ করিয়া সকল-প্রকার মনোবেদনা হইতে অব্যাহতি পাইত? কিন্তু তাহা কয় জনে করিয়া থাকে? তবে আমি মরিব কেন? বাঁচিয়া থাকিয়া বিপদের সম্মুখীন হইব, তাহার গতি মুখে অবিচল বাধা নিক্ষেপ করিব, সাধ্যানুসারে তাহার গতি ফিরাইয়া দিব, তথাপিও মরিব না, মরিতে ইচ্ছাও করিব না, আমি কি কাপুরুষ?

বিরহিণী।

দেখ সখি! দেখ ফিরে,
আলোকে আকাশ পূরে,
পুনরায় রবি বুঝি হইল উদয়;
অথবা সম্ভব কিসে?
সরসীর তীরে বসে
দেখিয়াছি দিনেশের শেষ অভিনয়।

২

ভারত রমণীগণ,——
থাক পর পরশন,
পতি বিনা পরে পাছে হয় দৃষ্টিদান;
বিধি তারি তুলাতুলে
রাখে কমলিনীকুলে,——
তা সবে দেখিছি তাই ঢাকিতে বয়ান।

দেখিছি গোধূলিধনী——
পতি-প্রেম-সোহাগিনী——
সীমন্তে সিঁদূর ফোঁটা করেছে ধারণ।
হেরিয়াছি সন্ধ্যা সতী——
বিলাসে বিভোর মতি——
আলুথালু হইয়াছে গায়ের বসন।

৪

তবে বুঝি শীতকর——
কুমুদীর মনোহর——
অই দেখ, অই সই! হতেছে বিকাশ!
তাই বা কেমনে বলি,
স্বরূপ অনলস্থলী,
চাঁদে কি সম্ভব হেন অনল বিভাস!

৫

তবে বুঝি দাবানল
প্রকাশিছে নিজ বল,
করিতে দহন এই নিখিল ভুবন!
তা কিসে প্রত্যয় করি,
নিরাশ্রয় শূন্যোপরি
কেমনে কানন রবে, কোথা বা দহন!

৬

বুঝেছি অশনি ঘোর
পড়িবে মাথায় মোর,
কি কাজ বিলম্বে তবে? পেতেছি ত শির।
অথবা আমার ভ্রম;
আকাশ অমলতম;
তাহাতে সম্ভব কভু স্থিতি অশনির!

৭

ও সই! ও সব নয়,
এই বুঝি সুনিশ্চয়,
পান্থ কুলকামিনীর জীবন পবন
করিতে অশন হায়!
সাপিনী যামিনী যায়,
তাহারি মাথার মণি উজলে ভীষণ!

৮

নতুবা আমার কেন
নিশ্বাস প্রখর হেন!
বিকল জীবন সই! করে আই ঢাই!
যাক প্রাণ দেশে দেশে,
প্রাণনাথ-সমুদ্দেশে,
বিরহে অনলে দেহ পুড়ে হবে ছাই!
সখি রে! প্রণয়ে বুঝি সুখলেশ নাই!

শ্রীগঃ।

কিসে সুখ?

এ পৃথিবীতে সুখের জন্য সকলেই লালায়িত। কি করিলে সুখী হইব, কোথায় যাইলে সুখ পাইব, তাহার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলেন, আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট হও, যাহা পাইয়াছ,তাহা হইতে অধিক পাইতে আশা করিও না, তাহা হইলেই সুখী হইবে। প্রথমতঃ এই কথাটী শুনিলেই যথার্থ ও সত্য উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস জন্মে—লোকের সহিত কলহ করিব না, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিব না, আপনার অবস্থাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মানিব ইহা অপেক্ষা সুখের আকর আর কি হইতে পারে? ধার্ম্মিকেরা এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে ঘোর যুদ্ধ করুন না কেন, তথাপি আমরা ইহাতে বিশ্বাস করিব না। ইহাতে বিশ্বাস করিলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।

মনে কর, এইটীকে সত্য উপদেশ ও যথার্থ সুখের আকর বলিয়া গ্রাহ্য করিলাম। পৃথিবীতে সকলেই সুখের প্রত্যাশী। সুতরাং

সকলেই এই পথ অবলম্বন করিল। সকলেই আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট। কেহ কাহারও অনিষ্ট আশা করিল না। কেহ কাহাকে ধনে মানে বুদ্ধি বিদ্যাতে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিল না। তাহা হইলে কি ফল ফলিল? উন্নতির দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইল; সমাজের মঙ্গলে বজ্রাঘাত পড়িল। আমরা এক্ষণে যে সুখ ভোগ করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে যাহা ভোগ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে ছাই পড়িল, আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। এই কি সুখ?

অনেকে বলিবেন, মান ধন কিছুই নহে, তাহার জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন কি? ড্রাইদেন (Dryden) বলিবেন,—

> "War * * is toil and trouble,
> Honor but an empty bubble"
>
> ALEXANDER'S FEAST.

সেক্ষপিয়রও এইরূপ কথা বলিবেন * কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটাইব।

দ্বিতীয়তঃ মনে কর, সকলেই এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া, কতকগুলি ব্যক্তি আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া সুখের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশিষ্টেরা অন্য পথ অবলম্বন করিল। যাহারা অন্য পথ অবলম্বন করিল, তাহারা যদি কোন উন্নতি লাভ করিয়া উঠিল, বা দেশের কোন মঙ্গল সাধন করিল, তাহা হইলে যাহারা আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট—তাহারা পূর্ব্বোক্তদিগকে উৎসাহ না দিয়া বরং হিংসা করিয়া থাকে। কেহ তাহাদিগকে উন্নতি পথে উত্তেজিত করিতে আসিলে তাহাদিগের কথায় অগ্রাহ্য করিয়া বরং এইরূপ উত্তর দিয়া থাকে, "আমাদিগের কপালে থাকে আপনি আসিবে, আমরা চেষ্টা করিব না, আমরা আপন অবস্থাতেই সুখী।" এ কথা কাহারে সাজে? যিনি অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করেন তাহারেই সাজে। সুতরাং তাঁহারা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিতে থাকেন। এবং অদৃষ্টবাদের বিষময় ফল নাস্তিকতা। ইহাও সর্ব্বনাশের মূল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আমরা সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মিলের বচন ইহাতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,——

"Where there exists a desire for advantages not possessed, the mind which does not potentially possess them by means of its own energies, is apt to look with hatred and malice on there who do. The person bestirring himself with hopeful prospects to improve his circumstances, is the one who feels good will towards others engaged in, or who have succeded in, the same pursuit. And where the majority are so en-

* First Part of Henry III. Act V. Scene. 1.

gaged, those who do not attain the object have had the tone given to their feelings by the general habit of the country, and ascribe their failure, to want of effort or opportunity, or to their personal ill luck. But those who, which desiring into striving for it, are either incessantly grumbling that fortune does not do for them what they do not attempt to do for themselves, or overflowing with envy and ill-will towards those who possess what they would like to have.

In proportion as success in life is seen or believed to be the fruit of fatality or accident and not of exertion, in that same ratio does envy *develope itself* as a point of national character.

* * * *

The contented man, or the contended family, who have no ambition to make any one else happier, to promote the good of their country or their neighbourhood, or to improve themselves in moral excellence, excite in us neither admiration nor approval."

Mill's Representative Government.

তৃতীয়তঃ, এক অবস্থায় কখন সুখ হইতে পারে না। অবস্থান্তরই তবে সুখের মূল বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ধনী, তাহাকে সুখী বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দরিদ্র হইতে সহসা ধনবান্ হয়, তাহাকেই আমরা সুখভোগী বলিয়া থাকি। নীরোগীর কিসে সুখ? কিন্তু পীড়িত আরোগ্য লাভ করিলে তাহার সুখ বটে। যাহারা আপন অবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে চিরকালই এক অবস্থাতেই থাকিতে হয়, সুতরাং তাহাদিগের সুখ কোথায়? আমাদিগের এ রূপ অর্থ নহে, যে, দুঃখ ভোগ না করিলে সুখ ভোগ করিতে পারা যায় না। সুখ দুই প্রকার, সদ্ভাবজনিত (Positive) ও অভাবজনিত (Negative) আমরা এখানে যে সুখের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা অভাবজনিত সুখ (Negative Pleasure) কিন্তু তথাপি সুখ বটে।

আমরা এক্ষণে এই সপ্রমাণ করিলাম, যে, যাহারা আত্ম অবস্থায় সন্তুষ্ট তাহারা সুখী নহে।

তবে সুখী কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমরা এই বলিব, যে, যাহারা অস্থির অর্থাৎ আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, তাহারাই সুখী। ইহাদিগের নিকট হইতে আমরা যতদূর দেশোন্নতি সমাজোন্নতি আশা করিতে পারি, এমন আর কাহারও নিকট নহে। অনেকে হয়ত এই কথা বলিবেন, যে সন্তোষ না

থাকিলে সুখ হইতে পারে না, সুতরাং যাহারা আত্মাবস্থায় সন্তুষ্ট নহে তাহারা কি রূপে সুখী? তদুত্তরে আমরা এই বলি, যে, যখন আমরা আমাদিগের অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া কোনরূপ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে বাসনা করি, তখন আমাদিগকে দৃঢ় আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এবং তাহার পর যদি অভীষ্ট লাভ করিতে পারি, সেই আমাদিগের সুখ। এবং এই আয়াসের সহিত সুখেরও পরিমাণ হইবে। আয়াস অধিক হইলে সুখও অধিক হইবে। যদিও এই সুখ অল্পস্থায়ী, কারণ একটী অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই মনুষ্য অন্য অভীষ্টের সাধন জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে। তথাপি এই সুখের সহিত অন্য কোন সুখের তুলনা করিতে পারি না। মেলব্রাঞ্চ (Malbranch) যথার্থ বলিয়াছেন, যে আমি "সত্যতা কে" (truth) যদি ধরিতে পারি, তাহা হইলে আমি উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার ধরিতে চেষ্টা করিব। সুতরাং যাহারা আত্ম অবস্থায় সন্তুষ্ট তাহারা সুখী নহে। তবে সুখী কে? যাহারা অস্থির, * তাহারাই সুখী; অস্থিরতাতেই আমাদিগের সুখ।

শ্রীমঃ

* এখানে 'অস্থির' শব্দে যিনি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট নন, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে।

অশনি পতন।

হিমালয়াচল উত্তর হইতে,
ভয়ঙ্কর মেঘজাল আচম্বিতে
উঠিল গগনে; বায়ু সন্তাড়নে
উড়িয়া আসিল ভারত-পানে।
নভোপরে মেঘ রহিলেক ঝুলি,
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলী;
চমকে হৃদয়! আশঙ্কা উদয়
ভারি হয়, যেই দেখে নয়নে!

দেখিতে দেখিতে ভারত উপরে
আসিল সে মেঘ সমীরণ ভরে;
গভীর গর্জ্জন শুনে অচেতন
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি উঠে!
মুহূর্ত্তেক পরে মূষল ধারায়
পড়িতে লাগিল (সহা নাহি যায়!)
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিচল,
লোমে লোমে আসি সে ধারা ফুটে!

৩

মেঘের গর্জ্জনে কাঁপিল ভারত !
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত !
যেন রে প্রলয় ! হেন বোধ হয়,
একি সর্ব্বনাশ ঘটিল, হায় !
ভারতের সুখ-প্রদীপ নিভিল,
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল !
দেখ রে নয়নে ;—বৃষ্টি বরিষণে
ভারতের দেহ ভাসিয়া যায় !

৪

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল !
ভারতবাসীর সকলি টুটিল !
দৈবের বিপাকে, ভারতমাতাকে
এত দুঃখরাশি সহিতে হ'ল !
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল !

৫

কিন্তু, ঐ দেখ, কনকমন্দিরে,
ভারতের ক্রোড়-রত্ন-বেদিপরে
অযুত কিরণে, মনি বিভূষণে
স্বাধীনতা দেবী বিরাজে ঐ।
উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাসে,
কোটি সূর্য্য-বিভা মুকুটে বিকাসে,
চির জ্যোতির্ম্ময় উৎসাহ, অভয়
নয়নযুগলে ; তুলনা কৈ ?

৬

চারিধারে ঐ প্রিয় ভক্তগণ
বেড়িয়া দেবীরে করে আরাধন ;
বীর-অহঙ্কার ঢাল, তরবার
বীর ভক্তগণ-কটিতে ঝুলে।
অরিপরিকর ঐ তরবারে
গিয়াছে চলিয়া শমন আগারে ;
ঐ তরবার শোণিতের ধার
মাখি শোভে যেন জবার ফুলে।

৭

বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,
শ্বেত রক্ত নীল শতদলচারে
দেবীর চরণ করিছে পূজন,
"জয় দেবি জয় !" বলিছে সবে,
"দেখো গো জননি, তোমার প্রসাদে
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?

৮

"পশু পক্ষী কীট—তারাও তোমার
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর ;
নর হয়ে তবে, ও পদ-বিভবে
কি হেতু আমরা ছাড়িয়া দিব ?
ও পদ স্বেচ্ছায় তেয়াগে যে জন,
তার ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ !
কাপুরুষ তারে কয় ত্রিসংসারে,
তার মত কি মা আমরা হব ?

৯

" দেবতা-দুর্লভ চরণ তোমার,
আর্য্যভূমিবাসী আর্য্যকুল-সার,
পূজিলে ও পদ বিদূর বিপদ,
সম্পদ্ আসিয়া কপালে যুটে;
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,
শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে,
ও পদ স্মরণে মানব-জীবনে
সুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে।"

১০

" সুপবিত্র নাম তোমার যখন,
'জয় স্বাধীনতে!' বলি উচ্চারণ
করি গো জননি, সানন্দে অমনি
শিরায় শিরায় শোণিত চলে।
এই তরবার লইয়া তখন,
সমুৎসাহে ছুটি করিবারে রণ;
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি,
কাটিবারে পারি ও পদ-বলে।

১১

" তাই মা, নিবেদি তোমার চরণে,
বঞ্চিত করোনা ভক্ত আর্য্যগণে;
বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,
ও নামে তোমার কলঙ্ক হবে।
দেখো গো জননি, তোমার প্রসাদে,
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে,
ও পদ যুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে তবে?"

১২

এই মন্ত্র পড়ি. বীর ভক্তকুল
পূজিয়া দেবীরে দিয়া পদ্মফুল,
সকলে তখন, মুদিল নয়ন
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান;
বাহ্য-বোধ-শূন্য হইয়া সকলে
ভাবিছে দেবীর চরণযুগলে;
কিন্তু বহির্দেশে সর্ব্বনাশী বেশে
উঠিয়াছে মেঘ নাহিকো জ্ঞান!

১৩

বারি বর্ষে মেঘ গরজি গভীর,
মুহুর্মুহুঃ তাহে কাঁপিছে মন্দির;
জলদের দাপে রত্নবেদি কাঁপে;
কাঁপিলেন দেবী বিষণ্ণ মুখে!
(কে জানে—কি হবে—বুঝি না কারণ;)
ঊর্দ্ধে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,
চম্পক অঙ্গুলি দেখাইলা তুলি
কি যেন কাহারে অতীব দুখে!

১৪

বোধ হ'ল, যেন ভারত ভূমিরে
আর্য্যগণ সহ শোক-সিন্ধু-নীরে
ডুবাবেন, হায়, হেন অভিপ্রায়,
ভারতের বুঝি ঘুচিল সুখ!
একেতো বাহিরে বিষম ব্যাপার!
ভীষণ বিপদে পূর্ণ চারিধার!
মন্দির মাঝার দেবীও আবার
ভারতের প্রতি বুঝি বিমুখ!

১৫

কিন্তু ভারতের হৃদয় উজ্জ্বল,
স্বাধীনতা-ভক্ত বীরেন্দ্র সকল
এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,
　　কেবল মগন ধ্যান-সরসে।
হায়, আর্য্যদের বুঝি সুখ-তরু
শুখাইল! বুঝি হ'ল আজি মরু
সোণার ভারত! নহিলে এমত
　　অলক্ষণ কেন আর্য্য-আবাসে?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়,
তড়িত চকিল দহি দিকচয়;
অমনি তখনি, করি ঘোর ধ্বনি,
　　হইল মন্দিরে অশনি-পাত!
সুবর্ণ দেউল হ'ল চূরমার!
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারিধার;
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ
　　হইল তা সহ ভূতলসাৎ!

১৭

হায়, সেই বজ্র-অনল সহিত,
বীর ভক্ত আর্য্যগণ-প্রপূজিত
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,
　　ভারতেরে ছাড়ি গেলেন উবে!
সোণার ভারত (কহিতে বিদরে
হৃদয়! নয়নে জলধারা ঝরে!)
সেইক্ষণ হ'তে, অধীনতা-স্রোতে,
　　ঐ দেখ, ঐ রয়েছে ডুবে!

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল!
ভারতবাসীর সকলি টুটিল!
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে
　　এত দুখরাশি সহিতে হ'ল!
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের? কুভাগ্যের ফের,
　　ভারতের সুখ গেল রে গেল!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

একটী উপমা।

১

আঁধার গগন, আঁধার ভুবন!
　প্রকৃতির ছবি ধূসরবরণা!
বরিষার জলে সকলি মগন!
　উঁচু নীচু আর না হয় গণনা!

২

ধরণীর সাজ যেন নববধূ——
　গভীর মূরতি ঘেরা ঘোমটায়,
ভেটিতে বরষা সুরসিক বঁধু——
　ডগমগ ধনী যৌবন ভরায়।

৩

নবীনা তটিনী তরল্ চরণে,
যৌবন গরবে ফুলায়ে হৃদয়,
স্মরি প্রেমগাথা কল কল স্বনে,
চলিছে পুলকে সাগর নিলয়
লয়ে এই ছবি স্বভাব মোহন!
করিনু তুলনা মানব জীবনে——
নহে কেশ দূর মিলিল এমন!
তবে কেন মাটী ছোঁয়েনা চরণে।

শ্রীগ.

নটজাতির বিবরণ।

নট বলিলে এক্ষণে অনেক সম্প্রদায়কে বুঝায়। সাধারণতঃ নটশব্দে নর্ত্তক বা অভিনেতৃ। বোধ হয়, এই জাতি তাহাদিগের ব্যবসা ও কার্য্যানুসারে নটশব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসানকে ইঁহারা অদ্যাবধি ও দেবতা বলিয়া পুজা করিয়া থাকেন; এবং বাদ্যে ও সঙ্গীতে ইহারা বিশেষ নিপুণ, এমন কি, অদ্যাপিও নৃত্য ইঁহাদিগের কামিনীগণের বিশেষ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া গণনীয়।

ইহারা জাতিতে না হিন্দু, না মুসলমান। সন্তান জন্মিলে মুসলমান-কর্ত্তৃক মন্ত্রোচ্চারিত হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নামকরণ হইবে। ইহাদিগের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস অতি চমৎকার। এতৎ-সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন বিশেষ পুস্তক নাই, কেবল সুকবি কবিরের কবিতাগ্রন্থের মাঝে মাঝে তাহাদিগের ধর্ম্মের সার মর্ম্ম পাওয়া যায়। এই কবির হইতেই কবির-পন্থি সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব। সুপ্রসিদ্ধ ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডসন সাহেব বলেন, ইঁনি একজন বস্ত্রব্যবসায়ী তন্তুবায় ছিলেন। সেরসার সময়ই ইহার জীবিতকাল। কিন্তু একথা কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারে না। কবির-পন্থি সম্প্রদায় অতিশয় আধুনিক; এবং এই নটজাতির দেবতাগণ অধিকাংশই আকবর বাদসাহের রাজত্বকালিক বিখ্যাত জীবিত ব্যক্তি। তানসানই তাহার অন্যতর প্রমাণ। ইহাতে বোধ হইতেছে যে আকবরের সময়েই এই নটজাতির প্রাদুর্ভাব হয়। এবং যেহেতু কবির এই নটজাতির ধর্ম্মপ্রণালী বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে, যে, ইঁনিও এই জাতিভুক্ত ছিলেন। সুতরাং কবিরের জীবনকাল বাদসাহ আকবরের সময় স্থির করা যাইতে পারে। এতদ্ধর্ম্ম-সম্বন্ধায় যে একটী কবিতা ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডসন্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে *, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।——

* Asiatic. R. vol. VII. p. 460—465

যদিও শরীর কালে নষ্ট হইবে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। আশা ইহাকে স্বর্গের দিকে পথ দেখাইয়া দেয়।

নৃত্য ইহাদিগের কামিনীদিগের একটী কৌলিক ব্রত। বালিকারা সপ্তম ও অষ্টম-বর্ষীয়া হইলেই নৃত্য গীত শিখিতে আরম্ভ করে। কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্কা হইলেই ইহারা স্বাধীন হইল; স্বেচ্ছায় বিবাহ করিতে পারে; তখন তাহারা আর কোন ব্রতাধীন নহে।

এই নটজাতি আপনাদিগের ইতিহাস যেরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাও উক্ত মহোদয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে; এবং তাহারই সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

তাহারা বলিয়া থাকে, প্রায় দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সা, সমুল্লা, ঘুঙ্কু, ও মুল্লা নামে চারি ভ্রাতা গাজীপুর ও এলাহাবাদ-নামক স্থানে বাস করিতেন। ক্রমে তাঁহারা বিভিন্ন হইয়া পড়েন, সা পূর্ব্বে, সমুল্লা পশ্চিমে, ঘুঙ্কু উত্তরে এবং মুল্লা দক্ষিণে। সা পূর্ব্বগামী হইয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, এবং সেখানে শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ পাইয়া কিয়ৎকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এবং ইহারই বংশ হইতেই নট-জাতির উৎপত্তি।

এতজ্জাতির অধিকাংশই পশ্বাহারে অনুরাগী। মৃত কুক্কুর শৃগালাদিও নিষ্কৃতি পায় না।

ইহাদিগের বিবাহ-পদ্ধতি অতিশয় কৌতুকাবহ। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা যখন পুত্র এবং কন্যার বিবাহে স্বীকৃত হইলেন, তখন বর বিবাহ করিতে চলিলেন; কিন্তু কন্যার বাটীতে প্রবেশের অনুমতি নাই, তাহার কোন আত্মীয় দ্বার রক্ষা করিতে থাকেন। বর বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হয়েন, কিন্তু বাহুযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধিত হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করেন, এবং আপনার ভাগ্যকে গালি দিয়া হা হুতাশ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে কন্যা-কর্ত্তা আসিয়া ভাবি জামাতাকে আশ্বাসদানে কন্যা সম্প্রদান করেন।

ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডসন্ সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের অনেকাংশে বিশেষতঃ উত্তরে ইহারা কন্‌জুরো নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং কন্‌ষ্ট্যান্টনোপলে এইরূপ আর একজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের নাম কিন্‌জারি। ইহারা কি একজাতি, না একসূত্রে সম্বদ্ধ দুই জাতি? ইহার সত্যাসত্যতা আমরা জানি না।

শশাঙ্কে কলঙ্ক।

১

শশাঙ্কে কলঙ্ক বিধি কেন বল রাখিলে ?
সকলি করিয়া ভাল
শেষে এ কলঙ্ক কাল
দিয়া তায় মিছামিছি দোষভাগী হইলে,
শশাঙ্কে কলঙ্ক বিধি কেন বল রাখিলে ?

২

অই যে শশাঙ্ক শোভে গগনের গায় রে
হাসি হাসি চলে যায়
তোমার মহিমা গায়
বিমল আনন্দে মরি ভুবনে ভাসায় রে

৩

সুখের শশাঙ্কে হেন তাই তবে বল না
কি লাগি হইল রোষ
তাই যে রাখিলে দোষ
গঠন পূরণ আহা ! তাই তার হ'ল না,

৪

ইন্দুর বদন কান্তি উপমায় ললনা
লইয়া গরব করে
স্বামীর সোহাগ ভরে
মরি মরি আহা মরি করিতেছে ছলনা।

৫

তবে রে কি আর ভবে সুখ আছে বল না ?
তাই ত জিজ্ঞাসি বিধি
কি হেতু এ হেন নিধি
নাহি হ'ল ভুবনের পূর্ণ সুখ ঝরণা !

৬

যে চাঁদ কিরণ শীধু যুবকে ক্ষেপায় রে
নিশাকালে তরুতলে
তরণীতে সিন্ধুজলে
শিখরী সঙ্কট স্থলে আশায় নে যায় রে।

৭

প্রেয়সীর কণ্ঠ বেড়ি মুখসুধা খায় রে ;
প্রণয় প্রতিমা হাসে
হাসি তার আশে পাশে
যেন বা স্বরগ বাসে কিবা সুখ তায় রে ?

৮

সে চাঁদে কেন হে দেব অবিচার হইল ?
সাগর ছেঁচিয়া যায়
দেবতা নিকরে পায়
যতনের ধনে মরি অযতন রহিল !

৯

ভুবনের তবু ইন্দু অপর ত হবে না
যদি হয় হাসি তার
হেরিলেই একবার
পলাবে বিরাগ ভাব কখন ত রবে না ;

১০

শশাঙ্কে কলঙ্ক বিধি কেন বল রাখিলে ?
সকলি করিয়া ভাল
শেষে এ কলঙ্ক কাল
দিয়া তায় মিছামিছি দোষ-ভাগী হইলে
শশাঙ্কে কলঙ্ক বিধি কেন বল রাখিলে ?

শ্রীভূঃ—

তেজঃ।

১ম পর্ব্বের ৩৬৪ পৃষ্ঠার পর।

নিস্রবণ সময়ে বস্তুর ঘনত্ব পরিবর্ত্ত। আমরা দেখিতে পাই এক ভাঁড় জমাট ঘৃত বা নারিকেল তৈল তাপে গলিয়া যাইলে, উচ্ছলিত হইতে থাকে। এই রূপে উচ্ছলিত হইতে হইতে শেষে ঐ ভাণ্ডটীতে যত তরল ধরিতে পারে, তরলীভূত স্নেহ দ্রব্য সেই পরিমাণে উহাতে থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে জমাট স্নেহদ্রব্যপূর্ণ ভাণ্ডটী ওজনে যত হইত, এখন দ্রবীভূত স্নেহপূর্ণ হওয়াতে ওজন অপেক্ষাকৃত কম হইবে; অর্থাৎ উচ্ছলিত হইয়া যত টুকু পড়িয়া গিয়াছে, তত টুকু স্নেহের ওজন কম পড়িবে। ইহা দেখিয়া সম্ভবতঃ বোধ হয় যে বস্তু সকল গলিবার সময়ে ঘনত্ব হ্রাস হইয়া প্রসৃত হয়, সুতরাং নিরেট বস্তু অপেক্ষা সমান মাপ তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম; কিন্তু কতক গুলি বস্তু গলিবার সময় আকুঞ্চিত হয়। বরফ ইহার উদাহরণ। সমানায়তন বরফ ও জলকে পৃথক্ পৃথক্ ওজন করিলে, দৃষ্ট হইবে যে, বরফ অপেক্ষা জল ভারি। ফরাসিস্ পণ্ডিত ব্রনার সাহেব পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে সেণ্টিগ্রেড্ তাপমানের শূন্য অংশে (০°) বরফের আপেক্ষিক ঘনত্ব ০·৯১৮০০ মাত্র; কিন্তু উক্ত তাপমানের ৪ অংশে (৪°) জলের আপেক্ষিক ঘনত্ব (১) এক অঙ্ক।

জল বরফ হইবার সময়, অধিক শক্তি উৎপাদন করে। ঢালাই লৌহ, বিস্মথ্ ও রসাঞ্জন এই শ্রেণীভুক্ত। অপরতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ, অস্থিসার (ফস্ফরস্) ও অন্যান্য দ্রব্য নিরেট হইবার সময় আকুঞ্চিত হয়; এ জন্য প্রথমোক্ত তিন ধাতুকে ছাঁচে ঢালিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হয় না, তাহাদের উপর ছাব বসাইতে হয়।

নিস্রবণে অতীন্দ্রিয় তেজ। যদি ফারেনহাইট্ ৩২° তাপবিশিষ্ট এক খণ্ড বরফে তেজ প্রবেশ করাণ যায়, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ জলত্ব প্রাপ্ত হয় না; বরফের এতাদৃশ অবস্থান্তর ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে ৩২° তাপবিশিষ্ট উক্ত বরফখণ্ডে অধিক পরিমাণে তেজ প্রবেশ না করিলে, আর উহা ·২° তাপবিশিষ্ট জলে পরিণত হয় না। এবম্বিধ তেজকে অতীন্দ্রিয় তেজ বলিবার মর্ম্ম এই, পূর্ব্বে যে তেজ বরফে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা উহা দ্বারা শোষিত থাকে, অথচ তাপমানকে উত্থিত করে না।

সকল পদার্থই নিরেট অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় যাইলে তেজ শোষিত রাখে। কি রূপে এই শোষিত তেজের পরিমাণ করিতে হয়, পরে দেখান যাইবে। এডিনবরানিবাসী ডাক্তার ব্ল্যাক অতীন্দ্রিয় তেজ বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম উপদেশ দেন। জলে যে তেজ শোষিত থাকে, তাহা অত্যধিক;

এবং জলে এই এই অধিক পরিমিত অতীন্দ্রিয় তেজ থাকে বলিয়াই, বরফ নিস্রবণে এত বিলম্ব হয়। যদি বরফ অথবা তুষার স্বল্প তেজ সংযোগেই হঠাৎ জলাকারে পরিণত হইত, তাহা হইলে উপত্যকাবাসীরা সপদি ভয়ানক জলপ্লাবনে কত মহাবিপদে পড়িত। কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টির কুত্রাপি ক্রুটি থাকিতে পারে না। তাঁহার অচিন্ত্য দয়াগুণে তাহারা শুদ্ধ মাত্র এই আকস্মিক মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছে এমত নহে; কিন্তু তুষারের এতদ্রূপ মৃদু দ্রুতিতে তাহারা অবিরত জল সম্পোষ্য ভোগ করিতেছে। উচ্চ পর্ব্বতনিঃসৃত নদী সকল মস্তকস্থিত তুষার হইতে নিরন্তর জলধারা প্রাপ্ত হইয়া কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। নিস্রবণাঙ্কে বায়ুভার। অধ্যাপক জেম্‌স্ টম্‌সন্ ঔপপত্তিক রূপে প্রকাশ করেন যে,যে বস্তু জমিয়া গেলে প্রসৃত হয়, তাহা যে তাপে পুর্ব্বে গলিয়া যাইত; বায়ুভারাধীন হইলে সেই বস্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপে গলিবে; এবং যে বস্তু গলিয়া গেলে আকুঞ্চিত হয়, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ তাপে গলিবে। এই সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রবন্ধের অন্যাংশে বর্ণিত হইবেক। এ স্থলে এই মাত্র উল্লেখ করিব যে অধ্যাপক জেম্‌স্ টম্‌সনের ভ্রাতা উইলিয়ম্ টম্‌সন্ ক্রিয়া সিদ্ধ রূপে উক্ত মতের যাথার্থ্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করেন যে, জল, যাহা জমিয়া গেলে প্রসৃত হয়, ১৬·৮ বায়ুভারাধীন হইলে তাহার বরফাঙ্ক ফারেন্‌হাইট্ ০°২৩২ ন্যূন হয়। সেণ্টিগ্রেড্ ০° অংশে জল বরফ হয়। মৌসন সাহেব সেই জলের উপরে ১৩০০০ বায়ুভার চাপাইয়া দেখিয়াছেন যে উহা—১৮° সেণ্টিগ্রেড্ তাপে বরফ হইয়াছে।

খাদ ও দ্রব্যসঙ্কর। সঙ্কীর্ণ অবয়বীর নিস্রবণাঙ্ক তাহার প্রত্যেক অবয়বের নিস্রবণাঙ্ক অপেক্ষা অনেক নিম্ন। কাস্তীর (টিন) ও সীসক, প্রত্যেকে ফারেন্ হাইট্ ৪৫১°ও৬২০° তাপে গলিয়া যায়; আর, ৫ ভাগ কাস্তীর ও ১ ভাগ সীসক মিশ্রণে যে খাদ উৎপন্ন হয়, তাহা ফারেন্ হাইট্ ৩৮২° তাপে গলে। রোজ সাহেবের নিস্রবণীয় ধাতু অর্থাৎ ৪ ভাগ বিস্‌মথ্, ১ ভাগ সীসক ও ১ ভাগ কাস্তীর ফারেন্ হাইট্ ২০২° তাপে গলে; এই তাপ স্ফুটিত জলের তাপ অপেক্ষা ১০ অংশ নিম্ন। ধাতুতে পাইন দিবার সময় খাদ বিস্তর ব্যবহৃত হয়।

এইরূপ, বিবিধ লবণ পৃথক্ পৃথক্ গলিতে যত তাপ আবশ্যক করে, মিশ্রিত হইলে তাহারা তাহা অপেক্ষা ন্যূন তাপে গলে; যত তাপে পোতাস—সাগরগন্ধ (ক্লোরাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্), খাদ্য লবণ=সোডা=সাগরগন্ধ (ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্) গলিতে দেখা যায়, উভয়কে একত্র জ্বাল দিলে, তাহারা তাহা অপেক্ষা কম তাপে গলিয়া থাকে। সোডাঙ্গারাম্ল (কার্ব্বনেট্ অব্ সোডিয়ম্) ও পোতাসাঙ্গারাম্ল (কার্ব্বনেট্ অব্

পোটাসিয়ম্) মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলেও ঐরূপ হয়; এবং কোন কোন খনিতে বিসমাহার করিতে হইলে, এই দুই দ্রব্য তাহাদের নিস্রবণাঙ্কের হ্রাসতা সম্পাদনার্থ ব্যবহৃত হয়।

তরল মিশ্রণ। নিরেট অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় নীত হইলে যে সকল দ্রব্যের সন্নিপাতের পরিবর্ত্ত হয়। কিয়ৎপরিমাণ জলে কোন লাবণিক দ্রব্য ততক্ষণ মিশ্রিত কর, যতক্ষণ ঐ জল পূর্ণসিক্ত হইয়া আর অধিক লবণ ধারণ করিতে না পারে এবং ঐ লবণের দানা জলের নিম্নে পতিত থাকে। যাবৎ তাপ সমান থাকিবে তাবৎ ঐ সকল দানার আকৃতিগত কোন পরিবর্ত্ত হইবে না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই সকল দানার অনেক গুলি গলিয়া গিয়া তরলীভূত হয়।

বরফ মিশ্রণ। বক্ষ্যমাণ মিশ্রণগুলিকে বরফ মিশ্রণ কহিলাম; কারণ তাহারা মিশ্রিত তরলের তেজ সমাহরণ করিয়া, তাহাকে বরফে পরিণত করে। যদি কোন কঠিন পদার্থ দ্রুত দ্রব হইতে থাকে এবং ঐ দ্রবীভাব জন্য বাহ্যিক অতিরিক্ত তেজ না পায়, তাহা হইলে উহা চতুর্দ্দিক্‌স্থ পদার্থের তেজ সমাহরণ করিয়া আপনাকে তরল অবস্থায় রাখে। এক চাপ বরফ যদি অগ্নি বা অন্য কোন তেজ সাহায্য ব্যতিরেকে আপনা হইতে গলিতে থাকে, তবে উহা চতুর্দ্দিক্‌স্থ বায়ুর তাপ সমাহরণ করিয়া দ্রব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বাবধি সেখানে একটী তাপমান স্থাপিত থাকিলে, দৃষ্ট হইবেক যে, বরফ গলিতে আরম্ভ হইলেই, তাপমানের পারদ পড়িতে থাকে। তদ্রূপ, কোন লাবণিক পদার্থ, যথা সোডা—গন্ধক দ্রাবক (সল্‌ফেট্ অব্ সোডা), যবক্ষার প্রভৃতি, জলসংযুক্ত হইলে, উহা জলের তেজ সমাহরণ করিয়া তরল ভাবাপন্ন হয়; সুতরাং জল শীতল হইয়া আইসে। তাহা হইলেই, অমুক পদার্থ জলে দ্রব হয় বলিলে এই বুঝায় যে, জল নিজ তেজ বিতরণ করিয়া উহাকে দ্রব রাখে। নিস্রবণে যেমন কতক পরিমাণ তেজ অতীন্দ্রিয় থাকে, তরল মিশ্রণেও তদ্রূপ। তরল মিশ্রণের এই ধর্ম্মকে আমরা কখন কখন কাজে লাগাই; এবং প্রবল শৈত্য উৎপাদন জন্য এই মিশ্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকি। দুইটী নিরেট পদার্থ কিংবা অন্ততঃ একটী তরল ও একটী নিরেট পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিলে, যদি নিরেট না হইয়া একটী তরল অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শৈত্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কি প্রকারে শৈত্যের উৎপত্তি হয় এক প্রকার বলা গেল। এক্ষণে শৈত্যোৎপাদক প্রধান প্রধান বরফ মিশ্রণগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। এগুলি জানা থাকিলে কখন না কখন আমাদের উপকারে আসিবে।

দ্রব্য	ভাগ
সোডা—গন্ধক দ্রাবক (সল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা) লবণদ্রাবক	৮ ৫
চূর্ণ বরফ অথবা চূর্ণ তুষার খাদ্য লবণ	২ ১
সোডা—গন্ধক দ্রাবক (জলমিশ্র) যবক্ষার দ্রাবক	৩ ২
সোডা—গন্ধক দ্রাবক নৈশাদল—যবক্ষার দ্রাবক (নাইট্রেট্‌ অব্‌ এমোনিয়া) (জলমিশ্র) যবক্ষার দ্রাবক	৬ ৫ ৪
সোডা—অস্থিসারাম্ল (ফস্ফেট্‌ অব্‌ সোডা) (জলমিশ্র) যবক্ষার দ্রাবক	৯ ৪

বিরস হইবে বলিয়া তাপমানের পতন অঙ্ক নির্দ্দেশ করা গেল না।

এই সকল মিশ্রণকে দ্রব অবস্থায় রাখিবার জন্য তরল নিজ তেজ প্রদান করিতে থাকে এবং আপনি শীতল হয়। এই রূপে যখন ক্রমাগত নিজ তেজ বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে, কাজেই উহা পরিশেষে তরলাবস্থা হইতে নিরেট অবস্থায় নীত হইয়া বরফের আকার ধারণ করে।

সংঘাতত্ব অর্থাৎ তরলাবস্থা হইতে নিরেট অবস্থায় গমন। তরলাবস্থা হইতে নিরেট অবস্থায় গমনকালে সকল দ্রব্যের সন্নিপাতের পরিবর্ত্ত হয় না।

যে নিয়মে নিস্রবণ হইয়া থাকে, সংহতত্বও সেই নিয়মে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ১। প্রত্যেক তরল একটী নির্দ্দিষ্ট তাপ বিশিষ্ট হইলে সংহত হইতে থাকে।

২। নিরেট অবস্থা প্রাপ্তি আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত তরলের তাপ অপরিবর্ত্ত্য থাকে।

যদি কোন তরলকে ধীরে ধীরে শীতল হইতে দেওয়া যায়, ইহা প্রায়ই দানা বিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; আবার অনেক স্থলে হয়ও না। দানাবিশিষ্ট আকার প্রাপ্তি বস্তু সকলের নৈসর্গিক অবস্থা; তাহাদের রেণু সকল তদুপযোগি স্থানে পড়িতে প্রচুর সময় পাইলেই ঐ মূর্ত্তি হইয়া থাকে; এমন কি বস্তু সকল নিরেট হইলেও তাহাদের অণু সকল দানাবিশিষ্টতায় পরিণত হইতে থাকে। কাঁসা ও রৌপ্য পুনঃ পুনঃ তপ্ত ও শীতল করিলে ভঙ্গুর হয় এবং দানাবিশিষ্ট আকার ধারণ করে। এতদ্রূপ কামান সতত দাগা হইলে, উহা পরিশেষে উক্তবিধ পরিবর্ত্ত প্রযুক্ত ফাটিয়া যায়। রেলওয়ে চক্রের লৌহ অক্ষ সকল পুনঃ পুনঃ আন্দোলন প্রযুক্ত তন্তু ও কাঠিন্য হীন হইয়া, ভঙ্গুর ও দানাবিশিষ্ট হয়। চিনি গলাইয়া যে মিছ্‌রী দানা প্রস্তুত হয়; তরল গুড়ের নীচে যে বালি পড়ে তাহাও এই নিয়মে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, বস্তু সকল যে তাপাঙ্কে জমিয়া যায়, কোন উপায়ে সেই

তাপাঙ্কের হ্রস্বতাপাদন করা যাইতে পারে কি না। বায়ুভার নিস্রবণাঙ্কের যেমন হ্রস্বতা সম্পাদন করিয়া থাকে বরফাঙ্কেরও তদ্রূপ করে। আবার, শীতপ্রধান দেশে রাত্রিতে এক বাটী জল রাখিলে, প্রাতঃকালে তাহা অধিক শীতল হইয়া থাকে; ঐ শীতল জলে একটুক্‌রা বরফ নিক্ষেপ করিলে কয়েক পলক মধ্যেই জলের তরলভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্ত হয়।

জলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন সমস্ত তরলের তাপকে উন্নত রাখে। ইহার কারণ এই যে, জলে যে পরিমাণ তেজ থাকে, বরফে তাহা অপেক্ষা অনেক কম; সুতরাং বরফবিযুক্ত তেজ-কর্ত্তৃক সমস্ত তরলের তাপ উন্নমিত থাকে।

তরলকে দ্রুত সংক্ষুভিত করিলে বরফ উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে; অথবা অন্য কোন কারণে তরলের অণু সমূহের আন্দোলন হইলেও, বরফোৎপত্তি হইতে পারে না। কৈশিকাকর্ষণেও এরূপ কার্য্য দৃষ্ট হয়। ডেপ্রেজ সাহেব দেখিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম কৈশিকচ্ছিদ্র নলের জলের তাপ—২০°সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত অবনত করা যাইতে পারে, অথচ ঐ জলের দ্রবত্বের হানি হয় না। বৃক্ষ সকলের কৈশিকচ্ছিদ্রস্থ জল যে প্রায়ই জমিয়া যায় না, ইহা তাহার এক কারণ।

জলের অধিক পরিমাণ অতীন্দ্রিয় তেজ ধারণ ক্ষমতা ও বরফের জল অপেক্ষা ভার লঘুত্ব সংসার নিয়মে অনেক উপকারী। একটী জলাশয়ের উদাহরণ লইলেই এবিষয় আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। শীতপ্রধান দেশে জলাশয়ের জলের উপরিভাগ শৈত্যাধিক্যে জমিয়া যায়। যখন জলের উপরিস্থ স্তর অধিক শীতল হয়, তখন ইহা গাঢ় এবং ভারি হইয়াও ডুবিয়া জলাশয়ের তলায় আইসে এবং অধঃস্থ উষ্ণতর লঘুস্তর উপরে উঠে; এবং যে পর্য্যন্ত না জল চূড়ান্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফারেনহাইট ৩৯ অংশ তাপ বিশিষ্ট হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। জল ঐ তাপ প্রাপ্ত হইলে উক্ত প্রক্রিয়া স্থগিত হয়। তখন উপরিস্থ নূতন স্তর আর অতিরিক্ত শৈত্য পাইলে নিমগ্ন হইবে না; কারণ ৩৯° অপেক্ষা জল হ্রস্বতাপ বিশিষ্ট হইলে অপেক্ষাকৃত লঘু হয়।

এইরূপে যখন জলাশয়ের উপরিস্থ জল ফারেন্‌হাইট্ ৩২° তাপবিশিষ্ট হইয়া আইসে, তখন ইহা জমিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। জল কিছু একেবারেই জমিয়া যায় না; কিন্তু ধীরে ধীরে জমিতে থাকে; কারণ অনেক তেজ বিয়োগ না হইলে. জল বরফে পরিণত হইতে পারে না।

পুনশ্চ, যখন একবার বরফ স্তর উৎপন্ন হয়, ইহা আর নিমগ্ন হয় না; উপরে ভাসিতে থাকে। আবার শৈত্যাধিক্যে প্রথম স্তরের নিম্নস্থ জল জমিয়া গিয়া দ্বিতীয় স্তর উৎপন্ন করে; এই রূপে তৃতীয় ও অন্যান্য স্তর উৎপন্ন হয়। পরে যখন পর পর স্তর ভেদ করিয়া আর শৈত্যের প্রবলতা থাকে না, তখন নিম্নস্থ জল জলই

থাকে, ইহার তাপ ৩৯° ফারেন্ হাইট। জলজন্তুগণ এই তাপাংশ জলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে; তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয় না।

ভাসমান বরফ স্তর সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া এরূপ দৃঢ় হয় যে, লোক সকল নিরাপদে উপর দিয়া গমনাগমন করে। শীতপ্রধান দেশের বালকেরা এই বরফশিলার উপর ক্রীড়া করিতে অধিক ভাল বাসে।

ক্রমশঃ——

অযোধ্যায় নল।

১

নভ পশ্চিমাধে পড়েছে ঢলিয়া
সবিতা, পদ্মিনী-প্রণয়ে গলিয়া;
আকাশ হইতে সরসে পড়িয়া,
পদ্মিনীর পাশে মধুরসরে
প্রণয়-বারতা কহিছে পবন;—
উল্লাসে পুরিছে পদ্মিনীর মন;—
হতেছে তাহাতে শরীর কম্পন;—
মৃদুল কাঁপায়ে মৃণাল থরে!

২

পদ্মিনীর সুখে সরোবরজল
অসীম উল্লাসে করে ঢল ঢল;
স্নেহময়ী মার অন্তর কোমল
সুখী এই রূপ সুতার সুখে!
দেখি প্রভাকরে আকাশের গায়,
বৃহন্নলারণে কুরুসেনা প্রায়,
মেঘরাশি যত আকাশে ছড়ায়,
মোহেতে যে যার ঢাকিয়া মুখে!

৩

সরোবর ধারে প্রশস্ত প্রান্তর;
মাঝে মাঝে তার পাদপ সুন্দর
আদরে সহিছে লতিকার ভর;
এমনি প্রেমের অসীম বল!
যোড়ে যোড়ে যোড়ে বিহঙ্গম কত
বিহঙ্গিনী সহ শির করি নত,
বৃক্ষ ডালে ডালে ফিরে অবিরত,
ছড়ায়ে অম্বরে প্রেমজ কল!

৪

প্রান্তরের মাঝে ডাকে বা কোথায়
হাম্বারবে গাভী বন্ধন দশায়,
শরীর ঢালিয়া হরিত ধরায়,
রবিকরতাপে তাপিত হয়ে;
গাভীপাশে কোথা রয়েছে শুইয়া,
যোগীন্দ্রমন্দির স্কন্ধেতে ধরিয়া,
লেহনে গাভীর তুণ্ড কণ্ডূয়িয়া,
থামি থামি, বৃষ (গাভীর ভয়ে)।

৫

প্রান্তর অদূরে, গিরিবর প্রায়,
তালবৃক্ষচয়ে জিনি উচ্চতায়,
অট্টালিকা এক অতুল শোভায়
ত্রিদিবশিল্পীর অন্তর মোহে ;
লৌহদণ্ড এক প্রাসাদ উপরে
উঠেছে, ভেদিয়া সুদূর অম্বরে ;
তাহে কেতু এক উড়ে বায়ু-ভরে,
রঞ্জিত হইয়া যেমন লোহে !

৬

যেন বায়ুজায়া, ধরি বায়ুকর,
ভ্রমণ করিছে প্রাসাদ উপর,
উড়ায়ে আকাশে অঞ্চল সুন্দর,
পতির অন্তর করিয়া চুরি।
রক্তপদ্মপরে ভ্রমরের প্রায়,
কৃষ্ণাক্ষরে লেখা পতাকার গায়—
গোটা গোটা লেখা—বেস পড়া যায়—
" ভবে পুণ্যধাম, অযোধ্যাপুরী "

৭

পুরাকালে এই প্রাসাদ ভিতর,
ইন্দুমতী সহ অজ নরবর
ছিলেন প্রেমেতে বদ্ধ কলেবর,
লক্ষ্মীনারায়ণ সমান হায় !
এই সে প্রাসাদ ;—ইহাতে বসিয়া,
রাজা দশরথ প্রেমান্ধ হইয়া,
বক্ষ হতে ছুটি রত্ন উৎপাটিয়া,
নিক্ষেপিলা ঘোর অরণ্যে তায় !

৮

অলোক সামান্য রূপরাশি ধরে,
সীতা কমলিনী, এ প্রাসাদ পরে,
রামের হৃদয়ে—প্রেম সরোবরে—
ঢল ঢল ঢল ভাসিয়াছিল !
রাজা ঋতুপর্ণ ইহাতে এখন
দেখেন কতই প্রেমের স্বপন ;
দেখিলে এ হেন প্রেম নিকেতন,
থাকে না কাহারো বিষাদ তিল।

৯

বুঝি প্রেম এই রাজ্যের ঈশ্বর !
তাই প্রেমময় প্রাসাদ, প্রান্তর,—
প্রেমে থই থই করে সরোবর,—
প্রেম স্রোতে তাই অম্বর ভাসে !
সরোবর তীরে অই দেখা যায়,—
অই উচ্চ তালতরুর তলায়,—
পৃষ্ঠঠেস দিয়া পাদপের গায়,
দাঁড়াইয়া যুবা মলিন বাসে।

১০

পরিধান মাত্র অর্দ্ধেক বসন ;
নাহি উত্তরীয়, দেহ আবরণ ;
ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিছে কেমন,
তাতেই কেবল শরীর নড়ে ;
পুত্তলিকা ভ্রম নতুবা হইত ;—
অনিমেষ আঁখি, কর বক্ষে স্থিত,
আপাদ মস্তক কালিমা-লাঞ্ছিত,
পরাণ যেমন নাহিক ধড়ে !

১১

এই রূপে যুবা আছে দাঁড়াইয়া ;
হেন কালে তথা পুষ্প বিস্তারিয়া,
নাচিতে লাগিল ময়ুর আসিয়া,
কোথা হতে এক ময়ুরী সনে।
ভূমে বক্ষ রাখি ময়ুরী তখন,
শ্যাম ধরাতলে করিল শয়ন ;—
ময়ুর তাহার গ্রীবাকণ্ডূয়ন
করিতে লাগিল আনন্দ মনে !

১২

কোথা হতে আসি এ সুখ সময়ে,
পড়ে তীক্ষ্ণশর ময়ুরী-হৃদয়ে ;
প্রভাতে যেমন ভানুর উদয়ে
হলো মেঘাচ্ছন্ন অম্বর দেশ !
ভয়েতে ময়ূর আকাশে উঠিল ;—
দেখিতে দেখিতে কোথা পলাইল ;—
ময়ূরী ভূতলে লুঠাতে লাগিল ;—
বিষাদে ছাড়িল নিশ্বাস শেষ !

১৩

যথা স্বর্ণখণ্ড (বিদগ্ধ অনলে)
পেয়ে সোহাগায়, একবারে গলে,
তেমনি (বিদগ্ধ বিচ্ছেদ অনলে)
যুবার অন্তর, এ দৃশ্য হেরি,
ঢল ঢলে হয়ে গলিয়া পড়িল,—
মস্তক যুবার ঘুরিতে লাগিল,—
প্রাসাদ, প্রান্তর, সরস সলিল,
ঘুরে যেন সব, যুবারে ঘেরি !

১৪

ধীরে ধীরে যুবা বসিয়া পড়িল ;
বৃক্ষ পদতলে লুঠাতে লাগিল ;
ক্ষণেকে চেতনা বিহীন হইল,
শবের আকার ধারণ ক'রে।
জগতের সখা, শীতল পবন,
যুবার শরীরে করিল বীজন ;
উন্মীলিল যুবা নিস্তেজ নয়ন ;
বসিল উঠিয়া ভূমির পরে।

১৫

নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক যুবার আনন ;
হইল তাহাতে বাক্য নিঃসরণ—
"কেন ধরা তুমি দিলে দরশন
পুনঃ অভাগারে মোহন বেশে ?
দিলে যদি জ্ঞান, দেহ তবে বল,
(জ্বলে যেই খানে করি ঝলমল
প্রেয়সী আমার, হীরক উজ্জ্বল)
যাইবারে সেই অগম্য দেশে !"

১৬

"করিতেছি আমি হায় রে এখন
অর্দ্ধ প্রাণ অর্দ্ধ শরীর ধারণ !—
পরিধান তায় অর্দ্ধেক বসন !
পূর্ণ দুখ মাত্র মস্তকে বহি !
পুড়িছে শরীর, ভস্ম নাহি হয় !
ঘন ঘন দেহে দীর্ঘশ্বাস বয়,
তবু প্রাণ দীপ নির্ব্বাণ না হয় !
প্রিয়া নাহি, কারে এ দুখ কহি ?"

১৭

কতক্ষণ যুবা নীরব রহিল ;
নেত্র হতে অশ্রু কতই পড়িল ;
অর্দ্ধবাসে নেত্র মুছিতে লাগিল ;
ময়ূরীরে চাহি কহিতে লাগে—
" এহেন দশায় দেখিয়া তোমারে,
মনে পড়ে সেই প্রেম প্রতিমারে,—
আশ্রয় পাদপ বিহীনা লতারে,
যার বিচ্ছেদাগ্নি হৃদয়ে জাগে !"

১৮

" সমান দুখিনী তুমিরে তাহার !
কেঁদো একবার গলা ধরি তার ;
কেঁদে কেঁদে তারে বোলো একবার—
'দেখে এনু ভবে অধম নরে !
নরাধম নল, বুদ্ধি নাই তার ;
ইচ্ছায় তুলিল শিরে দুখভার,
ফেলি কণ্ঠ হতে হীরকের হার,
গুরুভার জ্ঞানে কানন পরে।'—"

১৯

চমকিল যুবা বলিতে বলিতে ;
হুহু রবে বায়ু লাগিল বহিতে ;
সেই রব যেন লাগিল শুনিতে,
ঊর্দ্ধনেত্রে যুবা উন্মত্ত প্রায় !
হুহু রবে যেন কহিছে পবন—
" তুমিই কি নল, নিষধ-ভূষণ,
দুখিনী ভৈমীর হৃদয় রতন,
খসিয়া পড়েছ তরুর পায় ? "

২০

" দ্যূতের কুহকে হারায়ে আসন,
প্রবেশ করিলে বিজন কানন
কাহার কুহকে (বল হে রাজন্)
হারালে জায়ারে, কাননে পশি ?
রাজ্য ধন সহ বিবেক তোমার
লইল কি কাড়ি ভ্রাতা দুরাচার ?
নহিলে কেন বা করিলে প্রহার
ভৈমীর হৃদয়ে দারুণ অসি ? "

২১

" কালে পেতে পার নিজ রাজ্য ধন !
কালে পেতে পার রত্নসিংহাসন !
প্রাণপণ কিন্তু করেও রাজন্,
পাবেনাকো আর ভৈমীর দেখা !
মুদিতা শিশির সিক্তা কমলিনী ;—
শশি-বিরহিণী তামসী যামিনী ;—
পতি পরিত্যক্তা বৈদর্ভী দুখিনী,
রবে মাত্র তব হৃদয়ে লেখা' ! "

২২

" পুনঃ রাজ্যলাভ হইবে যখন,
দিনে রাজ কার্য্যে থাকিয়া মগন,
নিশীথে যখন করিবে গমন,
শ্রান্তিদূর তরে, শয়নাগারে ;
কেমনে তখন শূন্য ঘরে গিয়া,
বিজন পালঙ্ক নয়নে হেরিয়া,
রহিবে রাজন্ শোক সম্বরিয়া,
না ভিজায়ে বক্ষ নয়নাগারে ? "

২৩

" 'কোথায় জননী ? আসিবেন কবে ?'—
বলিয়া, তোমায় সুধাইবে যবে
পুত্র কন্যা তব, তখন কি হবে ?—
কি বলে তাদের প্রবোধ দিবে ?—
কোন্ মুখে রাজা বলিবে তখন
' দিয়াছি ভৈমীরে বনে বিসর্জন ;
শ্বাপদে রাণীরে করেছে ভক্ষণ ;
প্রাণ-দীপ তার গিয়াছে নিবে '—? "

২৪

বাতুলের মত, চারিদিকে নল
নিক্ষেপিয়া দৃষ্টি চঞ্চল, সরল,
কহিলেন " অরে সন্তাপ অনল !
মনেরে ছাড়িয়া পুড়ারে দেহ !
' অই নল অই তরুর তলায় !
অই নল অই পাগলের প্রায় !
অই নল অই করে হায় হায় ! '
আর যেন ভবে বলে না কেহ !"

২৫

" পুড়ুক নয়ন, ঘুচুক দর্শন
চারিদিকে মৃতা ভৈমীর বদন ;
পুড়ুক শ্রবণ, ঘুচুক শ্রবণ
দিবা নিশি মৃতা ভৈমীর নাম ;
পুড়ুক মস্তক, পারিনা রহিতে
শোকের পাষাণ, আর এ মহীতে ;
পুড়ুক রসনা, পারিনা কহিতে
' ভৈমী শূন্য আজি ধরণী-ধাম ' ! "

২৬

" লুপ্ত হোক্ আজি ভবে নল-নাম ;
কলঙ্কিত হোক্ প্রেতরাজ ধাম
নলের প্রবেশে ; পত্নী শোক কাম
নল দেহ মাটি হইয়া যাক্ !
শুষ্কলতা মূলে, শুষ্কনদী তলে,
প্রেম-সাগরের বিচ্ছেদ-গরলে
গতাসু সতীর চরণ কমলে,
সে মাটি সতত পড়িয়া থাক্ ! "

২৭

বাষ্পাকুল নেত্রে বিনত-বদনে
বসি কিছুক্ষণ, চাহিয়া গগনে,
পুনঃ আরম্ভিলা সকরুণ স্বরে,
করযোড় করি নিষধপতি——
" কোন্ দেব তুমি গগন উপরে
বসিয়া, কাঁদিলে দময়ন্তী তরে,
নল নামে জিহ্বা কলঙ্কিত ক'রে ?
জিজ্ঞাসিছে নল কলুষমতি ! "

২৮

" হবে বুঝি তুমি দেব প্রভঞ্জন ?
জগতের সখা না হলে, এমন
অপরের দুখে কে করে রোদন ?
কৃপা ক'রে তবে রাখগো কথা !—
আমি ভাগ্যহীন মানব সন্তান,
হৃদয়েতে চাপা শোকের পাষাণ ;
মোরে তবে দেব কর কৃপাদান,
ঘুচাও আমার প্রাণের ব্যথা !

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

হরেক রকম।

নবদুর্গামাহাত্ম্য

মহারাজ জনমেজয় কহিলেন, হে সর্ব্বদর্শী তাপসকুলপুঙ্গব! আমি আপনার নিকট দুর্গবিঘ্নঘাতিনী এবং দুর্গতিনাশিনী ভগবতী দুর্গাদেবীর সহস্র নাম শ্রবণ করিয়া অতি মাত্র আত্মশুদ্ধিলাভ করিলাম; কিন্তু ইহাতেও আমার শ্রুতি-পিপাসা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতেছে না। অতএব, আপনি যে বলিয়াছিলেন, কলিযুগীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জম্বুদ্বীপস্থ ভারতবর্ষের অন্তর্গত বঙ্গরাজ্যের বাঙ্গালিগণ যখন "কাপুরুষ" হইবে, তখন ভয়ঙ্করী উগ্রমূর্ত্তি নবদুর্গা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবেন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই দেবীমাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী; অতএব আপনার নিকট ব্যতীত আমার জিগীষাবৃত্তি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ তবে শ্রবণ করুন। যখন বঙ্গ সন্তানগণ হীনবীর্য্য, পরমুখাপেক্ষী, পরবশ, গৃহবিবাদরত, সনাতনধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, শাস্ত্র-বিদ্বেষী, ঘোরতর বিলাসপ্রিয়, আলস্যের ক্রীতদাস ও কাপুরুষ হইবে; তখন (ঊনবিংশশতাব্দীতে) নবদুর্গা অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিবেন। হে ক্ষত্রকুলর্ষভ! এই দেবীর মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী ও অদ্ভুত। কোন দেবতারই মূর্ত্তি ইহাঁর সহিত তুলিত হয় না। কি অগ্নি, কি সূর্য্য, কি বায়ু, কি বরুণ এবং কি যম সকলেই মূর্ত্তি ও ক্ষমতা বিষয়ে এই দেবীর নিকট নিম্ন গণ্য।

তখন পুনর্ব্বার জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য শুনিয়াই আমার আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে; না জানি নবদুর্গাজন্ম, দেবীর রূপ ও মাহাত্ম্য শুনিলে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইব। অতএব শীঘ্র তাহা কীর্ত্তন করুন; আমার শুনিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজকুলতিলক! বহু দূরবর্ত্তী পশ্চিমোত্তর সাগরগর্ভে অঙ্গ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের লোকেরা বানর ঔরস-জাত। ইহা ভারতবর্ষীয় সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত এবং ভবিষ্যতে উক্ত বংশীয় দাধিম-নামক কোন এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও এতদ্বিষয়ে সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন। বাস্তবিক অঙ্গবাসীরা যে মর্কটকুলোদ্ভব, তাহাতে সন্দেহ করিবার তিল মাত্রও কারণ লক্ষিত হয় না। কারণ, বানর কদলীপ্রিয়—অঙ্গদ্বীপবাসীও তাহাই। বানর বৃক্ষ প্রভৃতির শাখারোহণ করিতে আনন্দিত

হয়—অঙ্গদ্বীপবাসীও অর্ণবপোতস্থ গুণবৃক্ষ (মাস্তুল) প্রভৃতি বৃক্ষ শাখা সদৃশ উচ্চ স্থানে অকুতোভয়ে লম্ফঝম্ফ প্রদান করে। এই রূপ অপরাপর বিষয়েও বানরের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেবল ইহাদের লাঙ্গুল নাই—কারণ, ইহারা নরবানর! এই জাতিরা খটি-মৃত্তিকার ন্যায় ধবলবর্ণবিশিষ্ট, এই জন্য ইহারা "গৌরাঙ্গ অবতার" বলিয়াও অভিহিত হয়। ইহাদের চক্ষু বিড়ালের ন্যায় কপিশবর্ণ; কেশ, শ্মশ্রু ও গুম্ফ তাম্ররাগবিশিষ্ট; দেহযষ্টি পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বলিষ্ঠ; এবং ইহাদের পরিচ্ছদাদিও সচরাচর পশুলোমনির্ম্মিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সাতিশয় স্বার্থপর এবং নিরতিশয় রমণীপ্রিয়। যেহেতু, ইহাদের বনিতারা পুরুষাপেক্ষা আধিপত্য প্রকাশ করে। ইত্যাদি।

হে রাজন্! এই গৌরাঙ্গজাতির বাসভূমি অঙ্গদ্বীপে—নবদুর্গা দেবী অবতীর্ণ হইবেন। ইহার জন্মবৃত্তান্ত অতিশয় অদ্ভুত। সত্যযুগে সাগর-মন্থন-কালে যে সুধা ও বিষসমুদ্ভূত হয়, সেই সুধা ভাগ দেবতারা গ্রহণ করেন. কিন্তু আত্মবিনাশভয়ে বিষভাগ কেহই গ্রহণ না করাতে স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ হইতে থাকে। তদ্দর্শনে দেবাদিদেব মহাদেব জগৎসংহারসংহরণের জন্য উক্ত বিষরাশি পান করেন। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক উহা পাত হইবার পূর্ব্বে কিয়দংশ সাগর তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমোত্তর সমুদ্রগর্ভস্থ অঙ্গদ্বীপে সংলগ্ন হয়। হে মহারাজ! নবদুর্গা দেবীর অবতীর্ণ হইবার বীজই সেই জলধিমন্থনজাত কালকূট। এই জন্য নবদুর্গা দেবীর বীজমন্ত্র ওঁ অর্থাৎ ওয়াইন্। হে পরীক্ষিত নন্দন! নবদুর্গা দেবী অঙ্গদ্বীপে এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পীপা-নামক কাষ্ঠময় কোষে অবস্থান করিবেন। ইহার মূর্ত্তি নিরস্থি ও তরল অথচ লৌহাপেক্ষা দৃঢ় ও অনলাপেক্ষা তেজোবিশিষ্ট হইবে। ইঁহার বর্ণ লোহিত এবং দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইবে। ইনি কোন অস্ত্রাদি ধারণ করিবেন না বটে, কিন্তু "মায়াবিনী" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অকাট্য মায়ামন্ত্রে জীবকুলের জীবন সংহার করিবেন। জীবেরা অনায়াসে ইহার ঐন্দ্রজাল জড়িত হইয়া ইহাকে উদরে প্রবিষ্ট করিবে। ইনি সেই সুযোগেই তাহাদের প্রাণ বিনাশ পরিসাধন করিয়া সংহার কার্য্যের ভূয়সী পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন।

জন্মেজয় কহিলেন. হে দ্বিজকুলোত্তম! আপনার প্রমুখাৎ নবদুর্গা দেবীর ভাবী জন্মবৃত্তান্তাদি শ্রবণ করিয়া বিশিষ্টরূপ উপকৃত হইলাম। অনন্তর ইনি উনবিংশ শতাব্দীতে কিরূপে "কাপুরুষ" বঙ্গদেশজগণকে উৎপীড়ন করিবেন, এক্ষণে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহাই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে প্রজাবৎসল মহীশ্বর! বঙ্গবাসীরা হীনবীর্য্য হইলে অঙ্গবাসীরা সমুদ্রপোতে নবদুর্গা দেবীকে কাষ্ঠকোষে সংরক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবে। বাঙ্গালী জাতি এই মহামায়ার

মায়াতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহাঁকে উদরস্থ করিবে। নবদুর্গা দেবীও প্লীহা, উদরী যকৃৎ প্রভৃতি সহচরী নায়িকাগণের সহিত নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের বধ-সাধন করিতে থাকিবেন। হে রাজন্! তখন বঙ্গদেশের অবিশ্রান্ত হাহাকার ধ্বনি তরঙ্গায়িত সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় দিগন্ত-ব্যাপী হইবে—সহস্র সহস্র মানব কীট-কর্ত্তিত কুসুমকোরকের ন্যায় অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিবে—সহস্র সহস্র রমণী অপ্রাপ্ত যৌবনে বালবিধবা হইয়া অপর্য্যাপ্ত কষ্ট সহকারে কালক্ষেপ করিবে—সহস্র সহস্র সন্তান সন্ততি অসময়ে অনাথ হইয়া রোদন করিতে থাকিবে—গৃহে গৃহে উৎকট রোগবশতঃ মনুষ্যগণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে—সমুদয় দেশ ধনধান্যশূন্য হইবে—বঙ্গ সন্তানগণ পশুর অধম হইয়া কাল-ক্ষেপ করিতে থাকিবে—শস্য ও স্বর্ণময়ী বঙ্গভূমি তৃণ ও চূর্ণময়ী হইবে—এবং বঙ্গের স্বর্গীয় ভাব প্রকৃতপক্ষে ঘোরতর নরকে পরিণত হইবে। হে মহারাজ! শক্তিস্বরূপা নবদুর্গা দেবী এইরূপে আত্মশক্তি বিস্তার পূর্ব্বক ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গসন্তানগণকে নিধন ও উৎপীড়ন করিয়া বঙ্গভূমিকে উৎ-সন্ন করিবেন।

তখন মহারাজ জনমেজয় অতিমাত্র বিস্ময় সহকারে কহিলেন, হে ধার্ম্মিকপ্রবর! এই উগ্রমূর্ত্তি দেবীর করাল-হস্ত হইতে কি কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিবার উপায় নাই? যদি থাকে, তবে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! নবদুর্গা দেবীর সংহার-শক্তিবিশিষ্ট কর হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে। যাঁহারা ইহাঁর মায়াতে বশীভূত না হইয়া চিত্ত-সংযমে সক্ষম হইবে এবং ইহাঁর পূজাদি কিছুই করিবে না; তাহারাই রক্ষা পাইবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে তাদৃশ দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিবে। সুতরাং তখন এই মহামায়ার মায়াই যে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী হইবে, তাহাতে সংশয় কি?

জনমেজয় কহিলেন, হে ঋষিশার্দ্দূল! নবদুর্গা দেবী অবতীর্ণ হইলে তিনি কত-গুলি নাম ধারণ করিবেন, এক্ষণে আপনি তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রুতিবিবর পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে সার্ব্বভৌম! যেমন হিমালয়াত্মজার উগ্রমূর্ত্তির নাম চণ্ডী, সেইরূপ অঙ্গদ্বীপোদ্ভবা নবদুর্গার উগ্রমূর্ত্তির নাম "ব্রাণ্ডী" হইবে। অপিচ এই মূর্ত্তি সর্ব্ব-নাশিনী! তদ্ব্যতীত ইহাঁর শেরী, শ্যাম্পেনী, ওল্‌টমী, এলা, পোর্টা প্রভৃতি অনেকগুলি নাম হইবে। এবং ইহাঁর আরও কতকগুলি যৌগিক নাম হইবে; যথা—বোতলবাহিনী, কাষ্ঠকোষশায়িনী, আশুপ্রাণবিনাশিনী, তরলা, বিষকণ্ঠী, লোহিতবর্ণা, তীক্ষ্ণরসা, সুখনাশিনী, দুঃখদায়িনী, সর্ব্বসংহারিণী ইত্যাদি।

অনন্তর রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, হে মুনীশ্বর! এইবার আপনি অনুগ্রহ

পূর্ব্বক নবদুর্গা দেবীর স্তোত্রপাঠ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তবে শ্রবণ করুন, মহারাজ!

যা দেবী বঙ্গহৃতেষু প্লীহারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১॥
যা দেবী বঙ্গভূতেষু ক্ষয়রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২॥
যা দেবী কাচপাত্রেষু নীররূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩॥
যা দেবী কাষ্ঠকোষেষু কুটরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৪॥
যা দেবী সর্ব্বনাশেষু রক্তবর্ণেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৫॥
স্তোত্রমিদং ত্রিকালেষু যঃ পঠেদ্ভুরিযত্নতঃ।
স লভেদ্বহুপুণ্যানি চরমে চ দিবং ব্রজেৎ॥৬॥
এতানি শুভনামানি ন পঠেদ্যো নরাধমঃ।
স ভবেদ্ব্রহ্মঘাতকশ্চরমে নরকং ব্রজেৎ॥৭॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ত্রিকালদর্শিন্! আমি আপনার প্রমুখাৎ নবদুর্গা দেবীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও পুণ্যপ্রদ স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিয়া বহুপুণ্য সঞ্চয় করিলাম। এক্ষণে আপনি ইহাঁর প্রণাম মন্ত্র কিরূপ, তাহাই কীর্ত্তন করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তবে শ্রবণ করুন।—

সর্ব্বদুঃখভরে দেবি আশুপ্রাণবিনাশিনি।
ত্রাহি মাংদেহি মাংশান্তিংকাচপাত্রবিলাসিনি॥

মহারাজ! এই ত নবদুর্গা দেবীর মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিলেন। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমির প্রায় প্রতিগৃহে এই মহামায়া মহাদেবীর উপরি উক্ত স্তোত্র এবং প্রণামমন্ত্র অহর্নিশ পঠিত হইবে। আর ইহাঁর বীজমন্ত্র ওঁ বঙ্গসন্তানেরা কবজে রক্ষা করিয়া মস্তকে, কণ্ঠে ও বাহুতে ধারণ করিবে।

ইতি শ্রীষণ্ডমার্কণ্ডেয়পুরাণে নবদুর্গা মাহাত্ম্যনাম শূন্যোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ধর্ম্মনীতি।

ধর্ম্মনীতি সমাজ-বিজ্ঞানের মজ্জা স্বরূপ। মনস্তত্ত্ব, চিন্তাতত্ত্ব, বিবেক, উপচিকীর্ষা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল, ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রের সহিত এরূপ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ যে, তাহা সুশিক্ষিত পাঠক সমাজকে বিশদ রূপে বুঝাইতে হইবেক নাই। সভ্যতা ক্রমশঃ যত চরম সীমায় উন্নীত হইবে, ধর্ম্মনীতিও তদনুরূপ ভাস্বর বিভায় জগতীকে আলোকিত করিতে থাকিবে। সমাজের বাহ্য সৌন্দর্য্যের চাকচিক্যশালিতা ততদূর স্পৃহনীয় নহে, যতদূর অন্তঃ-সমাজে ধর্ম্মনীতির প্রাবল্য স্পৃহণীয় প্লেটো, পিথাগোরস্ সক্রেটিস্, চাণক্য, বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দ্বারা বিগতকালে তত্তদ্দেশের যাদৃশ মহোপকার সাধিত হইয়াছে, বহুযুগে বহুসভ্যতার দ্বারা তাদৃশ উপকার যুগপৎ প্রত্যাশা করা যায় না। সুবিস্তীর্ণ সমাজের রুচি একজন ধর্ম্মনীতি বিশারদ লোকের দ্বারা যত শীঘ্র গঠিত হয়, এমত অন্য কোন উপদেশে সংসাধিত হয় না। শত সহস্র উপদেশের ফল ফলিতে যত সময় আবশ্যক করে, একজন নীতিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা তাহা অচিরে ঘটিয়া থাকে। "মিথ্যা কথা বলা অনুচিত"। এরূপ উপদেশ প্রতি দিন প্রদান করিয়াও যে সুফলের আশা করা যায় না, সমাজ মধ্যে যিনি আদৌ মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁহার দ্বারা তাদৃশ সুফল আশু লভ্য হয়। লোকে ধার্ম্মিক পুরুষকে, নীতিমার্গানুসারী মহাজনকে যত শ্রদ্ধা করে ও তদনুরূপ আচরণ করিতে যত চেষ্টিত হয়, শত শত নীতিবিদ্যার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াও তাহা হয় না। এই জন্য প্রবল ধর্ম্মনীতিজ্ঞ পুরুষেরা সমাজের শীর্ষ স্থানে থাকিয়া আশ্রিত সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকেন। এইজন্যই ধর্ম্মনীতি-শাস্ত্রের আদর। যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নৈতিক বন্ধনের দৃঢ়তায় আবদ্ধ, তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও ধর্ম্মনৈতিক বন্ধনের শিথিলতা স্বীকার করেন না। তাদৃশ প্রশস্ত উদার মনোমধ্যে বিষয় স্পৃহা যদিচ স্থান পায় বটে, কিন্তু হিতাহিত বিবেচনার ও ন্যায়পরতার সীমা কোন ক্রমেই অতিক্রম করে না। উদ্বেল বারিধির পক্ষে বেলা যেরূপ অনতিক্রমণীয়, উক্ত নীতিজ্ঞ পুরুষদিগের মধ্যে নৈতিক বন্ধনের দৃঢ়ভাবও তাদৃশ পরিরক্ষণীয় হইয়া উঠে। সমাজের, দেশের গৌরব এই সকল মহাত্মাদিগের দ্বারাই হইয়া উঠে। যে জাতি ধর্ম্মনীতির যত গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই জাতিই যে সেই পরিমাণে সভ্য, এরূপ প্রতীতি সহজে হইবার নয়; প্রকৃত পক্ষে সেই জাতির মধ্যে ধর্ম্মনীতি বহুল পরিমাণে সুরক্ষিত হইয়া থাকে কি না দেখা আবশ্যক। নতুবা কোন কালে কোন মহাজন ব্যক্তি আজীবন ধর্ম্মনীতি পালন করিয়া

গিয়াছেন, এখন তদনুরূপ নীতির অনুসরণই নাই, এরূপ স্থলে পূর্ব্ব গর্ব্ব লজ্জার সহিত তিরস্কৃত হওয়া আবশ্যক। আমরা জাতি-বিশেষের ধর্ম্মনীতির প্রতি আক্রমণ করিবার জন্য এবম্বিধ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। প্রকৃত পক্ষে যতই বিদ্যাশিক্ষার সুফল সমাজমধ্যে লব্ধাবসর হইবেক, ততই ধর্ম্মনীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেক। শব্দ-শাস্ত্রের অন্ধ আলঙ্কারিকেরা যেরূপ অনু-প্রাসচ্ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া শব্দবিন্যাস-শোভিত, ভাববিহীন অকাব্যকে কাব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমরা বাগাড়ম্বর পরিপূর্ণ আপাততঃ সভ্যবৎ পরি-দৃশ্যমান সমাজকে ধর্ম্মনীতির গৌরব বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য নহি। কারণ এবম্বিধ সমাজের অন্তস্তলে বিচরণ করিলে কত দুর্নীতিই পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সহিত মনের, মনের সহিত বাক্যের, কার্য্যের সহিত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে যদি আমরা ধর্ম্ম-নীতির গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, এবং এরূপ সপ্রমাণ করিতে পারি যে, আমা-দিগের কার্য্য জাতে ধর্ম্মনীতিজনিত অব-সন্নতা ও অপুষ্টি নাই, তবেই গৌরব; নতুবা চিত্তদৌর্ব্বল্যের অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার প্রয়োজন কি? বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির নিকট সকল জাতিই সমান। সকলেই সমান অধিকার লাভে সমর্থ। যিনি কৃতবিদ্য ও ভ্রাম্যমাণ সংসার-চক্রের গতিজ্ঞ হইবেন, তিনিই যে কেবল রাজ-প্রসাদ লাভ করিবেন, এরূপ স্বত্ব স্বভাবতঃ তর্কশাস্ত্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই। নিরক্ষর কৃষকের সহিত একজন জ্ঞানী মনুষ্যের তুলনা করিলে উভয়ের মনের ভাব অবশ্যই বিভিন্ন হইবে, বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু হয়ত নীতি বিষয়ে জ্ঞানীর অনুসৃত পথ কৃষকের পথ হইতে অবিশুদ্ধ হইতে পারে। কারণ কৃষীবল সরলচিত্ত; তাহার মানস-ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, বৈরনির্যাতন প্রবেশ করিয়া তাহার ধর্ম্মনীতিকে দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। জ্ঞানী পুরুষ হয়ত প্রতি-যোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সূত্রে স্বার্থ সাধন বাসনার বশীভূত হইয়া মনের নৈসর্গিক সারল্যকে কপটতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছেন।

মহামূল্য কহিনুর রাজমস্তকস্থ, এবং বহু-মূল্য বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যে আকর কহিনুরের প্রসূতি স্বরূপ, তথায় শত শত কহিনুর তুল্য উজ্জ্বল বহুমূল্য হীরক থাকিতে পারে, অসম্ভব কি? এবং আকরস্থ ও অপরিশোধিত অবস্থায় আছে বলিয়াই কি উহারা হেয়? এমত হইতে পারে না। সেইরূপ যাহাদিগের খ্যাতি দিগন্তপ্রশ্রুত, তাহারাই যে কেবল ধর্ম্মনীতি কঞ্চুকাচ্ছা-দিত, অন্যে নহে, এরূপ বিবেচনা যুক্তির অনুপযোগিনী, সূক্ষ্ম তর্কে অবশ্যই খণ্ডশঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। স্থূলচর্ম্ম গ্রাম্য কৃষক নীতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানীর আদর্শ হইতে পারে। কারণ চারিত্র ও সমুদাচার উক্ত কৃষকের চালক হইয়া চিরকাল উহাকে নৈতিক দৃঢ়তা রক্ষণে শিক্ষিত করিয়াছে।

কোন বিজ্ঞ জ্ঞানী কহিয়াছেন যে, " ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য মনুষ্যই পশু। এস্থলে 'ধর্ম্ম, শব্দে কোন প্রকার জড়োপাসনাপরতাকে বুঝাইতেছে না; ধর্ম্মের অর্থ ধর্ম্মনীতিপ্রতিপালন। যিনি ধর্ম্মনীতির আয়ত্তিকে কখনই লঙ্ঘন করেন নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। তাঁহার চিত্তপ্রসাদ চিরকাল সমান ভাবে লব্ধ হইয়া থাকে, তিনি কখনই অধর্ম্মজাত বিপদের মুখাবলোকন করেন না। প্রসন্নতারূপ পবিত্র সমীরণ তাঁহার অন্তরাত্মাকে নিরন্তর পুলক প্রদান করিতে থাকে।

আমরা বর্ত্তমান সময়েও অনেক নীতিজ্ঞ পুরুষকে দর্শন করিয়াছি। যাঁহাদিগের সদাচরণবলে সমাজ বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সুসভ্য সমাজবিশেষে ধর্ম্মনীতির দুর্ব্বল ভাব অবলোকন করিলে আমরা একান্ত ব্যথিত হই। সুশিক্ষার বহুল প্রচার আশানুরূপেই হইতেছে, তথাপি নৈতিক দৌর্ব্বল্য যে এখনও প্রভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহাই অতিশয় বিস্ময়বিমিশ্রিত আশ্চর্য্যের বিষয়। সভ্যতার পরিণতির সহিত নীতির প্রাবল্য নিতান্ত অভিলষণীয়। নতুবা অন্তঃসারশূন্য সমাজের বিবৃদ্ধিতে আমাদিগের ঐহিক জগতের কোন উপকারই নাই। সুনীতির উপরি সকল প্রকার সাংসারিক সুখ নির্ভর করিয়া থাকে। সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, প্রিয়ভাষণ, অনুকম্পা, আত্মসম্মান জ্ঞান, পরোপচিকীর্ষা, ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সকল ধর্ম্মনীতির দ্বারাই জীবিত হইয়া থাকে। " পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যই সহোদর স্থানীয় " এইরূপ মহোচ্চ উদার ভাব যে মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে এবং জ্ঞানবান্ মনুষ্যে যে এইরূপ ভাবানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান বিষয়ে কোন ব্যপদেশ অবলম্বন করিতে হয় না। উদার ধর্ম্মনীতিজনিত মাহাত্ম্যই মনুষ্যকে এই পথে চালিত করিয়া থাকে। অপকারীর কৃত অপকার বিস্মরণ পূর্ব্বক তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা মহাশয় মনুষ্যের নিত্যব্রত হইলেও উহা ধর্ম্মনীতির সুফল বলিয়া নির্ণীত হইবে, সন্দেহ কি? আত্মার পূর্ণত্ব, হৃদয়ের অশূন্যত্ব এই সকল মহত্তত্ত্ব নীতি দৌর্ব্বল্যের ফল নহে; বস্তুতঃ নীতি প্রতিপালনের প্রত্যক্ষীভূত পরিচয়। জাতি সাধারণ উন্নতিও যে সময়ে সময়ে পশ্চাদ্‌গতি হইয়া পড়ে, এবং নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি অজ্ঞাতসারে অতর্কিতভাবে সমাজমধ্যে আসিয়া যে সমাজকে প্রলয় দশায় নীত করে, তাহার এক মাত্র কারণ ধর্ম্মনীতির হ্রস্বভাব। বিবিধ মানসিক দৌর্ব্বল্যে অথবা দেহরোগ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে বঙ্গ সমাজকে যে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, তাহার একমাত্র হেতুই নৈতিক দৃঢ়তা রক্ষণের প্রতি অনবধান। রাজনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, বিচার যে বিষয়ে প্রবেশ কর, যদি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাও যে, উহার মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার প্রবেশলাভ

করিয়াছে, তখনই মনে করিতে হইবে যে, উক্ত রূপ কার্য্য দ্বারা সমাজের প্রতিকূলতা ভিন্ন অনুকূলতা নাই। এবম্বিধ সমাজের অস্থিতে যে বিষম ঘুণ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সমস্ত বলই বিনষ্ট করিবে, তথাপি তাহার বিরাম হইবেক নাই। যে সমাজে ঈদৃশ নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার লক্ষিত হয়, তথায় সামাজিক উন্নতির চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইবেক নাই। আর এরূপ সমাজের স্থাপনও অনাবশ্যক হইয়া উঠে।

সভ্যতার ইতিহাস লেখকগণ নীতির বিরুদ্ধাচারী সমাজের প্রতি যে বিষম বিষ-দৃষ্টিপাত করিবেন, লেখা বাহুল্য মাত্র। পার্থিব উন্নতি, জড় জগতের উন্নতি এবং মানসিক অত্যুচ্চ ভাবপরম্পরা সুনীতি প্রতিপালনের উপরি বিশেষ স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নীতির অনুরোধে জীবন ত্যাগ কর্ত্তব্য হইলেও তদ্বিরুদ্ধাচরণ কখনই কর্ত্তব্য নয়। কারণ একবার কোন প্রকারে নীতিদৌর্ব্বল্য সমুপস্থিত হইলে অবনতি ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা অতি ন্যূন থাকে। নীতিজ্ঞ পুরুষগণ নীতিকেই দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সুনীতির আকর্ষণ ও প্রতিপালন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সমান রূপ হইয়া থাকে। যথার্থ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের বীজমন্ত্রই সুনীতি। তাহার ব্যভিচার কোন প্রকারে দৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যক্ষবাদ, হিতবাদ ও নানাবিধ জড়ো-পাসনার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট রূপে জানিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই ধর্ম্মনীতির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নানাবিধ সুফল প্রদান করিতেছে। নতুবা উক্তবিধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ হইয়া সাধারণে উহা হেয়োপাদেয় বলিয়া পরি-গণিত হয়। এমন কি স্পষ্টাক্ষরে এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে, এমন ধর্ম্মই নাই, যাহার মূলে সুনীতির বীজ রোপিত না আছে।

কি বৌদ্ধ, কি নাস্তিকা, কি অদ্বৈতবাদ, কি প্রত্যক্ষবাদ, কি হিতবাদ সকল ধর্ম্মের মধ্যে সুনীতি বিচরণ করিয়া থাকে, এবং নীতি প্রতিপালন অবলম্বিত ধর্ম্মের মূল মন্ত্র বলিয়া অঙ্গীকৃত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অগ্রে নীতি প্রতিপালন তৎপরে ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে ধর্ম্মের মধ্যে নীতির গাঢ়তা নাই, নৈতিক নিয়মের কাঠিন্য নাই, সত্যের আদর নাই, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাবল্য নাই, তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাদৃশ ধর্ম্ম নিতান্ত হেয় বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি অবধি চরম উন্নতি পর্য্যন্ত যত বিষয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা যাহা উন্নতির কার্য্য বলিয়া গণিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মনীতি-জনিত। সমাজস্থিতি নীতিপ্রতিপালন ও নীতির পুষ্টি সাধনের উপরি সম্যক্ নির্ভর করে। নতুবা সভ্যতার অভিলষিত উপচয় বহুদূর নিরাকৃত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। শান্তি

নীতির নিত্য সহচরী। শান্তির প্রতি অণুমাত্র আস্থা থাকিলে ধর্ম্মনীতিকে অগ্রে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

যখন মনুষ্য-সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তখনই নীতির আবশ্যকতা অলঙ্ঘনীয় রূপে অবধারিত হইয়াছে। মানব জাতি যদি সহানুভূতিপ্রযোজিত হইয়া অন্যান্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সুনীতির সাহায্য এবং আশ্রয় ব্যতীত তাহা সুসম্পাদিত হওয়া কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস হইবেক নাই। সমাজ রচনা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীতি সকল সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সমাজ যতই উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, নীতিও ততই অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি হিত, কি অহিত কিরূপে পরস্পরের সঞ্জাত সদ্ভাব পরিরক্ষিত হয়, এই সকল কঠিন তত্ত্ব নরজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় যত উপকার সাধন করিয়াছে, এমন কোন বিষয়ই করিতে পারে নাই। নীতিবিজ্ঞান অন্যান্য সুকঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নিত্য সহচর না হউক, কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয়তাপক্ষে নীতিবিজ্ঞানের আদর অপেক্ষাকৃত অধিক। একজন মহাবৈজ্ঞানিক সংসারের অনেক উপকার সাধন করিতে পারেন এবং কার্য্যতঃ করিয়াও থাকেন; কিন্তু তিনি যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন, তবে তাঁহার দ্বারা একদিকে জগতের যত মঙ্গল সম্ভব, তাঁহার চরিত্রের কুদৃষ্টান্ত অন্য পক্ষে তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গল ঘটাইতে পারে। এই উভয়বিধ শুভাশুভ পর্য্যালোচনা করিলে, একটী অনাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গবেষণায় যত পার্থিব উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, একটী দুর্নীতির প্রশ্রয়ে তদপেক্ষা অধিক মন্দ হইতে পারে। যে কারণে পিথাগোরস্, প্লেটো, চাণক্য, সক্রেটিস্ সর্ব্বদেশীয় লোকের হৃদয়ে সাদরে পূজার্হ বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন, সেই কারণেই আমরা নিউটন, সর্ উইলিয়ম হর্শেলকে আদরণীয় মনে করি। কারণ এই সকল মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াজনিত মহত্তত্ত্ব সকলের দ্বারা জড় জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকারিতা প্রত্যক্ষ করি, তদ্রূপ সুশীলতা, চারিত্র, সমুদাচার তাঁহাদিগের চরিত্রবৃক্ষের প্রধান ফল জানিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হই। যদি মনুষ্য সমাজ, জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া উপকার করিতে চান, তবে তাহার মূল উদ্দেশ্য পঠিতব্য জীবনবৃত্ত মধ্যে সুনীতির বাহুল্য ভাব। জীবনবৃত্ত পাঠে আশু কেন চরিত্র সংযমিত হয়? কেনই বা অসাধারণ অধ্যবসায় বদনমণ্ডলকে চিরপ্রসন্নতা প্রদান করে? ইহার কারণ, যাঁহাদিগের জীবনী আমরা পাঠ করি, তাঁহারা কি চরিত্র সম্বন্ধে, কি অন্যবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার সম্বন্ধে সকল বিষয়েই সমান রূপ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক প্লেটোর সুনীতি ও সৎকথা পাশ্চাত্য নীতি-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। যে মহাপুরুষ

আজীবন সুনীতির অনুসরণ করিয়া নীতি-বৃক্ষের অমৃতময় ফল উপভোগ করিয়াছেন, এবং অনন্তর বংশীয়দিগের হস্তে যাহা সুধা-সার স্বরূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের কত উপকারক, কত মঙ্গলপ্রদ, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

মানবধর্ম্ম।*

তৃতীয় অধ্যায়।

(১ম পর্ব্বের ৩৩৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

মনোবৃত্তি নিচয়কে জ্ঞানের অনুশাসনে রাখিয়া হৃদয়কে পবিত্রময় করিবার যে তিনটী উপায়ের উল্লেখ হইয়াছিল, তন্মধ্যে হৃদয়েচ্ছার বিশুদ্ধতা সম্পাদনের আবশ্যকতা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে রিপু-দমন ও স্বভাবের পবিত্রতা সম্পাদন সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইতেছে।

ভাবী অমঙ্গল বা শুভের আশঙ্কায় মনোমধ্যে যে সমস্ত ভাব প্রবল বেগে সমুদিত হয়, তাহাই রিপু শব্দে অভিহিত। মনে কর, 'ক' বুঝিতে পারিলেন যে, 'খ' 'ক'র অসাক্ষাতে তাঁহার বিষয়ে গ্লানিসূচক কথোপকথন করিয়া থাকেন। সম্মান হানির আশঙ্কায় 'ক'র হৃদয়ে যে অনলরাশি প্রজ্বলিত হইল, তাহাই 'ক্রোধ'। আর রাম দেখিলেন যে, শ্যামের প্রয়োজনাতি-রিক্ত বহুল অর্থরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে; কিন্তু তিনি দিনান্তে উদরান্ন সংস্থানেও সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহার হৃদয়ে একটী আশা হইল, যে কোন মতে শ্যামের সঞ্চিত অর্থ-রাশির মধ্যে কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে পারিলে, তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। তিনি সযত্নে তাহার উপায়ান্বেষণে ব্যাকুল হইতে থাকিলেন। ইহাই তাঁহার 'লোভ'। এইরূপে দেখিতে গেলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের শুভাশুভ-চিন্তাজনিত মনের উদ্বেগই রিপু। রিপু মানব-জাতির সহজাত; সুতরাং তাহাদের সম্যক্ পরাজয় এক প্রকার ভ্রান্তিমূলক বাসনা। ধর্ম্ম তাহাদের সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ সাধনের উপদেশ না দিয়া কেবল বৈধ পরিচালনেরই কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন। প্রায় সকল দেশে এমন অনেক গুলিন সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা রিপুগ্রামের সমুচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া সংসার,

* See Blair's Sermons Vol. II.

সমাজ ও প্রকৃতির মূল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বসেন। কিন্তু তদ্দ্বারা যে তাঁহারা বিভ্রান্ত ও ঐশী নিয়মের অতিক্রমজনিত মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন, তাহা তাঁহাদের বুঝিবার শক্তি নাই। কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝেন না।

বৈধ পরিচালনে রিপুগ্রাম বিশেষ সুফলপ্রদ। তাহারা আত্মার সুষুপ্তবৃত্তি সকলকে জাগরিত করে, এবং তাহাদিগের বিশেষ সমুন্নতিসাধন করিয়া থাকে। মনুষ্য সুস্থির অবস্থায় যে রূপ থাকে, সুশাসিত রিপুচয় তাহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থায় সমুন্নত করে, এবং তাহার হৃদয়ে মহতী বাসনার উদ্রেক করিয়া সকল প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। রিপু আত্মার এক প্রকার কার্য্যকারিতা শক্তি সমুৎপাদিকা যন্ত্র-বিশেষ। তাহারা আত্মার সঞ্জীবনী শক্তি। কিন্তু অন্যান্য সকল শক্তির ন্যায় রিপুও পরিচালনের দোষ গুণের তারতম্যানুসারে শুভদ বা অনিষ্টকর হইয়া থাকে। যে অগ্নি ও বায়ু জড়জগতের অশেষ কল্যাণ-জনক বলিয়া দেবত্ব লাভে সফল হইয়াছে, তাহারাই আবার যখন প্রলয়াত্মক ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে অথবা স্বাভাবিকীশক্তিশূন্য হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের দ্বারাই কি মহান্ অনিষ্ট সংসাধিত না হইয়া থাকে?

এই সমস্ত মনোবৃত্তি সুশাসিত না হইয়া যে নিরন্তর প্রবলতা-প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা মানবজাতির দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও তজ্জনিত ঈশ্বর বিচ্যুতিজ্ঞানদৌর্ব্বল্য ও রিপু প্রাবল্যের প্রধানতম কারণ। এই দুই কারণ হইতেই, রিপুচয়কে নিরন্তর কুপথে পরিচালিত হইতে দেখা যায়। তাহাদের উদ্দেশ্য নিতান্ত দুষিত না হইলেও সময়ে সময়ে তাহাদের আধিক্যবশতঃ মনুষ্যকে বিপদ্-সঙ্কুল ভ্রান্তপথের পথিক করিয়া ফেলে। অতএব সর্ব্বাদৌ রিপু চরিতার্থতার উপযোগী বিষয় নির্দ্ধারণ এবং তদনন্তর তাহাদের বেগাতিশয্য নিবারণের চেষ্টা সম্যক্ প্রয়োজনীয়। যখনই দেখিব যে, কোনরূপ রিপু অসময়ে মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিচার শক্তির মালিন্য বিধান ও স্বভাবের বিকৃতি সম্পাদন করিতেছে, অথবা আমাদের স্বকর্ত্তব্যসাধিকা ও মনের সন্তোষজনিকা শক্তির অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, তখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে, সেই রিপু আমাদের হৃদয়কে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—আমাদের মনোরাজ্যের প্রবল অত্যাচারী দুর্ব্বিনীত অধীশ্বর হইয়া উঠিয়াছে। তখন আমাদের প্রধান চেষ্টিতব্য এই, যেন আমাদের হৃদয় ধর্ম্ম ও জ্ঞানবলে সর্ব্বদা বলীয়ান্ থাকে, রিপুর মোহন মন্ত্রে বিমোহিত অথবা তাহার প্রাবল্যে বিচলিত হইতে না পারে। অপিচ এমত কতকগুলিও মূল সূত্র হৃদয়ে দৃঢ় নিবদ্ধ থাকিবে, যেন সকল সময়েই হৃদয় স্বাধীন ও অবিচলিত থাকে, জ্ঞানের

অনুশাসনে নিরন্তর সুখবোধ করে, এবং তাহারই আজ্ঞা পালনে সতত তৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারে। কোন স্থির লক্ষ্য ও দ্রাঢ্যবিহীন হৃদয় কর্ণহীন তরিবিশেষ। মানবজীবন এরূপ অবস্থায় ভয়ানক বিপদ্ সঙ্কটে সংপতিত থাকে ও তাহার জীবনের সুখভোগ কেবল স্বপ্ন সম্ভোগ মাত্র।

রিপুগণকে স্ববশে রাখা, এবং তাহাদের স্বাধীন বেগশীলতা নিবারণ করা মানব স্বভাবের একটী উচ্চতম অধিকার। এই অধিকার লাভ যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়িণী যুক্তি চতুর্দ্দিক্ হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। যদি মানব জীবনের কোন প্রধান অশুভ-জনক উৎসের আবিষ্কার করিতে হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই রিপুপ্রাবল্য। ইহাই লোকের সুখ সন্তোষের হলাহল, ইহাই সমাজ শৃঙ্খলার দুষ্ট কীট, এবং ইহাই সুদীর্ঘ জীবন-পথের মহাক্লেশকর কণ্টকাবলী। যে সমস্ত সুদারুণ দুর্ভাগ্যের দৈনন্দিন অভিনয় দেখিয়া সকলের শরীর কণ্টকিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই রিপু প্রাবল্যবশতঃ সংঘটিত হইতেছে। ইহাই সুখময় পৃথিবীকে নিরন্তর নরশোণিতে আপ্লুত করিতেছে, ইহাই দুরাত্মা পামর নরঘাতকের শাণিত তরবারিকে রুধিরাক্ত করিতেছে, ইহাই স্বর্ণ, রৌপ্যাদি বিনির্ম্মিত সুদর্শন ধাতব পাত্রকে বিষপূর্ণ করিয়া রাখিতেছে, এবং ইহাই সৌভ্রাত্র ও বন্ধুতা ইত্যাদি স্বর্গীয় মনোভাব নিচয়কে প্রতিনিয়ত কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। ইহাই সুচতুর সদ্বক্তার ও বিশ্ববিমোহক কবির উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান ও কাব্য প্রচারের বিবিধ উপদেশ যোগাইয়া দিয়াছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যোগাইতে থাকিবে।

সামাজিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা ব্যক্তি বিশেষের বিষয় বিচার করিয়া দেখি, যদিচও তথায় রিপুপ্রাবল্যজনিত তত দূর বিষম অনিষ্টের অভিনয় দেখিতে না পাই, তথাচ তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তির কম পরিচয় পাই না। হিংসা, দ্বেষ, প্রতিজিঘাংসা প্রভৃতি দারুণ অনিষ্টকর রিপুচয়ের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-পরতা অর্থাৎ লাম্পট্য, পানদোষাদির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা শক্তি ও ধারাবাহিক গতির বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তাহাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লোকের চিত্ত সন্তোষের মালিন্য ও বিনাশসংসাধন হইতে থাকে, তাহাদের বর্দ্ধিত পরাক্রমের সহিত লোককে বিবিধ বিপজ্জনক ও লজ্জাকর বিষয়ে অনুরক্ত করে, এবং পরিশেষে তাহার ধনক্ষয় ও স্বাস্থ্য বিনাশ করিয়া ও তাহাকে মন্দ চারিত্র করিয়া ক্রমশঃ তাহার দুঃখরাশি বৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং অবশেষে তাহার দারুণ দুঃখের নিদান স্বরূপ প্রবল মনস্তাপানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। এই দারুণ দুর্ভাগ্যজনক পথে কত অসংখ্য লোকে পদার্পণ করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন, এবং কত অসংখ্য লোকে এখনও যে

তৎপথের পথিক হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত দুষ্কর।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, রিপু প্রাবল্য জনিত অনিষ্টাবলীর গণনা করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। এমন চিন্তাশক্তি পরিশূন্য অনভিজ্ঞ লোক জগতে কেহই নাই, যিনি এ কথায় অস্বীকার পাইবেন যে, যে হৃদয় রিপু প্রাবল্যের অধীন, তাহা ধর্ম্ম ও সুখের অধিষ্ঠানের নিতান্ত অনুপযুক্ত। অতএব এ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কি রূপ উপায়ে রিপুগ্রামকে সুশাসনে রাখিয়া লোকে চিরসুখী হইতে পারে, তাহার বর্ণনেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যে সমস্ত বস্তু আমাদের ইচ্ছাকে আশু আকর্ষণ করিয়া তাহাদের প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলে, তাহাদের উপকারিতা বা অনুপকারিতার বিষয় বিচার করিতে শিক্ষা করার শক্তি উপার্জ্জন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য। সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে আমরা প্রথমতঃ যে ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি, তাহাই আমাদের দুর্ভাগ্যনিদান রিপু প্রাবল্যের প্রধান হেতু। অবিশুদ্ধ আমোদের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমরা ব্যগ্রতার সহিত তাহার অনুধাবন করি, সাধারণ লোকে যাহার গুণানুকীর্ত্তন করে, বোধাবোধশূন্য হইয়া তাহারই অনুসরণ করি, এবং অন্যের অসদ্দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট, নিতান্ত অসারপদার্থের সেবায় অনুরক্ত হই। আমাদের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমাত্মিকাবুদ্ধির সংস্কার সন্বিধানে যত্ন করা আবশ্যক। তাহা হইলে মূলেই কুঠারাঘাত প্রদত্ত হয় এবং বিবেচনা শক্তি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া রিপু প্রাবল্যের সম্পূর্ণ বাধা জন্মাইয়া দেয়।

সচরাচর যুবা ও অশিক্ষিতদিগকে সুখের অনুসরণে ব্যগ্র হইতে দেখা গিয়া থাকে। যখন সাংসারিক জ্ঞানের আধিক্য ও বহুদর্শন জনিত বিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়, তখনই তাহাদের সেই বেগ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অতএব বহু দর্শন দ্বারা বহু ক্লেশে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, চিন্তাশক্তির নিরন্তর আম্রেড়নে সেই জ্ঞানের অনুশীলন তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। যে সমস্ত আমোদ আহ্লাদে মানব সমাজ উৎফুল্ল ও আন্দোলিত হইতেছে, তাহাদের অসারতা চিন্তা করা এবং রিপু প্রাবল্য বশতঃ যে কীদৃশ মহান্ অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা তাহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্ম ও ভক্তি যে মানবজীবনের প্রধান সুখ এবং সন্তোষ ও সুখ লাভই যে এ জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য, ইহাতেই স্থির বিশ্বাস থাকা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবনায় পুণ্যবান্ মহাত্মারা জীবনকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ সকলেই অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। অতএব উপযুক্ত সময়ে জ্ঞানের সাহায্য সেই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে তাহাদিগকে আর সেই অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে না,

যাহাতে সকলই দুঃখময় ও পাপময় এবং যাহাতে প্রবল অনুতাপানল অহর্নিশ প্রধূমিত।

রিপু শাসনের দ্বিতীয় উপায় ত্যাগ স্বীকার। ত্যাগ স্বীকার শব্দে দুঃসহ ক্লেশকর, আত্মহত্যা সদৃশ উপবাস অথবা সাংসারিক অতি প্রয়োজনীয় নির্দ্দোষ ভোগ বাসনাদি পরিত্যাগ করা বুঝাইতেছে না। প্রায় সকল ধর্ম্মে, সকল দেশে, বিশেষতঃ ধর্ম্মান্ধ ভারতভূমে ঐ শব্দের ঐ রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া যে কত সংখ্যক লোকে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা প্রাকৃতিক-নিয়ম-ভঙ্গ-জনিত পাপশরে জর্জ্জরিত কলেবর হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা ভার। ধর্ম্মে ও ঐশ্বরিক নিয়মে ওরূপ অনাবশ্যক ত্যাগ স্বীকার অনুমোদিত নহে। যাহাতে সুখভোগ বাসনা ও আমোদ প্রবৃত্তি অযথা প্রবর্দ্ধিত হইতে, এবং দুঃখজনিত মনস্তাপ হৃদয়ের পীড়াকর হইতে না পারে, এজন্য সকল সময়ে, সকল অবস্থায় চিত্ত সন্তোষ লাভ করিতে অভ্যাস করাই প্রধান সুখের কারণ। এই অভ্যাস ত্যাগ স্বীকার শক্তির বশীভূত। এরূপ শক্তি বিরহিত হইলে আমরা সর্ব্বদাই আকস্মিক মন্দ অভিপ্রায়ের দাস হইয়া পড়িব, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে রিপুকুল প্রবল হইয়া আমাদের সুখ-সাম্রাজ্যের সম্যক্ নিধন সাধন করিয়া তুলিবেক। তখন জ্ঞান দূরে পলায়ন করিবে, ইচ্ছাই আমাদের চরিত্রের উপর একাধিপত্য করিতে থাকিবেক।

রিপুকে আত্মবশে রাখিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার সাধন চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। অতএব ত্যাগ স্বীকারের জন্য উপযুক্ত কালের অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদাই তাহার সাধনা করিবেক। যদি লোভ একবার মনোরাজ্যে আসন পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহাকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। অতএব নির্দ্দোষ উপভোগ কামনা যাহাতে বলবতী হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। এতৎ সাধনের প্রধান উপায় মিতাচরণ ও আত্মপ্রভুতা। এই নীতি পালনই হিতাহিত জ্ঞানের জীবনবারি। ইহাতে উপেক্ষা করিলে রিপুর প্রবলতার সহিত মনুষ্য নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেক।

তৃতীয়তঃ মনে মনে এইটী বুঝিতে হইবেক যে, কোন প্রকার রিপুর বশীভূত হইলে যে বস্তু যেরূপ প্রিয়দর্শন ও মনোহর ভাব ধারণ করে, বস্তুতঃ সেরূপ নহে। তদবস্থায় যে কোন সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা কদাচই সত্য ও প্রকৃত হইতে পারে না। প্রবল রিপু প্রজ্বলিত হৃদয় হইতে যে ধূমরাশির উদ্গম হয়, তাহাতে বিচার-শক্তি, হিতাহিত জ্ঞান উভয়কেই আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। প্রত্যেক রিপুরই আপনাপন অনুকূল যুক্তি আছে। তাহার পোষকতায় দশ সহস্র কারণ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অযৌক্তিকতা আচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ বিবিধ বিচিত্রবর্ণও সঞ্জাত হয়, এবং ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে

সকল বস্তুই বিভিন্ন রূপ ও গুণ অবলম্বন করে।

রিপুর এবম্বিধ প্রবঞ্চকতার বিষয় বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বদাই সতর্কতাবলম্বন বিধেয়। ইহার বিশ্ববিমোহিনী শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া কোন বিষয়ে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না হয়, তাহার বিশেষ উপায় দেখা আবশ্যক। সেইকালে তাহার পরামর্শানুসারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই বিজ্ঞোচিত কার্য্য। তখন মনে করিতে হইবেক, রিপু শাসিত হৃদয়-দর্পণে বস্তুর যেরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা কোন রূপেই সঠিক প্রতিরূপ নহে। একটু ধৈর্য্য হইয়া বিবেচনা করিলে সেই ভ্রম নিরাকৃত হইবে, জ্ঞান-প্রভা বিকসিত হইয়া হৃদয়াকাশ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইবে, এবং সকল বস্তুই আপনাপন স্বভাব ধারণ করিয়া নয়নাগ্রে প্রকাশিত হইবেক।

চতুর্থতঃ রিপুর অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে তাহার বিরুদ্ধে সতর্কতাবলম্বন করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক হৃদয়েই রিপু-বিশেষ প্রবল। সেই রিপুর প্রবর্দ্ধন পক্ষে অনুকূল বস্তু বা বিষয় সমস্তকে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেক। ঝটিকার উৎপত্তির পূর্ব্বে উপযুক্ত সতর্কতাবলম্বন বিধেয়। প্রথমতঃ কোন নিরাপদ্ স্থানের আশ্রয় গ্রহণের উপায় দেখিবে, নচেৎ তাহার পরাক্রম হইতে যত্ন পূর্ব্বক উদ্ধার হইতে চেষ্টা করিবে। কোন রিপুর সমুদয় কালে তাহার প্রতিকূল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ বিশেষ শুভদায়ক। যাহাতে হৃদয় রাজ্যকে বিশৃঙ্খল ও দুঃখময় করিয়া তুলে, এরূপ বস্তু মাত্রই উপেক্ষণীয়। এরূপ বিষয় প্রথম অভ্যুদয়-কালে সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং অল্পে অল্পে হৃদয়-ক্ষেত্রে সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া নিদারুণ দুঃখের আকর হইয়া উঠে। নির্দ্দোষ আমোদের বা সুখের বিষয় বলিয়া যাহাতে একবার আনুরক্তি জন্মে, তাহাই পরিশেষে ক্লেশের একশেষ হইয়া উঠে। অধিকাংশ রিপুই উদ্ভব কালে অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহাদের উদয় ও বর্দ্ধন বুদ্ধির এরূপ অগম্য হইলেও যখন একবার আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়, তখন তাহাদের অনিষ্টজনিকা শক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নদীস্রোত বন্ধনীর (১) অভ্যন্তর দিয়া স্বল্প পরিমাণ মাত্র পথমধ্যে প্রবেশ করে। তখন সমুচিত সতর্কতাবলম্বন না করিলে সেই পথ ক্রমেই প্রসারিত হয়, এবং বন্ধনী স্রোতোমুখে তৃণতুল্য ভাসিয়া গিয়া তাহার তেজ বাড়াইয়া দেয়। সেই পরাক্রমে উভয় তীরস্থ ভূমি জল নিমগ্ন ও স্রোতের কুক্ষিগত হইয়া ভয়ঙ্কর প্রলয় ব্যাপার সংঘটন করিয়া তুলে।

যদি আমরা সংসারের অসারতা, জীবনের অনতিদীর্ঘতা, মৃত্যু ও পরকালের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখি, তাহা হইলেও

(১) বন্ধনী—বাঁধ।

রিপু প্রাবল্যের সমুচিত অন্তরায় জন্মিতে পারে। সংসার, পুত্র, কলত্র, বিষয় সম্পত্তি আদি পার্থিব পদার্থ নিচয়কে চিরভোগ্য বিবেচনায় তাহাদের প্রতি মনুষ্য হৃদয় একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠে। দুঃখ, ক্লেশ, জরা, মরণ বিরহিত পারলৌকিক উন্নতির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত বিনশ্বর সুখভোগ কামনায়, একবারে বিরক্তি না হউক, বৈধ ঔদাসীন্য জন্মিতে পারে। এ কথায় অনেকে হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঔষধি স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। পীড়িতাবস্থায় রোগী কত আগ্রহ ও যত্নের সহিত তাহার সেবনে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল আজীবন তৎসেবনেই কাটাইবেন? পীড়ারোগ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে ঔষধি যেরূপ উপকারী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সংসারও সেইরূপ. কিন্তু তজ্জন্যই যে আমরা ধর্ম্ম, নীতি ও যুক্তির অমোঘ উপদেশ রত্নকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কেবল পার্থিব সুখসম্ভোগেই অনুরক্ত থাকিব, এরূপ নহে। সামান্য বনজাত কাচের বিনিময়ে করতলস্থ বহুমূল্য মণি কে পরিত্যাগ করিতে পারে? যে সমস্ত প্রতাপশালী মনুষ্য পৃথিবীকে রুধিরাক্ত কলেবরা ও নরমুণ্ডবিভূষণা করিয়া আপনাপন যশো বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোথায়? তাঁহাদের রিপু পরিচালিত দুরভিসন্ধি ও যশোহভিলাষের চিহ্ন কি ধরাতলে এখনও বিদ্যমান আছে? কালের স্রোত তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের কার্য্যাবলীকেও ধরাতল হইতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। মনুষ্য সংসার-পুণ্যভূমির তীর্থযাত্রী বিশেষ। এক যাইতেছে, এক আসিতেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, তাঁহারা ভ্রমান্ধ হইয়া ও পারলৌকিক চিন্তায় বিসর্জ্জন দিয়া কেবল অচিরস্থায়ী সুখের জন্যই লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহারা বুঝেন না যে, সম্ভবতঃ এই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের অভিনয়াঙ্কের সমাধা হইবে, যবনিকা প্রক্ষিপ্ত হইবে, এবং দ্রষ্টৃবর্গ অপরের অভিনয়-চাতুর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের বিষয় অগাধ বিস্মৃতি সাগর গর্ভে ডুবাইয়া দিবেন। পারলৌকিক জীবন সাগরোত্থিত তরঙ্গের ন্যায় ক্রমাগত সম্মুখীন হইতেছে, আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই উদরসাৎ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কেবল সদসৎ চরিত্রের পরিচয় মাত্র বেলাভূমিতে অঙ্কিত থাকিবে। এই সমস্ত প্রগাঢ় চিন্তাতে মনোহভিনিবেশ করিতে শিক্ষা করিলে হৃদয়ে ধর্ম্মনীতির প্রকৃত ভাব সমুদিত হইবে; অসার, অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখভোগ বাসনায় বিরাগ জন্মিবে, এবং রিপুকুল আত্মবশে থাকিয়া ভূতলবাসী মনুষ্যকে দেবতুল্য চরিত্রে বিভূষিত করিবে।

রিপুগ্রামকে সুশাসনে রাখিয়া অন্তরাত্মাকে সন্তোষের আধার করিবার আর একটী প্রধান উপায় উপাসনা। মনুষ্য

স্বভাব এরূপ অসম্পূর্ণ যে সকল সময়ে চিত্তদৌর্ব্বল্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, তৎ সংশোধন করাত দূরের কথা। সুতরাং সর্ব্বদা ভক্তিচিত্তে পরম পাতার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবে, যেন মনুষ্য সতর্কতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, এবং তাহার চিত্তদৌর্ব্বল্যের সংস্কার করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি তত্ত্বের চির অনুরাগী হইতে পারে। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে স্থির সংকল্প না থাকিলে মানব হৃদয় ধর্ম্ম ও নীতি পথ পরিভ্রষ্ট হইয়া বিপথের পথিক হইবার সম্ভব, এবং পরিশেষে স্মৃতি অতীত দুর্ব্যবহারের বিষয় হৃদয়-দর্পণের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে দারুণ অনুতাপানলে বিদগ্ধ করিতে থাকে। ধর্ম্ম ও জ্ঞানানুমোদিত এই সিদ্ধান্ত বাক্যে অনেকে আপত্য উত্থাপন করিতে পারিলেও একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান বিহীন হৃদয় দুষ্ট রিপুগ্রামের প্রিয় আশ্রয়। অকর্ষিত ও অনুপ্ত ক্ষেত্র আপনা হইতেই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর হিংস্র বন্য জন্তুর আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মনুষ্যচক্ষু তৎপ্রতি নিপতিত হইলে অরণ্যানী পরিষ্কৃত হইতে থাকে, দুষ্ট প্রাণিগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দূরে পলায়ন করে এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা ও প্রাসাদাবলী নির্ম্মিত হইয়া সুখময় নগরীতে পরিণত হইয়া উঠে।

এক্ষণে স্বভাবের বিশুদ্ধতা সম্পাদনসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, বর্ণিত হইতেছে। শুভ বা অশুভাশঙ্কাজনিত মনের উদ্বেগ রিপু শব্দে অভিহিত হইয়াছে। তাহা বিদ্যুদ্‌গতিবিশিষ্ট ও ঝটিকার ন্যায় বেগশালী। ওরূপ উদ্বেগ অকস্মাৎ মনোমধ্যে সমুদিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া পরক্ষণেই নিবৃত্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবটী মনের একটী প্রকৃতিসিদ্ধ চিরস্থায়িনী শক্তি। রিপু স্রোতস্বিনীর পবনহিল্লোল-সন্তাড়িত তরঙ্গমালা, স্বভাব তাহার চিরস্থির স্বভাব সিদ্ধ মন্দবেগ। রিপুসন্তাড়িত মনোভাব যেরূপ সহজে বুঝিতে পারা যায়, স্বভাবের কার্য্যকারিতা সেরূপ সহজে বোধগম্য হইবার নহে। কিন্তু প্রবলতাপরিশূন্য হইয়াও অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারিতাশক্তি থাকাতে ইহার শুভাশুভ কার্য্য সংঘটনকারিণী শক্তি সামান্য নহে। সুতরাং নৈতিক উন্নতির জন্য ইহারও উৎকর্ষ সাধন সম্যক্ প্রয়োজনীয়।

অনেকেই স্বভাবকে প্রকৃতিসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া তাহার দোষ গুণজনিত শুভাশুভ কার্য্যের নিমিত্ত আপনাদিগকে দায়ী বিবেচনা করেন না। (২) এই ভয়ানক সংস্কার হইতে, মনুষ্য যে মন্দ স্বভাব জন্য ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে পারে না, এই

(২) জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
জ্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

মহানিষ্টকর মতের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি এই মত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, ধর্ম্ম-পরায়ণতার জীবনী শক্তির, স্বভাব বিশুদ্ধির একবারে বিলোপ দশা উপস্থিত হয়। মানব হৃদয় যে উৎকর্ষ্য সাধনের সম্পূর্ণ অনুপ-যোগী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা অভি-নিবেশ ও যত্নদ্বারা তাহার অপবিত্রতা সংশোধিত হইতে পারে না, কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন। তবে কোন স্থলে মনুষ্য স্বভাবের যে সংস্কার সম্ভাবনা বিহীন অপবিত্রতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কারণ অমনো-যোগিতা। যদি আমরা অসদভিপ্রায় ও অসৎ প্রবৃত্তি নিচয়ের দমন চেষ্টা না করিয়া তাহা-দের প্রতি নিতান্ত অনুরাগী হই, তাহা হইলে তজ্জনিত স্বভাবের অবিশুদ্ধতার হেতু আপনারাই হইব, এবং ঈশ্বর সমীপে অমার্জ্জনীয় রূপে অপরাধী হইব, সন্দেহ নাই। মনুষ্য সকল বিষয়েই আপনার স্বভাবের পবিত্রতা সংরক্ষণে যত্ন পাইবেন। এই বিষয়ের আবশ্যকতা প্রতিপাদন সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কার্য্য। অতএব এই প্রস্তাব সমা-পন করিবার পূর্ব্বে কেবল ঈশ্বর, সমাজ ও আত্মসম্বন্ধে হৃদয় বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়-তার উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব।

মানব স্বভাব সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহে যত্নবান্ হওয়া অপেক্ষা এই বিষয়ে অধিকতর আয়াস স্বীকার বিশেষ সুফল-প্রদ। অধিকাংশ কপট ধর্ম্মাবলম্বী বাহ্যে ধর্ম্মভান প্রদর্শন করিয়া জন সমাজকে প্রব-ঞ্চিত করে, কিন্তু স্বভাবকে সম্পূর্ণ পাপ পথে সঞ্চালিত করিয়া দারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যে মহাত্মা আপন হৃদয় ভাব সমস্তকে পবিত্রতালঙ্কারে বিভূ-ষিত করিতে পারেন তাঁহার হৃদয়ানন্দ উপ-ভোগের পরিমাণ হইতে পারে না। তাঁহার হৃদয় প্রবাহিত সন্তোষ প্রবাহিণী চিরবেগ-শালিনী এবং পাপময় প্রপঞ্চ জগতে অধি-ষ্ঠান করিয়াও তিনি ভূমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন। সর্ব্বশুভদাতা পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়মন্দিরে চিরবিরাজিত থাকেন এবং সংসারের সমস্ত শুভাশুভ ঘটনাতে তিনি তাঁহারই শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া সন্তোষচিত্তে কালাতিপাত করিতে পারেন।

উপরি উক্ত স্বভাবের বিশুদ্ধতা সম্পা-দনে বিশেষ আয়াস স্বীকার ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই আত্মোন্নতি ও সুখোন্নতির ভিত্তি স্বরূপ। এই দুঃখময় সংসারের বিবিধ কঠোর বিষয় ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকিয়া যে মনের উদ্বেগ ও বিরক্তির সঞ্চার হয়, তাহাকে বিদূরিত এবং মনুষ্যকে কর্ত্তব্য বিষয়িণী ন্যায়পরতার অভ্যাসে সক্ষম করে।

সমাজ সম্বন্ধে হৃদয় বিশুদ্ধতার আবশ্য-কতা প্রতিপাদন করিতে গেলে দেখা আব-শ্যক যে, এই পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডল একটী গৃহ স্বরূপ। ইহাতে যে সমস্ত লোক অধি-বাস করে, তাহারা সকলেই এক পরিবারস্থ

ও ভ্রাতৃসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজমধ্যে সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও অন্যের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সুখে অবস্থান করিতে হইলে শান্তিপ্রিয়তার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বিনয়, সৌজন্য ও সামান্য কারণে কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছাই এরূপ শান্তিপ্রিয়তার প্রধান অঙ্গ। বিবাদ অপরিহার্য্য হইলেও উপযুক্তরূপ সাম্যতা রক্ষা একান্ত আবশ্যক। এরূপ স্বভাব চিত্তসুখসম্ভোগের প্রধান উপায় এবং সমাজের সুখ ও সুশৃঙ্খলার মূল ভূমী। অভিমান ও বিরোধপরতন্ত্র লোক মাত্রেই সমাজের প্রধান কণ্টক। এই সংসারে যে পরিমাণে সন্তোষ ভোগ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত তাহারা তাহার উচ্ছেদ সাধনে সুতৎপর। কিন্তু তাঁহারা যে পরিমাণে আত্মসুখ-সন্তোগের অন্তরায়, অন্যের পক্ষে সেরূপ নহে। যে প্রবল ঝটিকা তাঁহাদের অন্তরে সমুদিত হয়, তাহাতে জগতের সাধারণ অনিষ্ট সাধন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নিজেরই বিশেষ ক্ষতি সাধন করে, এবং অবশেষে তাঁহাদিগকে বিনাশের কুক্ষিগত করিয়া প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে।

শান্তিপ্রিয়তার ন্যায় হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন পক্ষে সারল্যও বিশেষ উপযোগী। সারল্য অর্থাৎ সকলের কার্য্য ও চরিত্র সুন্দর ও অপক্ষপাতী চক্ষে দর্শন করা মনুষ্য হৃদয়ের সুমহৎ গুণ। হিংসা ও সন্দিগ্ধচিত্ততায় অন্যের সকল কার্য্যেই যেমন মন্দ অভিপ্রায় সংগ্রহ করে, এবং সকলের চরিত্রে কলঙ্ক দর্শন করে, প্রোক্ত সদ্গুণাবলী তাহা করে না। অন্যের সহবাসে অথবা নিজে সুখভোগের অধিকারী হইতে গেলে এই সমস্ত সদ্গুণের উপার্জ্জন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সারল্যাদি সদ্গুণাবলী সর্ব্বদা ন্যায়ের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে, এবং অন্যের দোষ দর্শনেও মন্দ অভিপ্রায়ের কল্পনা করে না। সুতরাং লোকে সন্দিগ্ধ হৃদয়ের অযথা উদ্বেগজনিত যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সমাজমধ্যে সকলেরই প্রণয়ভাজন হইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

স্বভাব বিশুদ্ধির জন্য শান্তিপ্রিয়তা ও সারল্যই কেবল প্রচুর নহে। দয়া, বদান্যতা, মহানুভাবুকতা ও সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্গুণাবলীও বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে হিংসাকুলিত সংকীর্ণহৃদয় আত্মস্বার্থান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত, অন্যের সুখ সম্পদ সন্দর্শনে বিদগ্ধনেত্র এবং তাঁহাদিগকে দুঃখ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখিয়া প্রফুল্ল হৃদয় হইয়া থাকে, তাহার সহিত তুলনা করিলে প্রোক্ত সদ্গুণালঙ্কৃত, পুণ্যবারি সম্প্লুত হৃদয় কেমন স্বর্গীয় প্রভাশালী ও মনোহর দেখাইয়া থাকে। যে সুপবিত্র বিমল সুখ মনুষ্যকে পরস্পর সদ্ভাব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, তাহার মূল কারণ সরলতা।

অনেকের বিশ্বাস যে, অবস্থা এবং অবসর

অভাবে বদান্যতা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবার নয়। সত্য বটে, তাহা সহজে ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। লোকের অবস্থা এবং অবসর সকল সময়ে সুপ্রসন্ন থাকে না। কিন্তু মনুষ্যের সামান্য বিষয় ব্যাপার সম্পাদনে প্রতিদিন এরূপ সহস্র ঘটনা ঘটিতেছে, যাহাতে তাহাদের মনের উদ্বেগ শান্তি ও সুখসাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে অনায়াসে পারা যায়। হয়ত এরূপ সুবিধামত বদান্যতা বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন বহু-ব্যয়সাধ্য না হইতেও পারে। অতএব অবস্থা বা সুবিধার মুখাপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাপেক্ষা সাধ্যমত পরোপকার করিয়া জীবনকে সার্থক করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে হয়ত, আমাদের সমস্ত জীবন নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, কোনও সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান সংসাধিত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ গার্হস্থ্য জীবনে আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও স্বজনগণের সহিত ব্যবহারে সদ্বৃত্তি সমূহের চরিতার্থতা সম্পাদনের বিশেষ সুবিধা ও অবসর আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় যে, ঐ স্থলে লোকে রিপু ও মন্দ স্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, উহাই হৃদয়-পবিত্রতা রক্ষার ও মন্দ বা দূষিত স্বভাবের ঔৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত স্থল। কারণ গৃহই স্বভাব সংগঠনের আদি ভূমী, এবং তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার নিকষস্বরূপ। মনুষ্য সমাজ মধ্যে আপন স্বভাব সংগোপন করিতে সুনিপুণ। কিন্তু গৃহমধ্যে, আত্মীয়, পরিবারবর্গের সহিত ব্যবহারে তাহা সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব সাধারণ সমাজ-মধ্যে যাহাতে নির্ব্বিবাদে, সরল ও সুহৃদ্‌ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে আত্মস্বভাববিশুদ্ধতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বিনয় সমস্ত সৎস্বভাবের আদি কারণ। বিনয় শব্দে আত্ম-মর্য্যাদা-বোধশূন্য চাটুকারিতা বুঝায় না; ইহার ধর্ম্মনীতি সঙ্গত অর্থ আত্মাভিমান শূন্য নিরহঙ্কৃত মনোভাব। যিনি আপনার মর্য্যাদা ও ধনৈশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য সন্দর্শনে অন্যের সহিত ব্যবহারে গর্ব্বান্ধ হইয়া পড়েন, তিনি আপনার জন্য নিন্দা, তাচ্ছিল্য, ও তদানুষঙ্গিক অনুতাপ ও মনোদুঃখ সঞ্চয় করিয়া রাখেন। কিন্তু যিনি বিনয় ও নম্রতা গুণে আপন হৃদয়কে বিভূষিত করিতে পারেন, তিনি সমাজ মধ্যে সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সকলের অনুরাগভাজন হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ এই গুণটী আত্মপ্রসাদ লাভের প্রধান উপায়। ইহা না থাকিলে লোকে আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন না ও সমাজ মধ্যে কদাচই ন্যায়ের সহজ পথে পাদ বিক্ষেপ করিতে পারেন না। দুর্বিনীত ব্যবহার দুষ্টব্রণবিশেষ। ইহাতে কালে হৃদয়ের সমস্ত সদ্ভাবনিচয়কে

বিকৃত করিয়া জীবনকে সংশয় পথে আনিয়া ফেলে। আত্মাভিমান ও অহংকারকে পরাজিত করিতে পারিলেই এই গুণটী সহজে অর্জ্জিত হইতে পারে। প্রোক্ত রিপুদ্বয় জ্ঞান-চক্ষুর কামল রোগ বিশেষ; সমস্ত পদার্থই উহার নিকট বিবর্ণ প্রতিভাত হয়। বিনয় ও নিরহঙ্কার ঐ ব্যাধির মহৌষধি। অতএব এই সদ্‌গুণ দুইটীর উপার্জ্জন সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। অধিকন্তু ইহারাই চিত্তপ্রফুল্লতার অনন্ত উৎস। চিত্তপ্রফুল্লতা ও আমোদ দুইটী পৃথক্ পদার্থ। প্রফুল্লতা হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণ, আমোদ অলীক ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা-সুখ সমুদ্ভূত হৃদয়ের প্রবলবেগ। ইহা কাদম্বিনী সমুদ্ভবা সৌদামিনীর ক্ষণপ্রভা; চিত্তপ্রফুল্লতা সুনির্ম্মল শারদ-পূর্ণ-চন্দ্রমার সুবিমল কিরণমালা। নির্ব্বুদ্ধিতা ও পাপ প্রবৃত্তি আমোদের প্রসূতি; ইহার অন্তিম ফল অনুতাপ, রোগ, শোক, দারুণ দুঃখাদি হৃদয় যন্ত্রণা। ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান চিত্ত-প্রফুল্লতার পবিত্র উৎস; ইহাতে মানব জীবনের অনন্তসুখ নিরন্তর প্রবাহিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরে ভক্তি, সমাজে শান্তি-প্রিয়তা, সারল্য, বদান্যতা ও সৌজন্য এবং আত্মসম্বন্ধে বিনয়, সন্তোষ ও প্রফুল্লতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাসে সফল-প্রযত্ন হইতে পারিলেই রিপু দমন ও স্বভাবের বিশুদ্ধতা সম্পাদন, অতি সহজ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এবং তাহা হইলেই মনোবৃত্তি সমূহকে জ্ঞানের অনুশাসনে রাখিয়া মনুষ্য সুখসাগরে চির সন্তরণ করিতে পারেন। বিষয় কার্য্য সমাধা ও ধনোপার্জ্জনের দারুণ যন্ত্রণাকর বাসনার সহিত এইরূপ নৈতিক উন্নতি সাধনের বাসনা বলবতী থাকিলে লোকের এবং জগতের সুখের পরিসীমা থাকে না। এবং ইহা কার্য্যতঃ সুসিদ্ধ হইতে পারে, ধর্ম্মাত্মা মহোদয়গণের অন্তর্নিগূঢ় কামনা। বিষয়, বিভব, ধন প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব পদার্থে শোক দুঃখময় সংসারে মনুষ্য জীবনকে প্রকৃতরূপে সুখী করিতে পারে না। বিষয় ক্ষয়, বিভবের নাশ, ধনের অপব্যয় ও অনিষ্টকারিতা ও পুত্র কলত্রাদির বিয়োগ-জনিত দারুণ শোকানল মধ্যে মধ্যে হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিয়া তাহাকে অসুখ-সাগরে নিমগ্ন করে, এবং তখন ধর্ম্মনীতির অবহেলন জনিত নিদারুণ অনুতাপ অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠে। তখন নিতান্ত অসময় বলিয়া আর তাহার উন্নতি সাধনে ততদূর ঔৎসুক্য জন্মে না এবং অনন্তর মহান্ মনোকষ্ট জীবনাঙ্কের শেষ, দুঃখজনক অভিনয় প্রদর্শন করিয়া ইহ জগত হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের সমুচিত সমুন্নতি সাধন করিতে পারিলে সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদ্ ও সকল অসুখের তীব্র শক্তির সম্মুখে ধৈর্য্য ধারণ করিবার শক্তি জন্মে এবং বিমল সুখ ও সন্তোষ হৃদয়ে চির অধিকার স্থাপন করে।

শ্রীউঃ—

একান্ন পদ।

সুবিস্তীর্ণ পৃথ্বীতলে আমাদের বিবেচনায় সত্য, দয়া, সরল-চিত্ত কাব্য, রমণী, প্রণয় ও কুসুম এই সাতটি পদার্থ উৎকৃষ্টতম।— আর যত কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা কখনই ইহাদের সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই সাতটির অভাব হইলে মানবপ্রীতি কোন রূপেই প্রকৃতরূপে চরিতার্থ হইতে পারিত না ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কাব্যের যে কি পর্য্যন্ত চিত্তমোহিনী ও প্রীতিবর্দ্ধিনী শক্তি, তাহা রসগ্রাহী ব্যক্তির নিকট প্রকৃষ্ট রূপে পরিচিত। এই জন্যই "সুকবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং"; "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কথা গুলি উচ্চারণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। এই রূপ সত্য, দয়া প্রভৃতিও এক একটী অমূল্য রত্ন। তাই বলিতেছি যে. এই সাতটির অভাব হইলে মানব-প্রীতি কোন রূপেই প্রকৃত রূপে চরিতার্থ হইতে পারিত না। যা হউক, কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, অতএব গোবিন্দদাস কবিরাজ বিরচিত "একান্নপদ" ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

গোবিন্দদাস কবিরাজ বা গোবিন্দদাস ঠাকুর মহাশয়কে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডিদাসের সহিত সম শ্রেণীস্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শেষোক্ত কবিদ্বয় সাধারণের নিকট উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত কবি বলিয়া যে রূপ আদরণীয় প্রথমোক্ত কবিও তাহাই। ইহার রচিত অনেক গুলি ভাব রস গুণ ও সুকবিত্ব সম্বলিত পদাবলী আছে। বঙ্গীয় পূর্ব্বতন কবিগণের মধ্যে অনেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতেন এবং ঐ লীলাতে নক্ষত্রভূষিত সুনীল নভস্তল বিরাজিত চন্দ্রের ন্যায় প্রণয়ের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করাই তাঁহাদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কার্য্যেও তাহা পরিণত করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তির সহিত উপাস্য দেব দেবীর প্রণয় চিত্রিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পূর্ব্বতন কবিরা সভক্তি সেই রূপ চিত্র করাতে তাঁহাদিগক কে না অসাধারণ বলিবে? আবার তাঁহারা দেবচরিত্রকে কেমন মানব-চরিত্রে আনিতে পারিতেন, তাহাও তাঁহাদিগের পদাবলীর মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক, তদানীন্তন বঙ্গীয় কবিগণ বিশিষ্টরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন। গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়িণী পদাবলী পাঠ করিলে পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ প্রশংসাবৃত্তি কবিকে মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করে। গোবিন্দদাস বিরচিত "একান্ন পদ" ব্যতীত "গীত চিন্তামণি" "পদকল্পতরু" "পদকল্পলতিকা" প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের কাব্য গ্রন্থে তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট পদাবলী সংগৃহীত আছে। কিন্তু লিপিকরদিগের ভ্রম, প্রমাদ ও

স্বেচ্ছাচারিতা-বশতঃ সেই সকলের কতক কতক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। আবার কোন কোন ব্যক্তি আত্মরচনা আদরণীয় হইবে বলিয়া কোন কোন উৎকৃষ্ট কবির ভণিতা দিয়া থাকে। সুতরাং এই সকল কারণ-বশতঃ প্রকৃত কবির স্বীয় লেখনীপ্রসূত সুকবিত্বের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। আমরা কাশীরামদাসের বিরচিত মহাভারতের প্রাঙ্-মুদ্রাঙ্কন এবং পরমুদ্রাঙ্কন দেখিয়াছি, উভয়ে সুবর্ণ পিত্তলের ন্যায় বোধ হয়। সভাপর্ব্বের শেষে যে স্থলে কুন্তী পুত্রগণকে এবং পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া বিলাপ করিতেছেন, সেই স্থলে দ্রৌপদীর প্রতি তিনি সাতিশয় দুঃখ সহকারে যে কথাগুলি বলিতেছেন, তাহা শুনিলে কত দূর চিত্ত দ্রব হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। সেই স্থানটি লঘুচতুষ্পদীতে রচিত এবং সরল ও সুকবিত্ব সম্পন্ন। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় সেই স্থানটির ছন্দ ও প্রায় সমুদয় ভাব সঙ্কলন করিয়া তদীয় বিদ্যাসুন্দরের বকুল বৃক্ষের মূলে নাগরীগণের সুন্দর দর্শন স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কাশীরামের ও ভারতচন্দ্রের ঐ দুইটী স্থল এখানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়কে প্রদর্শন করি, কিন্তু এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যানুসারে তাহা করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয় স্বয়ং তাহা মিলাইয়া দেখিবেন। আমরাও সময় ও প্রস্তাবান্তরে তাহা দেখাইব। যাহা হউক, কাশীরামের পূর্ব্বমুদ্রাঙ্কিত মহাভারতের সহিত তদীয় বটতলার নবমুদ্রাঙ্কিত মহাভারতের ঐ স্থানটি মিলাইয়া দেখিলে অতি মাত্র দুঃখিত ও বিস্মিত হইতে হয়!—সে ছন্দ নাই—সে সরল বাক্যবিন্যাস নাই—সে সুকবিত্ব নাই! সকলই অন্যতর। এই রূপ সকল স্থলেই লিপিকরের প্রমাদে ও বিশেষতঃ স্বীয় রচনাশক্তির দোষে নীরস এবং কদর্য্য রচনা ঘটিয়াছে। সুতরাং গোবিন্দদাসকেও লিপিকরদিগের জালে পড়িয়া জ্বালাতন হইতে হইয়াছে। এই জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অতি অল্প লিপিকর ব্যতীত তাবৎকেই ঘাতক বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, সুলেখকের লিখনের উপর হীন-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করা আর তাঁহার প্রাণ নষ্ট করা উভয়ই সমান। লিপিকরদিগের দোষে পূর্ব্বতন প্রায় সকল বাঙ্গালাকাব্য গ্রন্থই ভিন্নাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের "একান্ন পদ" একান্নটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদময়। বিদ্যাপতির ব্রজভাষানুজাত পদাবলীর ন্যায় ইহাও রচিত। অল্প-সংখ্যক কথা ব্যতীত ইহার সকল কথাই ব্রজভাষা ও হিন্দীমিশ্রিত। বোধ হয়, তদানীন্তন রুচি ও শ্রুতিমাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য জন্যই এইরূপ ভাষাতে কবিতাবলী লিখিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কবিতা অন্যতর। আবার পরে এখনও হইতে পারিবে যে, "আমাদের বহু পরবর্ত্তী সময়ে এক্ষণকার কবিতা অন্য প্রকার ছন্দে ও বাক্যবিন্যাসে পরিবর্ত্তিত হইয়া

যাইবে।—সকল দেশের সকল ভাষারই পরিবর্ত্তন ঘটনা নিবন্ধন রচনারত রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। স্পেনসারের কবিতা সমূহের সহিত ইদানীন্তন বায়রন্ প্রভৃতির কবিতার পার্থক্য তাহার নিদর্শন দেখা যাইতেছে।

গোবিন্দদাস তদীয় একান্ন পদের একান্নটি কবিতায় রাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপার মানবচিত্রে সংক্ষেপতঃ অঙ্কিত করিয়াছেন। এবং তদানুষঙ্গিক আরও কতকগুলি চিত্র সাজাইয়াছেন।—একান্ন-পদ পাঠ করিতে করিতে কবির চিত্রগুলি ঘটনা সমেত নৈসর্গিক বলিয়া ভ্রম জন্মে। বৃন্দাবনের গ্রাম্য শোভা যেন নয়ন সম্মুখে চিত্রিত রহিয়াছে, এবং প্রকৃতি যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। প্রত্যহ মানব সমাজে যেরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, এবং প্রত্যহ প্রকৃতি যে-রূপ মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণে বিরাজকরে, তাহা গোবিন্দদাসের ক্ষুদ্র একান্নপদের প্রতিপদেই দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা তাঁহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।—

কবি প্রভাত বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

" নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই
জাগলি রসবতী রাই।
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতঁহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতঁহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান॥"

অন্যত্র রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ;—

" শারী শুক পিক কপোত ঘন কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরকো লোক যব জাগি বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কি না জানসি রীত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চল সুন্দরী
বিঘটন কানুক পীরিত॥"

উল্লিখিত কবিতায় কবি গুপ্ত প্রণয়ের কেমন সুন্দর চিত্র করিয়াছেন। পাছে কোন গুরু-জন তাঁহাদের অপ্রকাশিত অথচ অবিচ্ছিন্ন প্রণয়ালাপ জানিতে পারে, সেই জন্য রাধিকা ভয়চকিত চিত্তে প্রভাত হইবা-মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সরিয়া পড়িতে কহিতে-ছেন। দৃশ্যটি কেমন স্বাভাবিক হইয়াছে, পাঠক তাহা স্বয়ং নিরীক্ষণ করুন।

কবি তৎপরেই আবার কেমন চতুর-তার সহিত মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন। রাধাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যাইতে ইচ্ছা নাই অথচ না গেলেও নয় ; সুতরাং অনিচ্ছা বশতঃ কষ্টসহকারে প্রিয়তমার নিকট তাঁহার বিদায় প্রার্থনা এবং শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জ হইতে বিদায় দিয়া রাধিকার গোপনে শয়ন মন্দিরস্থ শয্যোপরি গমন করা এবং সখীদের দ্বারা জাগরিত হওয়া কেমন মনোহর ;—

" বেশ বনাই বদন হেরইতে পদতলে
পড়ু বারে বার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি বহে নিজ তনু
নহে আপনার॥

বিনোদিনী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব
দিনকর করল পয়ান ॥
কানুক চিত থির করি সুন্দরী
কুঞ্জ সোঁ গহনহি কেল।
বসনহি বারি ঝাঁপি মণি মঞ্জীর
নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতন শেজোপর বৈঠলি সুন্দরী
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥"

কবি আর এক স্থলে প্রভাতের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন ;—

"গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহ নিজ কাজ সমাপন যান ॥
কো সখী দধি মন্থন করু যাই।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাই ॥
কোই সখী গুরুজন সেবন ফেলি।
কনক কুম্ভ লেই কোই চলি গেলি ॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘরে বাহির করত বহার ॥"

কবি আর এক স্থলে প্রভাত কালে রাধাকে না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তচাঞ্চল্য বর্ণন করিয়াছেন ;—

"কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী শুক পিক মধুরিম ভাষ ॥
গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল।
মধু লোভে মাতি আনন্দে বিভোল ॥
তাহি সুগমন করি বিদগধরাজ।
রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিসলয় পুঞ্জে ॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়ান ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
দিগ নেহারই গোবিন্দদাস ॥"

কবি আর দুই স্থলে মধ্যাহ্ন ও গোধূলি সময় এইরূপ আঁকিয়াছেন ;—

"সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরত যমুনাক তীর।
প্রিয়দাস শ্রীদাম সুবল মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর ॥
বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজত
আনন্দে চরত সব ধেনু ॥"

"গোখুর ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘন হাম্বারব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিশাল নিশান সমাকুল
সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব ॥
বনসে গিরিধরলাল ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥"

পাঠক! উল্লিখিত দ্বিতীয় কবিতাটির শেষে উপমাটি কেমন সুন্দর। একান্নপদের অনেক স্থানে ভাল ভাল উপমালঙ্কার আছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ।
তমলে বিথারল মোহিত রঙ্গ ॥"

" দোহুঁজন মিলল উপজল প্রেম।
মরকতে যৈছন বেড়ল হেম ॥
কনক লতাবলী অরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পায়ল সঙ্গ।"
" দুহুঁ জন মিলন ভেল।
রসময় রসিক রমণ রসে নাগর
বহুবিধ কৌতুক কেল ॥
মদন মহোদধি নিগমন দুহুঁ জন
ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ।
তরুণ তমালে কনক লতাবলী
নব জলধর কিয়ে ঝাঁপল চন্দ ॥"
" শ্রীরাধা মাধব দুহুঁ তনু মিলল
উপজল আনন্দ কন্দ।
কনকলতাবলী তমালে বেঢ়ল
জনু রাহু ধরিলহি চন্দ ॥
জনু কমলে ভ্রমরা রহুমাতি।
জলদ কোরে কিয়ে তড়িত লতাবলী
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি ॥
নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন যোড়ল
ঝামরু ভেল মুখ জ্যোতি।
শ্রম ভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুরত
যৈছন জলদে বিথারল মোতি ॥"
" দুহুঁ দুহুঁ অধরে করয়ে মধুপান।
চান্দ চকোর জনু মিলায়ল আন ॥"
" কতহু যতন করি বিহি নিরমায়লি
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকসিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥"
" বিকসিত কুসুম " ইত্যাদি উপমাটি কতদূর উৎকৃষ্ট ও গভীর ভাবপূর্ণ, পাঠক, তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখুন।

গোবিন্দদাসের
" নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃতি মণি কুণ্ডল দোলনি হেরইতে
চমকি পড়য়ে কত কাম ॥"
কবিতাংশ দেখিলে জয়দেবের
" কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত-
গণ্ডযুগস্মিতশালী ॥"
" চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডক-
মণ্ডলবলয়িতকেশং ॥"
কবিতার্দ্ধ দ্বয় মনে পড়ে।

পাঠক, আর দুইটী উপমা দেখুন ;—
" দুহুঁ জনে সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিগে চাঁদ হেরি রহি গেল ॥
নীল গিরি বেঢ়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরিমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥"

গোবিন্দদাসের কৃত রূপবর্ণনাও চমৎকার ;—
" অঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজর বয়ান ॥
দশনক জ্যোতি মতি নহি সমতুল
হসইতে খসই মণি জানি।
কাঁচা কাঞ্চন বরণ নহে সমতুল
বচন জিনিয়া পিকবাণী ॥
পদতল থলকমল সুকোমল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ সুন্দরী
জিতল মনমথ রাজে ॥"

আবার বেশ বর্ণনাও দেখুন ;—

" সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গোধূলি ধূসর অঙ্গ॥
নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক, বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃতি মণিকুণ্ডল দোলনি হেরইতে
চমকি পড়য়ে কত কাম॥
বনফুল মাল বিরাজিত উরুপর কিঙ্কিণী
রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহুঁ জগমনোমোহন
ব্রজ রমণীগণ হেরি মনো ভায় "॥

অন্যত্র ;—

" হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলক দেই সিঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
মাধব সিন্দূর দেয়লি সিঁথে।
কতহু যতন করি উরপর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল
উরপর দেয়লি হার।
তাম্বূল সাজি বদন ভরি দেয়ল
নিছই তনু আপনার॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে জাবক লেখাই
কি কহব দাস গোবিন্দ॥"

অন্যত্র আর একটি আনুপ্রাসিক বেশ বর্ণনা ;—

" গজবর গতি জিনি গমন সুমন্থর
চাঁদ জিনিয়া মুখজ্যোতি।
কবরী বিরাজিত মণিময় সুরচিত
সিঁথে উজারল মোতি॥
নীলবসনমণি বলয় বিরাজিত
উচকুচ কঞ্চুকভার।
শ্রবণহি টাটক মণিময় হাটক
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমল তল আতুল রাতুল
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে ওরূপ হেরইতে
ভুলল বিদগধ রাজে॥"

ঐরূপ আনুপ্রাসিক উপমা আর একটি দেখুন ;—

" সম বয় বেশ কেশ পরিমণ্ডল
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগ মনো ভোর॥
বলয় বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপুর রুণু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নিতি ঐছন
বিহরত বিদগধ রাজে॥"

অধুনাতন কবিরা রূপ বেশাদি বর্ণনা সময়ে প্রায়ই বিদেশীয় অনুকরণে হস্তক্ষেপ করিয়া দেশের অনুরূপ রূপাদি বর্ণনের ব্যতায় করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ দেশের অনুরূপ প্রকৃত রূপাদির বর্ণনাই করিতেন। উল্লিখিত বর্ণনাগুলির মধ্যে তাহা বিশেষরূপে দৃষ্ট হইতেছে।—ফল কথা তদানীন্তন কবিকুল

বর্ণিত নায়ক নায়িকাকে অধুনাতন কবিগণ চিত্রিত নায়ক নায়িকাদের সহিত মিলাইয়া তুলনা করিলে এক দেশের বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। নীচের কবিতা দেখিলেই তাহা পরিলক্ষিত হইবে ;—

গোবিন্দদাস যে কয়টি স্থলে স্বভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। নিম্নে কয়টি উদ্ধৃত করা হইল ;—

" গোঠ মাঝহি করল পয়ান।
গোধন দোহন করতহিঁ কান ॥
ঘন ঘন হাম্বারব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব ॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ।
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ ॥
গোধন গরজত বড়ই গভীর।
ঘন দোহন করত যদুবীর ॥
গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ ॥
মটকী মটকী ভরি রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি ॥"

" বংশীবট-তট কদম্ব নিকট
মণিকর্ণিক ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলি কদম্ব কুসুম বন
সুশীতল কুণ্ডক তীর ॥
কালিন্দী পুলিন বৃন্দাবন
ঘন নিধুবন কেলি বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জবন গোবর্দ্ধন কানন
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস ॥"

" নব নব কাননে শোহন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুমে শোভিত পুঞ্জ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক বোলত রসাল ॥"

অত্যুৎকৃষ্ট কবি না হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ গুণসম্পন্ন প্রেম বর্ণন করা অন্যের সম্ভবে না। অশ্লীলতা দোষ থাকিবে না ; অথচ পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট প্রণয়চিত্র যে কবির লেখনী তুলিকা হইতে প্রসূত হইয়া মানব-চিত্তকে রসিত ও মোহিত করিতে পারে, আমরা সেই কবিকেই শ্রেষ্ঠ কবি কহি। একান্ন-পদের কবির উৎকৃষ্ট প্রেমচিত্রগুলি অবলোকন করিলে কে না তাঁহাকে প্রণয়ের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধায়ী অতি উৎকৃষ্ট কবি বলিবে? ফল কথা, গোবিন্দদাস কৃত প্রেম-চিত্র অমূল্য। আমাদের কথা মিথ্যা কি সত্য, পাঠক, নিম্নে অবলোকন করিলেই জানিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার প্রথম দর্শনে পরস্পরের কিরূপ সুন্দর প্রেমোচ্ছ্বাস ;—

" নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজল
দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর।
প্রেমরতন ধন দোঁহে দোঁহা পিয়াওল
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর ॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন
শিথিল পীত পটবাস।"

আর এক স্থলে সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী জলক্রীড়া করিতেছেন ;—

" সখীগণ মেলি দোঁহে করল পয়ান।
কৌতুকে কেলি কুণ্ড অবগান ॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি ॥

বিথারল কুণ্ডল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥
সখীগণে বেঢ়ল নাগর চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্ধ ॥"

আর এক স্থলে ;—

"পূরল মনোরথ বৈঠল তাই।
বসন ঢুলায়ত বিনোদিনী রাই ॥
রসময় নাগর রসময়ী গোরী।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি ॥"

অন্যত্র শ্রীমতীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব ;—

"হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে ॥
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই-প্রেম-জলে ভাসল রে ॥
মুরছি অবনীতলে পড়ল রে।
অরুণিম লোচন ঢর ঢর রে ॥
অঙ্গ পুলকে অতি পূরল রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে ॥"

পাঠক, আবার ৩টি প্রণয় দেখুন ;—

"সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত কত গায়ত মদন তরঙ্গ ॥
কোই বাজায়ত যন্ত্র রসাল।
কোই কোই নাচত কোই ধরে তাল ॥
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখ হরিখি পুন পুন করু কোর ॥
বাঢ়ল প্রেম সবহু সখী জানি।
সুবাসিত কুসুমে শেজ (শয্যা) বিছায়নি
আনি ॥"

আর এক স্থলে রাধিকা নিশীথ সময়ে অভিসারিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাইতেছেন, কবি সে স্থানটির সবিশেষ চমৎকারিত্ব ও ভাববৈচিত্র রাখিয়াছেন ;—

"গুরুজন পরিজন ঘুমায়ল জান।
সময় জানি ধনী করল পয়ান ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বর কান।
দারুণ মদন গায়ল সমাধান ॥
দুহুঁ দুহুঁা অধরে করয়ে মধুপান।
চান্দ চকোর জনু মিলায়ল আন ॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান ॥"

"তনু তনু" ইত্যাদি পদার্দ্ধটীতে প্রণয়ের কেমন উজ্জ্বল ভাব প্রকাশিত হইতেছে!

পাঠক, আর একটী মনোহর প্রণয়-চিত্র দেখুন ;—

"নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত
দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর।
প্রেমরতন ধন দোঁহে দুহুঁা পিয়াওল
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর ॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন
শিথিল পীত পটবাস।"

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে দেখিলে যেরূপ অসীম আনন্দিত হইতেন—প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিত, রাধিকারও কৃষ্ণদর্শনে সেইরূপ। কিন্তু পরস্পরে পরস্পরকে ক্ষণকাল মাত্র না দেখিলে অতিমাত্র ক্লেশ পাইতেন। বাস্তবিক প্রণয় মিলন একবার ঘটিলে, তাহার বিচ্ছেদ অত্যন্ত কষ্টকর। প্রণয়ী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত। নিম্নের

দুইটী পদ দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অদর্শনে ক্ষিপ্তের ন্যায় কি পর্য্যন্ত ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়াছেন। কবির এই দুইটী পদের কথায় কথায় প্রকৃতি বিরাজিত রহিয়াছে ;—

" আনহু ছল করি সুবল করে ধরি
গমন করল বনমাহ।
তরু সব হেরি কুসুম তঁহি তোড়ল
যতনহি হার বনাহ॥
মাধব কণ্ডুক তীর।
সুন্দরী মনে করি ভাবই পথ হেরি
কাতরে মন নহে থির॥"

" নব নব পল্লব শেজ বিছায়ল
নব কিসলয় তঁহি রাখি।
কুসুম তোড়ি চিত ভেল আকুল
হেরইতে অথির ভেল আঁখি॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ তনু দগধল
জর জর শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দদাস পহুঁ সুবল কোরে রহুঁ
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥"

আর এক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সহসা শ্রীমতীকে দেখিয়া স্বকার্য্য বিস্মৃত হইতেছেন। এটীও কি সামান্য স্বাভাবিক গুণ বিশিষ্ট ?

" রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামরু নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্দ বিনা ধবলী দোহত
বাছিয়া (বৎস) করহি কোর॥
শুনহি (শূন্যে) দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি
হেরি হাসত ব্রজনারী॥
লাজহি লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুনঃ লই ছান্দন ডোর।
ধবলী ভরমে ধবল পদ ছান্দই
গোবিন্দদাস মনো ভোর॥"

আর এক স্থানে গোবিন্দদাস একটী মনোহর ও স্বভাবব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত নিশি জাগরণ করিয়া রজনী প্রভাত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি স্বগৃহে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, কেহ যেন তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয় জানিতে না পারে। অসম্পূর্ণ নিদ্রোত্থিত হইয়া সহসা অন্ধকারে স্বালয়ে আসাতে তাঁহার শরীর ও বেশভূষার অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া গেল। সেই অবস্থায় তিনি গোপনে শয়ন করিলেন। কিন্তু প্রভাতে তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, অপরে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিত, তাঁহার জননী যশোদা তাহা না বুঝিতে পারিয়া বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ;—

" রামকে নীলবসন কাহে পিন্ধ।
অরুণ উদয় ভেল, না ভাঙ্গল নিন্দ॥
ব্রজকুল চাঁদ নিছনিয়াঙ তোর।
অঙ্গ বিভঙ্গ কতহুঁ তনু মোর॥
ফাগু ভবন কিয়ে লোচন জোর।
কাঁহা লাগয় হিয়া কণ্টক আঁচর॥
ঝামরু ভেল নীল উৎপল দেহ।
না জানি পাপ দিঠি দেহল কেহ॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ।
তবহুঁ ভঞ্জাব দধি ওদন এহ॥"

এই বার আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলী সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পূর্ব্বতন রাধাকৃষ্ণ প্রেমবর্ণন চতুর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীগুলি গীত বা কীর্ত্তিত হইবার জন্য রচিত হইত। সেই জন্য তাঁহাদের পদাবলীগুলি গীত বা কীর্ত্তন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অধুনা বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ারা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সকল পদাবলী গীত হইবার জন্য কালানুযায়ী রাগ রাগিণীতে নিবদ্ধ করা হইত। সুতরাং "একান্ন পদের" আদ্যন্ত রাগ সম্বলিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি এবং নিশান্তক এই অষ্ট সময়ে একান্ন পদ পঠিত বা গীত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে "অষ্ট কালীয় একান্ন পদ"ও বলা হয়।

তদানীন্তন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ প্রেমজগতের যে রূপ উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, অধুনার বঙ্গ কবিদের সে রূপ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এক্ষণে সে রূপ জীবন্ত প্রেমবর্ণনের উপযুক্ত কবি নাই—উপযুক্ত ক্ষমতা নাই—এবং উপযুক্ত অমৃতমুখী লেখনীও নাই, ইহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করি। বাস্তবিক বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির মানস-প্রস্রবণ-নিঃসৃত প্রেমসুধা পান করিয়া এক্ষণকার কবিদের কৃত প্রেমরস পান করা যেন অমৃত পানের পর মাৎগুড়ে রসনাকে লিপ্ত করা হয় বলিয়া বোধ হয়। ফলকথা এই যে, বঙ্গীয় পূর্ব্বতন বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় নিখুঁত প্রেমচিত্র করা আধুনিক বঙ্গের কেন, পৃথিবীর মধ্যে সে রূপ কবি অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ এ বিষয়ে আমাদের গৌরব স্থল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির ন্যায় কবি সকল দেশে সকলেরই প্রার্থনীয়। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, ইউরোপীয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের অহঙ্কার ভূমি কালিদাস, জয়দেব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিবর্গের গ্রন্থাবলী যেমন স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, সেই রূপ বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুকবিগণের পদাবলী গুলিও ভাষান্তরিত করিলে আমাদের ও তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই বিশিষ্টরূপ উপকার হইবে। আর আধুনিক বঙ্গীয় নব্যদের প্রতি এই অনুরোধ যে, তাঁহারা স্বদেশসম্ভূত এমন বহুমূল্য রত্নরাশি নিক্ষেপ করিয়া, যেন বিদেশীয় রসেই নিমগ্ন না থাকেন। ক্রমশঃ এরূপ থাকিলে স্বদেশের গৌরবের শনৈঃ শনৈঃ হ্রাসতা ঘটিতে পারে, ইহাও যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

একটি কুসুম।

১

বিশাল উরসে বিশাল ধরণী
বিধির সৃজিত বিবিধ কানন
ধরিয়া শোভিছে দিবস রজনী ;
দেখিব বাসনা জুড়াব নয়ন।
ত্যজিয়া ভবন চলিনু দেখিতে,
দেখিনু সুচারু কানন নিচয় ;
বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ?
সুরভিত ফুলে চির শোভাময়!

২

পূরব কাননে ফিরাবে নয়ন
দেখিলাম এক পাদপ শাখায়
একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,
ফুটিয়া দুলিছে রূপের ছটায়।
এ হেন সুন্দর কুসুম রতন
হেরিনি কখনো ধরণী কাননে ;
মরু ভূমি ধরা কি রূপে এমন
শোভিত হইল অমর ভূষণে ?

৩

শুনেছি কবির সুধামাখা গলে
অমর সেবিত অমর ভুবনে
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে
ফোটে পারিজাত অমর-কিরণে ;
অমর বাঞ্ছিত অমৃত-শীকর
সে ফুল হইতে পড়য়ে ঝরিয়া,
হেম-পাত্র ভরি অমর নিকর
মিটায় পিপাসা সেবন করিয়া।

৪

কবি-মুখে শুনি, কভু দেখ নাই,
কবি-তেজস্বিনী কল্পনার গুণে
বিবরণ তার যত টুকু পাই,
মন-নেত্রে দেখি, শ্রবণেতে শুনে।
কবির কল্পনা সফল হইল,
মনোহঙ্কি দর্শিত দেবের রতন
পারিজাত ফুল মরতে ফুটিল,
কি আছে কুসুম ইহার মতন ?

৫

আপন মনেতে আপনা আপনি,
সুখ-সেব্য-ধীর-সমীর-হিল্লোলে
দুলিছে কুসুম-মধুর লাচনি,
হরি-বক্ষে যেন কৌস্তুভ দোলে।
আরো কত ফুল কাননে হাসিছে,
লাবণ্যের ছটা পড়িছে উছনি ;
সকলেরি রূপ এফুল নাশিছে
শশি-রূপে যথা তারকা-মণ্ডলী।

৬

দেখিতে দেখিতে সুধীর সমীর
পশ্চিম প্রবাহে অধীর হইয়া
বহিল ; কুসুম হইল অথির,
ইতি উতি করে হেলিয়া দুলিয়া।
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ—
বিষময় মুখ, পিপাসিত হয়ে
বসি ফুলে সুধা করিল শোষণ ;

৭

যেন' রে সহসা পীড়া পরিচয়
পূরিত যৌবনা ললনা শরীরে
সবলে প্রবেশি করিল বিলয়
নয়ন রঞ্জন মাধুরী অচিরে!
শুখাল কুসুম হইল মলিন
রূপরাশি ; হাসি গেল মিশাইয়া ;
সোনার প্রতিমা হইল নীলিম
মধুমক্ষি-বিষে জর্জ্জর হইয়া!

৮

নীরস কুসুম বিষাদ অন্তরে
শোক চিহ্ন ধরি রহিল ঝুলিয়া!
নিরখি আমার হৃদয় ভিতরে
শত দুখ-শিখা উঠিল জ্বলিয়া!
মনে মনে, পুন ফুকারি ফুকারি,
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষি দলে
দিনু অভিশাপ ফেলি অক্ষিবারি,
অসীম বিষাদে বসিনু ভূতলে!

৯

কভু নেত্র মুদি, কভু ফুল পানে
চাহিয়া, নিরখি সে দশা তাহার,
কহিনু ধাতায় আকুল পরাণে ;—
এই কি, বিধাত. বিচার তোমার?
দুরন্ত নিঠুর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী
মধুমক্ষিকুল, তাদেরে সৃজিলে
এই কি করিতে? বল পদ্মযোনি,
নির্ম্মধু করিতে পদ্ম নিরমিলে?

১০

'এই কি বিধাত, বিচার তোমার?
কেন এ কৃতঘ্ন মক্ষিরে সৃজিলে?
মধু লয়ে, দেয় হলাহল ভার,
জর্জ্জরিত করে যন্ত্রণা-অনলে!
এরাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে,—
কি লজ্জার কথা!—গৌরব করিয়া,
তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি বেড়ায় উড়িয়া!

১১

'এই কি বিধাত, বিচার তোমার?
হৃদয়-দহন জীবন-শোষণ
বিষময় মাছী বিষের আধার
মধুর কুসুমে করে জ্বালাতন?
এই কি বিধাত, বিচার তোমার?
ক্ষণ পূর্ব্বে হেরি যে কুসুম-কায়
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার,
এবে দুখে কাঁদি নিরখি তাহায়!'

১২

অতল বিষাদ-সলিলে ডুবিয়া
রহিনু বসিয়া ভূতল উপরে ;
উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,
ফুল-পরিচয় কহিনু তাহারে।
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন,
কত শত বার দেখেছে তপনে
উঠিতে গগনে, কত শত দিন
ফেটেছে, জানিনু নেহারি বদনে ;

১৩

কহিনু তাহারে কি নাম তোমার ?
কহ বর্ষীয়ান্, জানিতে বাসনা
কি কুসুম উটি, কি নাম ইহার ?
জান যদি কহ ইহার ঘটনা।

বিষাদ অন্তরে অতীব কাতরে
উদ্যান-পালক কহিল আমায় ;—
"'ইতিহাস' নামে জানিও আমারে
'ভারত-কুসুম' জানিও উহায় !"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বঙ্গসুন্দরী।*

বঙ্গসাহিত্য-কাননে "বঙ্গসুন্দরী" একটী অপূর্ব্ব সুষমাকর উপাদেয় পুষ্প। আমরা বহুকালাবধি এই সুরভি কুসুমের আঘ্রাণ পাইয়াছিলাম, এক্ষণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই স্বর্গীয় পুষ্প উপহার প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত-তোষের সহিত আপ্যায়িত হইলাম। এখানি একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। বিহারী বাবু কেবল এই কাব্যখানি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে উপহার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তৎপ্রণীত "সারদামঙ্গল সংগীত" আমাদিগের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে। আমরা কাব্যের রুচিকে উৎকৃষ্ট মনে করি "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" কাব্যের এই সাধারণ লক্ষণ হইলেও অযথা রসাভাস বিশিষ্ট ও কুরুচি সম্ভূত কাব্যকে কাব্য বলা যায় না। অলৌকিক ভাবজননশক্তি কাব্যের প্রধান গুণ। যদি কাব্য পাঠ করিতে করিতে হৃদয়-তন্ত্রী অবিচ্ছেদে নৃত্য না করে, গুরুহর্ষ হৃদয়তল অধিকার না করে, তবে কাব্য যেন কেহ না পাঠ করে। কাব্য পাঠ করিলে স্বর্গীয় ভাব সমূহ মানবীয় মনের নূতন উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। কাব্যের আকর্ষণী ও বিমোহিনী শক্তিতে পাঠক যদি পদে পদে নীত না হয়েন তবে সে কাব্য কাব্যই নয়। কাব্যের নিজের এমন নৈসর্গিকী শক্তি আছে যে, তাহার বশ্যতা সুপাঠক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবেক, সন্দেহ নাই। চিত্ত প্রসাদ লাভের কাব্যই একমাত্র সোপান, যেরূপ কোন সুশৃঙ্খল সুন্দর বস্তু দর্শন করিলে, শোভানুভাবকতা শক্তি স্বতঃই তৃপ্তিলাভ করে, তদ্রূপ কোন সুকাব্য পাঠ করিলে চিত্ত মধ্যে নানাবিধ সুন্দর দৃশ্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া রুচির পুষ্টি সাধন করে।

আমরা শব্দাড়ম্বরপূর্ণ নীরস কাব্যকে একান্ত শত্রু মনে করি। বরং তাদৃশ কাব্য পাঠ দ্বারা পাঠক মণ্ডলীর রুচি বিকৃত ও অন্তর্ব্বৃত্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। আর কোন কারণে

* শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত। কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত

তরঙ্গায়িত মানসিক সদবৃত্তি পরম্পরা একবার ক্ষুভিত হইলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক সাধ্য সাধনার আবশ্যক হইয়া উঠে। কাব্যমধ্যে মানব চরিত্র চিত্রিত করিতে পারিলেই যে কাব্য উৎকৃষ্ট হয়, এমন নয়। কাব্যোল্লিখিত পাত্র সমূহের অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে যথাযথ চরিত্র বর্ণিত হইলেই কবি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন। নতুবা বিসদৃশ বর্ণনা দ্বারা কাব্য সমূহের অধমত্বই সূচিত হইয়া উঠে। কবির কাঠিন্য কাব্যের বিশেষ অনিষ্টকর। বীচিবিক্ষোভ বিরহিত বারিধির সহিত স্থিরতার তুলনা করিলে যেমন কোন দোষই স্পর্শে না, তদ্রূপ সদ্ভাবপূর্ণ মনঃস্ফূর্ত্তিপ্রদ কাব্য পাঠ করিলে মনের অবসন্নতা নিরাকৃত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ হয়। অধুনাতন অনেক কাব্যে এইরূপ দোষাবলী সুন্দর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আবার অনেকের এরূপ রোগ আছে যে, তাঁহারা কাব্য-কাননে প্রবেশের অযোগ্য, তথাপি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এমন দুই একটা কণ্টকময় আগাছা রোপণ করেন যে, তদ্দ্বারা প্রকৃত শোভাস্পদ কাব্যকুসুম বৃক্ষ অন্তর্ব্বাহ্য শোভা শূন্য হইয়া কণ্টকময় বল্লীর আশ্রয়ভূত হয়, এবং সাহিত্য সমাজের চিরশত্রুতা করিয়া থাকেন। বঙ্গ সাহিত্যমধ্যে এরূপ অনেক মহাত্মাই প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, এই সকল মহাত্মাদিগের গুণে উত্তম বস্তুও অধম শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং হয়ত নিরন্তর অধম বস্তুর সাহচর্য্য জনিত মালিন্যে হতপ্রভ হইয়া যাইবে, বিচিত্র কি? এরূপ বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিশ্লেষণ অসম্ভব।

অনেক বিজ্ঞ বঙ্গভাষাহিতৈষী মহামনা ব্যক্তিরা মুক্তকণ্ঠে মাতৃ ভাষার পুষ্টি সাধন জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কারণ মাতৃভাষার মধ্যে সুকবি সুদুর্লভ। এই দুর্লভতা যে চিরকাল থাকিবেক, এমন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তথাপি এরূপ প্রতীতি হওয়াও অসম্ভব নয় যে, সময়ে অনেক কষ্টে প্রকৃত কবি জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। মাতৃভাষায় সুপাঠ্য কাব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর করিবার অগ্রে পাঠকগণকে কাব্যের বিশুদ্ধ রুচির পরিচয় দিতে হইবেক নাই, আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ে বহ্বায়ত প্রবন্ধ লিখিব বলিয়াও প্রবৃত্ত হই নাই। বহু দিনের পর কোন সুদৃশ্য সুন্দর বস্তুর অবলোকন জনিত আনন্দ যেমন পৌনরুক্ত দোষের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তদ্রূপ আমরা বঙ্গসুন্দরী পাঠান্তর আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়াও চিত্তের উদ্বেলতা রক্ষা করিতে পারি নাই। বিহারী বাবুর অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে সুধাদ্রব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা যতই আস্বাদন করা যায়, ততই তৃপ্তি বোধ হয় এবং ইহার অতিভোজন দোষাবহ নহে। তিনি বঙ্গসুন্দরীকে যে নৈসর্গিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহার দৃশ্য দর্শন করিলে প্রতিপদে ধন্যবাদ প্রদান করিতে

হয়। কবি যখন স্বাচ্ছন্দ্য ও চিত্তস্বাস্থ্য লাভ জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক স্বভাবের শোভা দর্শন করিয়া সকলের নিকট হইতে সরিয়া চিন্তা স্রোতে ভাসমান হইয়া এক অপূর্ব্ব নারী চরিত্র বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, তখন তাঁহার লেখনীকে মন্দার-কুসুমসমূহদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা হয়।

এক স্থানে কবি স্বভাব বর্ণন করিতেছেন; যথা—

" কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে,
প্রলয়ের মেঘ সজ্জ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।—"

অন্য এক স্থানে আছে,—

" যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন করে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;——"

এই কয়েক পংক্তির মধ্যে কেমন সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

" চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন করে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ; "

এই রূপ কবিতা কয়জন কবির লেখনীর মুখ হইতে বহির্গত হয়? যথার্থ স্বভাবের চিত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাঠক মাত্রেরই মন তৃপ্তিসুখ লাভ করিয়া থাকে।

আর এক স্থানে চমৎকার গ্রাম্য ভাব বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—

" বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে সর্ব্বরী।
বরষার যে ঘোর নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোটায় ;
সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,
সচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।
বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে !"

উপর্য্যুক্ত কবিতা সমূহের মধ্যে ভাষার কাঠিন্য মাত্র নাই, অথচ কেমন সরল ভাষায় যথার্থ ভাব-স্রোত কবিতাচয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে ! অন্যত্র দেখ,—

" প্রিয়তম সখা সহৃদয় !
প্রভাতের অরুণ উদয়,

হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

আহা কিবে প্রসন্ন বদন!
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি দিবাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর;
নির্ম্মল লহরী মালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

* * *

ফিরে আসে সেই ছেলে বেলা,
হেসে খুসে করি খেলা দেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন;
ভোর হয়ে বসে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।"

কবি কাব্য লিখিবার প্রথমে নিজ বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অনেক সারবৎ বাক্যই বলিয়াছেন। আমরা সেই স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবির প্রকৃত উদ্দেশ্য কাব্য হইতে এখন রমণীয় বস্তু পাঠকদিগের কাব্য পাঠ রুচির নিকট উপহার দিব। ভরসা করি যাঁহার যেরূপ রুচি হউক না কেন, প্রদত্ত উপহারে আপ্যায়িত হইবেন।

বঙ্গসুন্দরী কাব্যপ্রণেতা বহুকালাবধি বঙ্গ সমাজের রমণীকুলের অবস্থা অবগত হইয়াছেন; অবগত হইয়া তাহাদিগের যে বিচিত্র চরিত্র তদীয় কাব্যদর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, তাহা নিবারিত নিমেষ হইয়া দর্শন করিলে একান্ত প্রীতিলাভ হয়। চিরপরাধীনা বঙ্গকামিনীদিগের মধ্যে কবি নিম্নোক্ত সাত জনের অর্থাৎ চিরপরাধীনা, করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী, প্রিয়সখী, বিরহিণী, প্রিয়তমা, অভাগিনী ইহাদিগের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কবি সাধারণতঃ একটী নারী বন্দনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাতে স্ত্রীজাতি সুলভ শালীনতা, সরলতা, অনন্য-সুলভ-পতিপরায়ণতা, রমণীয়তা অতি বিশদ রূপে

প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দেখুন যথা—

" জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম লতা।

পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, উষার আলো ;
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব-নীরদ মাল।

প্রেমের প্রতিমা স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী ;
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

এই বর্ণনার অবসানে কবি চিরাভিলষিত বঙ্গকামিনীদিগের যথাযথ চরিত্র চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম চিত্রে চিরাধিনী বঙ্গবালার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি স্বভাবতঃ বিষাদভূষিতা ও ক্ষোভদায়িনী ; তাহাতে আবার কবির প্রতিভাশালিনী লেখনীতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং সুরুচি-পরায়ণ পাঠকগণের নিকট এবম্বিধ প্রাকৃতিক বর্ণনা আরও হৃদয়-গ্রাহিণী হইবেক। যথা—

" অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাঁধা আছি সদা ইহার মাজে ;
দাসীদের মত খাটি অনিবার,
গুরুজন মন মতন কাজে।

পান্ থেকে চূণ খসিলে হঠাৎ,
একেবারে আর রক্ষে নাই ;
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত,
কোণে বসে কুণো গুতুনি খাই।

অনায়াসে দাসী ছেড়ে চোলে যায়,
খামখা গঞ্জনা সহিতে নারি ;
অভাগীর নাই কিছুই উপায়,
কেনা দাসী আমি কুলের নারী।

এক হাত কোরে ঘোমটা টানিয়ে,
চুপ করে মোরে দাঁড়াতে হয় ;
তাঁরা যা কবেন, যাইব শুনিয়ে,
মুখ ফোটা তাহে উচিত নয়।

হাঁপায়ে হাঁপায়ে ঘোম্‌টা ভিতরে,
যদিও পচিয়ে মরিয়ে যাই ;
তবুও উঠিয়ে ছাতের উপরে,
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই।

যদি কেহ দেখে, যাবে কুলমান,
হবে অপযশ দশের মাজে ;
ছাতের উপরে বেড়িয়ে বেড়ান,
কুলবতীদের নাহিক সাজে।

শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ ;
অনেক কঠোর তপের বলে ;
পূরায়েছিলেন নিজ মনোরথ,
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে,

সেই ভাগিরথী পতিত পাবনী,
দুয়ারের কাছে বলিলে হয় ;
শুনি ঘরে থেকে দিবস রজনী,
কুলুকুলু ধ্বনি করিয়ে বয়।

তাঁহার পাবন দরশ পরশ,
কপালে আমার ঘটেনি কভু ;
স্নান করিবারে চাহি যে দিবস,
ধম্‌কায়ে মানা করেন প্রভু।

প্রভাত নাহ'তে লোক-কোলাহলে,
গগন পবন পূরিয়ে যায় ;
যেন আসে বান্ তরঙ্গিণী জলে,
কলকল কোরে ঘুরে বেড়ায়।

রজনী আইলে লুকায় মিহির,
ধরণী আবৃত তিমির বাসে ;
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর,
তত কলরব নিবিয়ে আসে।

যায় আসে এই রূপে দিন রাত,
মানুষের কোলাহলের সনে ;
যেন দেখি আমি এই গতায়াত,
বসে একাকিনী বিজন বনে

আমার সহিত সেই জনতার,
যেন কোন কিছু সুবাদ নাই ;
যেন কোন ধার ধারিনে তাহার,
থাকি প্রভু-ঘরে প্রভুরি খাই।

বই নিয়ে বসে বিষম বিপদ,
বুঝিতে পারিনে উপমা তার ;
বুঝি বা কেমনে শুনিয়ে শবদ,
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার।

বন, উপবন, ভূধর, সাগর,
তরল লহরী নদীর বুকে ;
গ্রাম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ, নিঝর,
শুনিলেম সুদ্ধু লোকেরি মুখে !

কারার বাহিরে না জানি কেমন,
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে ;
সে সকল যেন মেরুর মতন,
অজানা রয়েছে আমার কাছে।

যেমন দেশের পুরুষ সকলে,
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই ;
তেমনি আমরা অন্দর মহলে,
অন্দর মহল দেখি সদাই।

বাহিরে ইহাঁরা সহিয়ে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ পদাঘাতে পিষিত হন ;
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

হায় রে কপাল ! পুরুষ সকল,
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি ;
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
ঠ্যাঙায়ে ভাঙ্গিলে ঘরের হাঁড়ি !

গারদে রেখেছ দুখিনী সকলে,
অধীনতা বেড়ি পরায়ে পায়,
জাননাক হায় সতী শাপানলে,
পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায়।

* * * *

বলিলেন তিনি " এ এক আরসি,
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে,
ততই ইহার ভিতরে প্রেয়সী।
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে।

হবে আবিষ্কৃত সমুখে তোমার,
আলোময় এক সুখের পথ ;
ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার,
নব নব সুখ পাইবে কত।"

অয়ি নাথ ! আহা যাহা বলেছিলে,
একটীও কথা বিফল নয়,
গ্রন্থ আলোচনা যতনে করিলে,
উদার জ্ঞানের উদয় হয়।

কিন্তু হে জাননা অভাগা কপালে,
যত ভাল, সব উলটে যায় ;
বাঁচিবার তরে ডাঙায় দাঁড়ালে,
ভূঁই ফুঁড়ে এসে কুমীরে খায়।

অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা,
শাস্ত্র সুধাপান যতই করি ;
তত আরো হায় বেড়ে যায় জ্বালা,
ছট্ ফট্ কোরে পরাণে মরি।

আগে এই মন ছিল এতটুকু,
ছিল তমোময় জগত জাল ;
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু,
হেসে খুসে বেস্ কাটিতো কাল।

* * * *

জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে,
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়,
সেই মহাক্ষতি পূরায়ে না দিয়ে,
কার্ বল সুখে নিদ্রা হয় ?

এখনো ইহারা কেন গো আমারে,
আঁধারে ফেলিয়ে রাখিছে আর,
কোন্ কাপুরুষ মানব সংসারে,
শুধিবে আমার নিজের ধার ?

করম ভূমিতে করিবারে কিছু,
বড়ই আমার উঠেছে মন ;
আজ কখনই হটিব না পিছু,
সাধন অথবা হবে পতন !

হা নাথ, হইল দিবা অবসান,
এত দেরি হেরি কিসের তরে ;
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বয়ান,
এখনও তুমি এলে না ঘরে !

আহা ! ঘরে আসি আজি প্রিয়তম,
কৈও কৈও দুটো নরম কথা ;
যেন হে হটাৎ হইয়ে গরম,
ব্যথার উপরে দিওনা ব্যথা।

চির পরাধিনী বঙ্গবালার মধ্যে কবি, স্বলেখনীর সহজ আঘাতে যে সরলতা-পূর্ণ যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চিরপরাধিনী আমাদিগের উন্মীলিত নেত্র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বকীয় দুরবস্থার সমানাংশ প্রদান করিতে থাকেন, এবং আমরাও গলদশ্রু গণ্ড হইয়া সেই বিষয়ের সহানুভূতি করিতে থাকি। ইহাই যথার্থ কবিত্ব, ইহাকেই প্রকৃত প্রতিভাশক্তি কহা যায়।

অনন্তর করুণা-সুন্দরী-বিষয় কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলাম। পাঠকগণ গ্রন্থকারের গ্রন্থনশক্তি অবলোকন করুন। যথা—

" এই যে দাঁড়ায়ে করুণা সুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে ;
মুখ খানি আহা চুন্ পানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে !

চুল গুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ কমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল

যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি !

হে সুরবালিকে, শুভদরশনে,
সুবর্ণ প্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজল কমল নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন !

দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই !

যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ন নীর তার অনুরূপ,
মরি আজি সাজিয়াছে কেমন !

যেন দেববালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে ;
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন সুহু নয়ন-জলে।

তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ,
অমূল রতন নাই গো আর ;
সাধনের ধন এ নব রতন,
হৃদি আলো করি রহিবে কার !

তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
সে যেন তোমার মতন হয় ;
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
চিরদিন যেন সুখেতে রয় !”

সহৃদয় পাঠকগণ ! করুণাসুন্দরীর কারুণ্য পূর্ণ মূর্ত্তি অবলোকন করুন, এবং দেখুন কেমন অমায়িক হৃদয়ানন্দকর ভাব কবির কাব্যের প্রধান অঙ্গীভূত হইয়া মানসিক অতুল তৃপ্তি বিধান করিতেছে। যেন মূর্ত্তিমতী করুণা মানব দুঃখের সম-দুখ-ভাগিনী হইয়া পৃথিবীর জন্য সমবেদন প্রকাশ করিতেছে। ধন্য ! সমবেদন পরায়ণা করুণাসুন্দরী ! তুমি ধন্য ! যিনি তোমার এই অত্যদ্ভুত মূর্ত্তির নির্ম্মাতা, তিনি আরও ধন্যবাদার্হ। এই স্বর্গীয় মূর্ত্তির তুলনা নাই ; পাঠ করিলে আনন্দের অবধি নাই।

পাঠকগণ ! যেরূপ অতিশয় মিষ্ট ভোজনের পর কিঞ্চিৎ রসান্তর সংশ্লিষ্ট বস্তুর আস্বাদন রসনার একান্ত সুখদায়ক হইয়া উঠে, এবং ইহা স্বাভাবিক নিয়মের একান্ত অধীন, তদ্রূপ কবিও অমৃত ভোজন প্রদানের পর “বিষাদিনীর চরিত্র বর্ণন অবতারিত করিয়া সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

“ছাতের উপরে চাঁদের কিরণে,
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে ;
রূপে দশদিশ করেছে আলা।

বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন,
চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা ;
থুয়ে গেছে যেন তপন আপন,
এ মূরতিমতী মরীচি ঘটা।

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা,
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।

হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন,
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে ;
কভু যেন লাজে নমিত লোচন,
পলক পড়েনা শতেক পলে।

কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে,
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়,
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে,
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ;

কখন বা যেন হয়েছে তাহায়
সুধার প্রবাহ প্রবহমাণ,
যেথা দিয়ে যায়, অমৃত বিলায়,
জুড়ায় জগত জনের প্রাণ।

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগত জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।

আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
　　অমনি লাজের উদয় হয়;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
　　আনত আননে দাঁড়ায়ে রয়।

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন,
　　আধই অধরে মধুর হাসি;
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন
　　কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি!

আননের পানে সরমবতীর,
　　স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
　　ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

এস গো সকল ত্রিলোকসুন্দরী
　　এখানে তোমরা এসগো আজি;
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি
　　আপন মনের মতন সাজি!

ঘেরি ঘেরি এই সোনার পুতলী,
　　দাঁড়াও সকলে সহাস মুখে;
কমল কানন বিলোচন তুলি,
　　চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে।

এমন সরেস নিখুঁত আনন,
　　বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো;
এমন সজীব তেজাল নয়ন
　　—মদির—মধুর—নাহিক আর।

আমরা পুরুষ নবরূপবশ,
　　যাহা খুসি বটে বলিতে পারি;
পান করি আজি নব রূপ রস,
　　নারীর রূপেতে ভুলিল নারী।

মরি মরি! কারো কথা নাই মুখে,
　　অনিমিষে শুদ্ধ চাহিয়ে আছে;
কি যেন বিজলী বিলসে সমুখে,
　　কি যেন উদয় হয়েছে কাছে!

একি একি কেন রূপের প্রতিমা,
　　সহসা মলিন হইয়ে এল;
দেখিতে দেখিতে চাঁদের চন্দ্রিমা
　　নিবিড় নীরদে ঢাকিয়ে গেল।

কেশ মেঘ জালে সীমন্ত সিন্দূর
　　প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখা,
মরি, তারি নীচে সেই সুমধুর
　　মুখ খানি কেন বিষাদে মাখা!

মাজে মাজে আসি বিলসিছে তায়
　　দিবা-দীপশিখা খেদের হাসি,
তড়িতের প্রায় চকিতে মিলায়,
　　বাড়াইয়ে দেয় তমসরাশি।

আহা দেখ সেই জ্যোতির নয়নে,
　　বিমল মুকুতা বরষে এবে;
এমন পাষাণ কে আছে ভুবনে,
　　এ হেন রতনে বেদনা দেবে!

ত্রিলোক আলোক যে সুররূপসী,
আলো নাই মনে কেন রে তার !
ভুবন ভূষিয়ে বিরাজে যে শশী,
কেন তারি হৃদে কালিমা ভার !

হা বিধি ! এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কোমল কুসুমে কীটের বাস ;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে পাতিয়ে রেখেছে পাশ।

বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে
পিতা মাতা তব ধরিয়ে করে,
করেছেন দান সে কাল নিশিতে
ধাওড়া ভাওড়া বেদড়া বরে !

জনক জননী কি করেছ হায়,
তোমরা দুজনে মোহের ঘুমে ;
কোন্ প্রাণে আহা এ ফুল মালায়,
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশান ভূমে !

পতি সুখে সতী হয়েছে নিরাশ,
হৃদয়ে জ্বলেছে বিষম জ্বালা ;
শরীর বাতাস, হৃদয় উদাস,
কেমনে পরাণে বাঁচিবে বালা !

কোথা ওগো কুল-দেবতা সকল,
অনুকূল হও ইহার প্রতি ;
বরষিয়ে শিরে সুধা শান্তিজল,
ফিরাও সতীর পতির মতি।

যেন সেই জন পাইয়ে চেতন,
পশুভাব ত্যজে মানুষ হয় ;
আমোদে প্রমোদে দম্পতী দুজন,
ছেলে পুলে লয়ে সুখেতে রয়।"

বিষাদিনীর কি চমৎকার চিত্র ! কি মনোরম ভাব-মাধুরী ! যেন দিব্য নয়নে বিষাদিনীর আকৃতিচ্ছটা দেখিতেছি। পাঠকগণ ! আমরা এরূপ কাব্যের গুণের একান্ত পক্ষপাতী। রুচি, এইরূপ কাব্যের দ্বারা সবেগে সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল আকর্ষণ নয়, মোহনও সবিশেষ এ মোহ-মন্ত্রের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া বিশুদ্ধ রুচি চালিত পাঠকের সাধ্য নয়। ৪র্থ হইতে ৯ম পর্য্যন্ত পাঠ কর, নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃসৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা বহুকালাবধি বঙ্গকামিনীদিগকে বিষনেত্রে দর্শন করিয়া আসিতেছি, ইহা প্রকৃতির চিরবিরুদ্ধ ব্যবহার, সমাজ বিজ্ঞান তত্ত্বের বিরোধী। কি আশ্চর্য্য বিষয়। ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়কে সমান স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, আমরাই কেবল তাহা-দিগকে অন্তঃপুরস্থ দাসীর ন্যায় অযথা ব্যব-হার দ্বারা নিপীড়িত করিতে শিখিয়াছি। যদি কোন উন্নতমনা সুশিক্ষিত কবি, কাব্য দ্বারা নারীজন সমূহের প্রতি সম-বেদন প্রকাশ করিয়া সাধারণকে সেইদিকে চালিত করিতে পারেন, তবে তিনিই যথার্থ হিতৈষাপরায়ণ কবি। যাঁহার কাব্য পাঠ দ্বারা জগতীয় ললামভূত কামিনী-

মগুলীর প্রতি যথার্থ সদ্ভাবসহকৃত সমবেদনা উপস্থিত হয়, তিনি আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধার্হ, সন্দেহ নাই। আমরা এরূপ কাব্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য লালায়িত। ভরসা করি যেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গরাজ্যে কেবল স্ত্রীজাতির দুরবস্থাপনোদনই আলোচ্য বিষয় হয়। নতুবা উপায় নাই। আমরা দুর্ব্বল অবলাকুলকে অনেক যাতনা, অনেক পরাধীনতা প্রদান করিয়াছি। বোধ হয় সেই পাপে আমাদিগকে এত নিপীড়িত হইতে হইতেছে। অধিক কি, আমরা বাক্য ব্যয় বিষয়েও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি। অনেক বিষয়ে প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণ নববধূদিগকে কথা কহিবার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বিহারী বাবু সেই নারীগণের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বোধে করুণাপর হইয়া যে সুন্দর কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, উহা উৎকৃষ্ট হইবে, বিচিত্র কি? আমরা সকলকেই এই কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অনুরোধ করিবার কারণ অন্য নয়, এবং ইহা প্রকৃত পক্ষে অনুরোধও নয়, অবশ্য পাল্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

অনন্তর "প্রিয়সখীর" আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ কর, সখ্যভাব মনকে সমধিক প্রফুল্লতা প্রদান করিবে। যথা—

" স্থির উষা প্রায় তুমি দেবী তার,
　হৃদয়ে রয়েছ বিরাজমান ;
নাহি অতি তাপ, নাহিক আঁধার,
　কি সরেস সেই সুখেরি স্থান।

সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে,
　মনোহর বেশে সাজিয়ে রয় ;
মৃদুল অনিল তার ফুলবনে,
　মানস মোহিয়ে সতত রয়।

যখন তোমার সুললিত তনু
　কুসুম কাননে প্রকাশ পায়,
দশদিকে দশ গুঠে ইন্দ্রধনু.
　আদরে তোমার পানেতে চায়।

ভ্রমর নিকর তাজি ফুলকুল,
　গুন্ গুন্ স্বরে ধরিয়ে তান ;
চারিদিকে তব হইয়ে আকুল,
　উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান।

দোলে দূরে দূরে তরু লতাগণ,
　দোলে থোলো থোলো কুসুম তায় ;
যেন তারা আজি হরষে মগন,
　সাধনের ধন পেয়ে তোমায়।

ভ্রম তুমি সেই সুখ ফুল বনে,
　চেয়ে চারিদিকে সহাস মুখে ;
হরিণী যেমন গিরি-তপোবনে
　বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের সুখে।

প্রকৃতির চারু শোভা দরশনে,
　ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন ;
দাঁড়াইয়ে থাক মগন নয়নে,
　হীরক-প্রতিমা দাঁড়ায়ে যেন।

মরি সে নয়ন কেমন সরেস,
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর ;
যেন আছে আধ আলস আবেশ,
ভাঙ্গে নাই পুরো ঘুমের ঘোর !

হে সুরসুন্দরী ! ত্যেজে সুরলোক,
এ লোকে এসেছ কিসের তরে ;
তব অনুকূল নহে এ ভূলোক,
অসুখ এখানে বসতি করে।

এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
এই দেখি ফের শুকায়ে যায় ;
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল,
না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায়।

এই দেখি হাসে চাঁদিনী যামিনী,
পোহাইয়ে যায় তাহার পর ;
এই মেঘমালে নলকে দামিনী,
পলক ফেলিতে সহেনা ভর।

আহা যেন এই অপরূপ রূপ,
চিরদিন এক ভাবেতে থাকে ;
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ,
রাহুর মতন গ্রাসিয়ে রাখে !

যখন আমার প্রাণের ভিতর
ভেবে ভেবে হয় উদাস প্রায়,
ভাল নাহি লাগে দিনকর কর,
আঁধারে পলাতে মানস, চায়,

এই মনোহর বিনোদ ভুবন,
বিষণ্ণ মলিন মূরতি ধরে ;
বোধ হয় যেন জনম মতন
ফুরায়েছে সুখ আমার তরে ;

সহিতে সহিতে সহেনা যখন,
পারিনে বহিতে হৃদয়-ভার,
মরম বেদনে গোঙরায় মন,
দেহেতে পরাণ রহেনা আর।

অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে,
তোমার ললিত প্রতিমাখানি,
স্নেহের নয়নে সুধা বরষিয়ে,
জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী।

আচম্বিতে হয় আলোক উদয়,
কভু হেরি নাই তাহার মত ;
নহে দিবাকর তত তেজোময়,
সুধাকর নয় মধুর তত।

চারিদিকে এক পরিমল বায়,
'তর্' ক'রে দেয় মগজ ঘ্রাণ ;
কেহ যেন দূরে বাঁশরী বাজায়,
সুরেতে মাতায় হৃদয় প্রাণ।

যেন আমি কোন অপরূপ লোকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই ;
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে,
সহসা তোমাকে দেখিতে পাই।

আহা সে তোমার সরল আদর,
সরল সহাস শুভ বয়ান,
আলো ক'রে আছে মনের ভিতর,
নারিব ভুলিতে গেলেও প্রাণ!

তোমার উজল রূপ দরপণে
সরল তেজাল মনের ছবি,
প্রভাতের নীল বিমল গগনে
শোভা পায় যেন নুতন রবি।

কিবে অমায়িক ভোলা খোলা ভাব,
পাবন প্রণয়ে হৃদয় ভোর;
সদা হাসি খুসি উদার স্বভাব,
চারি দিকে নাই সুখের ওর!

কাননে কুসুম হেরিলে যেমন,
ভালবাসে মন আপনি তারে;
তেমনি তোমায় করি দরশন,
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে!

সুধাকর শোভে আকাশ উপরে
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায়;
আর কিছু নয়, শুদ্ধ তারি তরে
তৃষিত নয়নে চকোর চায়।

সরেস গাহনা শুনিলে যেমন,
কাণে লেগে থাকে তাহার তান;
তোমার উদার প্রণয় তেমন
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ।

যেমন পরম ভকত সকলে
আরাধনা করে সাধন ধনে,
তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে
ভাবি আমি ব'সে মগন মনে।"

প্রিয়সখীর মধ্যে কেমন সদ্ভাব বিজৃম্ভিত ভাবাবলী স্রোতের ন্যায় প্রবহমাণ হইতেছে! কবির এই এক অসাধারণ ক্ষমতা যে, তিনি সামান্য বিষয়ে কাব্য লিখিতে প্রস্তুত হইয়া সেই প্রস্তুত বিষয়ে এরূপ সুচারু গ্রন্থন ও প্রতিভা শক্তি প্রকাশিত করিয়াছেন যে, ইহা অনেক মহাকাব্যের সহিত অতর্কিত রূপে তুলনীয় এবং ইহাই যথার্থ কবিত্ব শক্তির স্ফূর্ত্তিপ্রদ ফল। বোধ হয় বঙ্গভাষায় কোন কোন মহাকবি মহাকাব্য লিখিয়া সাহিত্য সমাজে যাদৃশ যশোলাভ করিয়াছেন, ইনি বঙ্গসুন্দরীর ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন বিষয় পরম্পরা লইয়াও তদ্রূপ যশস্বী হইয়াছেন। আমরা 'প্রিয়সখীর' প্রতিপংক্তির সমালোচনা করিতে অক্ষম। কারণ তাহা নিতান্ত বহ্বায়ত হয়। মার্জ্জিত রুচি কাব্যামোদপরায়ণ মহাশয়গণ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহার মধ্যে ভূষি কিছুই নাই, অধিকাংশই সার, ও প্রকৃত কবিত্বের উদ্দীপক।

বিরহিণী কামিনীর বর্ণনা পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় অনেক কবির লেখনীর আঘাত সহ্য করিয়াছে, এবং বিরহিণীর প্রকৃতি আমাদিগের দেশে কাব্য পাঠ তৃপ্তিপর

পাঠকেরা বিশদরূপে অবগতও আছেন। কিন্তু বিহারী বাবুর এ বিরহিণী অনন্যদৃশ্যা, ইহা "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" মহাকবি কালিদাসোক্ত বজ্রসমুৎকীর্ণে মুক্তাচ্ছিদ্রে সূত্রের ন্যায় আমারও গতি আছে, এরূপ দোষ বোধ হয় নাই। স্বকীয় প্রতিভা বলে লেখনী চালিত হইয়াছে। প্রথমেই লক্ষ্ণৌ গজলের স্বরে একটী গীতি রচিত হইয়াছে। গানটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

" রাগিণী খাম্বাজ, তাল ঠুংরি বা
কাওয়ালি।

সরলা দুখিনী,
আজি একাকিনী,
উদাসিনী হায় চলিলে কোথায়!

মলিন বদন,
সজল নয়ন,
দাঁড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায়।

যেন তব মনে,
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
যে জ্বালা প্রবোধ দিয়ে জুড়ান না যায়।

এ ঘোর সংসার,
অকূল পাথার,
সোনামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।

কে রে সে নিদয়,
পাষাণ হৃদয়,
হেন সুকুমারী নারী পাথারে ভাষায়।"

ইহার এক স্থানে কি চমৎকার দৃশ্য আছে,—

এ ঘোর সংসার,
অকূল পাথার,
সোনামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।

কি অদ্ভুত ভাব!! কষ্ট কবি, বোধ হয় সহস্র সহস্র পংক্তিতেও ইহা প্রকাশ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু কবি এক পংক্তিতেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাব কত গম্ভীর, কত উদার, কত মাধুরীপূর্ণ বলিয়া শেষ করা যায় না। সুকবি লিখিত বাক্য কাব্যের জীবন স্বরূপ, এবং এই রূপ বাক্য বিন্যাসেই কাব্যের সজীবতা লক্ষিত হয়।

২য় গানটীও তুলিতে হইল, কারণ ইহাও বড় কম হৃদ্যতম নহে। যথা—

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল ঠুংরী বা কাওয়ালী।

কে তুমি যোগিনী বালা,
আজি এ বিরল বনে;
বাজায়ে বিনোদ বীণা,
ভ্রমিছ আপন মনে।

গাহিছ প্রেমের গান,
গদগদ মন প্রাণ,
বাধ বাধ সুর তান
ধারা বহে দুনয়নে।

পদ কাঁপে থর থর,
টলমল কলেবর,
এলো থেলো জটাজাল
লটপট সমীরণে।

শত শশী পরকাশি
অপরূপ রূপ রাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে
হেরিছে হরিণীগণে।

যেন মণিহারা ফণী,
কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী,
হে উদার-দরশনে।*

বিরহিণী! তুমি বহুকালাবধি অনেক সুকবির কাব্য-ভাণ্ডারের এক মাত্র সম্পত্তি স্বরূপ, এবং এই জন্য প্রোষিতদিগের চিত্ত অনেক সময়াবধি স্বতই দ্রবীভূত আছে। বিশেষতঃ তোমার মূর্ত্তিই আরও দ্বিগুণিত রূপে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বিরহিণীর কতিপয় কবিতা তুলিয়া দিলাম। পাঠকগণ! কাব্যসুধা আস্বাদন করুন। যথা—

"হা নাথ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ
মনের বাসনা রহিল মনে!
ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান,
বিরহিণী তব মরিল বনে।

এস এস অয়ি এস একবার,
জনমের মত দেখিয়ে যাই;
এ হৃদয় ভার নাহি সহে আর,
দেখে ম'লে তবু আরাম পাই।

'হা হতভাগিনী জনম দুখিনী!
শিরোমনি কেন ঠেলিনু পায়;
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী,
শুনেছিনু তবু হারানু হায়!

অয়ি নাথ! তুমি দয়ার সাগর,
আমি মাতা-পিতা-বিহীনা বালা;
আহা! তবু কত করিয়ে আদর,
খুলে দিলে করে গলার মালা।

অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর,
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা,
ফিরে দিনু তব প্রেম-ফুল ডোর;
বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা!

সেই তুমি সেই সজল নয়ানে,
কাতর হইয়ে গিয়াছ চলি;
যে বিষম ব্যথা পেয়েছি পরাণে,
এ বিজন বনে কাহারে বলি!

* * *

হে তারকারাজি, হীরকের হার;
তামসী খনির আলোক মালা!
ভিতরে ভিতরে তোমা সবাকার,
প্রতিকৃতি কার করিছে আলা?

ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল,
বিকসিল ফুল সকল ঠাঁই;
ফুলের আলোকে কানন উজ্জ্বল,
ফুল বই কেন কিছুই নাই!

চারিদিকে সব বেলের বেদিতে,
কার এ মুরতি গোলাপময়;
আমার নাথের মতন দেখিতে,
আমারে দেখিতে দাঁড়ায়ে রয়!

তোমার মূরতি বিরাজে অম্বরে,
বিরাজে আমার হৃদয় মাজে;
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরে,
তোমারি হে নাথ মূরতি রাজে।

ওতো নয় হয় অরুণ উদয়,
সুসান্ত প্রশান্ত তোমারি মুখ;
ওতো নয় উষা নব রাগময়,
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক।

বিমল অম্বর শ্যাম কলেবর,
শুক্‌তারা ছুটী নয়ন রাজে;
লাল-আভা-মাখা শাদা ধরাধর,
উরসে চিকণ চাদর সাজে।

পবন তোমায় চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুম ভার;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ ধরেনা আর!

নির্ঝর নিকর ঝর ঝর করি,
আঘোষে তোমার মহিমা গান;
প্রতিধ্বনি ধনী সে গানে শিহরি,
চপলার মত ধেয়ে বেড়ান।

সে ঘোর প্রণয়-প্রলয়ের পরে,
তোমা বিনা আর কিছুই নাই;
হে প্রেম-সাগর! চেয়ে চরাচরে,
কেবল তোমারে দেখিতে পাই।

যে মূরতি তব এ হৃদয় হ'তে
ব্যাপিয়া বিরাজে ভুবনময়,
হিয়া হ'তে পুন যদি কোন মতে
তিরোহিত সেই মূরতি হয়।

নিশ্চয়ি তখনি দেখিতে দেখিতে,
আচম্বিতে সব বিলয় পাবে;
উঠিবে গগন তপন সহিতে,
ধরিত্রী গলিয়ে মিলিয়ে যাবে।

ঘোর অন্ধকার আসিবে আবার,
হাঁপায়ে মারিতে বিরহি-বালা;
আঁধার! আঁধার! দূরে দূরে তার,
জ্ব'লে জ্ব'লে উঠে বিকট জ্বালা।

* * * *

ধরণী আমায় ধোরনা ধোরনা!
রুধনা পবন ছাড়রে পথ!
সে মধুর স্বরে কোরনা ছলনা,
গেওনা গাহনা নাথের মত।

অভাগীর বুঝি ফিরিল কপাল,
এ আওয়াজ আর কাহারো নয়!
আয় রে পবন ধাবাল ছাবাল!
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণ দ্বয়।

বহ বহ বহ সংগীত-লহরী!
ধরগো সপ্তমে পুরবী তান!
বয়ে লয়ে চল ত্বরা তনু-তরী!
অমৃত সাগরে জুড়াব প্রাণ।

রাগিণী পুরবী,—তাল আড়াঠেকা।

কে জানেরে ভালবাসা,
শেষে প্রাণ নাশা হবে!
শান্তির সাগরে আহা
প্রলয় পবন ববে!

ভাল বাসে, ভাল বাসি,
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি,
সদা মন হাসি হাসি,
সৌরভ গৌরবে।

প্রেমের প্রতিমা খানি,
আদরে হৃদয়ে আনি,
পদ্মবনে বীণাপাণি,
পূজি মহোৎসবে।

প্রাণ প্রেম-রসে ভোর,
গলে দোলে প্রেম-ডোর,
হৃদে প্রেম ঘুম্ ঘোর,
মাতোয়ারা নয়ন চকোর;—

আশে পাশে দৃষ্টি নাই,
আপনার মনে ধাই,
হেসে চমকিয়ে চাই,
বাঁশরীর রবে!

আচম্বিতে চোরা বাণে
বিষম বেজেছে প্রাণে,
এখনো প্রেমের ধ্যানে
ভোলা মন তবু মজে রয়;—

হা আমি যাহার লাগি
হয়েছি ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগী,
মোরে যদি সে বিরাগী;
অনুরাগী কেন তবে!

এত চাই ভুলিবারে,
ভুলিতে পারিনে তারে,
ভাল বেসে কে কাহারে
ভুলে গেছে কবে?

বিরাগের আশঙ্কায়
হৃদে শেল বিঁধে যায়,
তবু হায় স'য়ে তায়
কাঁদে সে নীরবে!

ওই আসে উষা সতী,
হাসে দিশা, বসুমতী,
সরোজিনী রসবতী
হাসে খেলে সমীরের সনে;—

হাসে তরু লতা রাজি,
প্রফুল্ল কুসুমে সাজি;
বুঝি এরা মোরে আজি
উপহাস করে সবে!—

পাঠক! বিরহিণীর দুরবস্থা পাঠের পর একবার দম্পতীর সম্মিলন সঙ্গীতটী আস্বাদন কর। যথা—

রাগিণী ললিত,—তাল আড়াঠেকা।

"মিলিল যুবতী সতী
প্রিয় প্রাণপতি সনে,
নয়ন হৃদয় লোভা
কি শোভা হইল বনে!

ফুটিল অম্বরতলে
তারা হীরা দলে দলে,
রাজিল চন্দ্রিমা ছটা
প্রকৃতির চন্দ্রাননে।

বনদেবী হাসি হাসি,
আদরে সমুখে আসি,
সাজালেন বরক'নে
চারু ফুল আভরণে।

লতারাজি বন বালা,
ফুলের বরণ ডালা
শিরে ধরি ফিরি ফিরি,
হেসে হেসে বরে বরক'নে ;—

আনন্দে আপনা হারা,
নয়নে আনন্দ ধারা,
দুজনের মুখ পানে
চেয়ে আছে দুইজনে।

উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
আকুল ভ্রমর কুল,
নির্ঝরিণী কুল কুল
করিয়ে বেড়ায় ;—

কুসুম-পরাগ-চোর
সমীর আমোদে ভোর,
বিবাহ মঙ্গল গীতি
গাহগো কোকিলগণে !”

যেন সমুদায় স্বভাব পূর্ব্বে দম্পতীর বিয়োগে ভিন্ন প্রকৃতি ছিল। অধুনা মিলনে যেন তাহারা স্বয়মুদ্বোধিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাই যথার্থ স্বর্গীয় আনন্দ। এ সন্তোষের মূল্য নাই, ইহা স্বভাবের একান্ত অনুগত ; সুতরাং জীবগণের মনস্তোষকর। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ আনন্দেই সুখানুভবশক্তি আশাধিক প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কবি ‘প্রিয়তমার’ প্রিয়দর্শন চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং কবি প্রিয়তমার মুখদ্বারা যে কয়েকটী কথা প্রথমে বহির্গত করিয়াছেন, তাহা অমৃত হইতেও অধিকতর স্বাদু। যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাক্যগুলি বাহির হইতেছে। অবিনাশের চাপল্যপূর্ণ হাবভাব পাঠকমাত্রকেই আপ্যায়িত করিবেক। যথা—

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
ননীর পুতুল, দুদের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে !

কিবে হাসি হাসি কচি মুখখানি,
কচি দাঁতগুলি অধর মাজে ;
যেন কচি কচি কেশর কখানি
ফুটন্ত ফুলের মাজেতে সাজে।

বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী,
অমৃত বরষে শ্রবণে মোর ;
আপনা আপনি হরিষ পরাণী
হরষ-নাচনি হেরিলে তোর।

হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে
ধেয়ে এসে তুমি পড়িলে গায় ;
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়া,
পুলকে শরীর পূরিয়ে যায়।

মুখে ঘন ঘন "বাবা বাবা" বুলি,
গলা ধর এসে হাজার বার;
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি,
কথা কয়ে যাহা বলিতে নার।

ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছা রে,
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন!
আমি ভাল বাসি যেমন তোমারে,
তুমিও আমারে বাস তেমন?

বুঝিলেম তবে এতদিন পরে,
কেন আমি ভালবাসি পিতায়:
সকলি ত্যেজিতে পারি তাঁর তরে,
তোমা ছাড়া যাহা আছে ধরায়।

* * *

প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে
এই যে আমার আসেন উমা!
নয়ন সজল স্নেহ মাধুরীতে,
হৃদে অবিনাশ অরুণ ভুমা।

সদানন্দময়ী, আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী,
মানস সরস বিকচ নলিনী,
আলয় কমলা করুণাবতী।

প্রিয়ে তুমি মম অমূল্য রতন।
যুগ যুগান্তের তপের ফল;
তব প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

* * *

অবশ্য বলিব নারীর মতন
সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা,
নাই সেই স্থানে, নহে সে এমন;
শচী পারিজাত কপোল কথা।

এ মর্ত্ত্য ভুবন কমল কাননে
নারী সরস্বতী বিরাজ করে!
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে!

এস উষারাণী, এস সরস্বতী,
এস লক্ষ্মী, এস জগত ছটা,
এস সুধাকর-বিমল-মালতী,
আহা কি উদার রূপের ঘটা!

আননে লোচনে স্বরগ প্রকাশ,
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুম ভূমি;
জুড়াতে আমার জীবন উদাস,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি।

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখি আমোদিনী আমোদ সেবি
শান্ত অন্তেবাসী ললিত কলায়,
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী।

* * *

যতনে যতনে আদরে আদরে
এঁকেছি সে হৃদি-প্রতিমা খানি,
মরি কি সুহাস ভাসিল অধরে!
পাত প্রিয়তমে কোমল পাণি।

ধর উষারাণী, হের সুনয়নে,
আরক্ত তরুণ অরুণমুখী,
যদি তব ছবি ধরে তব মনে,
করিলে তা হ'লে পরম সুখী।

আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে,
দোল রে দুলাল দে দোল দোলা
আহা দেখ প্রিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে,
উদয় অচলে কে করে খেলা!"

পাঠক! আমরা সদ্ভাবের একান্ত দাস। নতুবা কাব্য পাঠ ও আলোচনা করাই বৃথা। যদি কাব্য পাঠে সময় যাপন কর্ত্তব্য ও সুখদ হয়, এবং জগতে উহাই যদি একটী স্বাভাবিক সন্তোষের উৎস স্বরূপে গণ্য হয়, তবেই কাব্য পাঠ কর। এরূপ সুখের প্রবাহ যে দেশে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই দেশই অবনীর অগ্রগণ্য ধাম। যদি না হইবে, তাহা হইলে মহাকবি সেক্স-পিয়ার ও কালিদাস কেন সাহিত্য সমাজের শীর্ষ স্থানীয়? তাঁহাদিগের কাব্যকে প্রকৃতির অনুকৃতি ও মানব চরিত্রের আদর্শ বলিলেই হয়। পর্য্যবেক্ষণ কর, সকলই স্পষ্টনেত্রে দেখিতে পাইবেন। যেন স্বভাব উক্ত কবিদ্বয় কৃত কাব্য-দর্পণে আনন্দে মুখ দেখিতেছেন। যদি অমরত্ব সত্য হয়, তবে কবি নিশ্চয়ই অমর।

কবি সর্ব্বশেষে অভাগিনীর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। অভাগিনী প্রকৃত পক্ষেই অভাগিনী। ইহাঁর দুঃখরাশি অপরিমেয়; তাহার সীমা নির্ণয় সুকবির প্রতিভা-শালিনী লেখনীও করিতে অসমর্থা। বঙ্গ-কামিনীদিগের মধ্যে এই রূপ অভাগিনীর সংখ্যাই অধিক, সুপুরুষ বল্লাল স্বীয় কীর্ত্তির জন্য এই রূপ নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেই হয়। আমরা বল্লালের প্রেতাত্মাকে আর অধিক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি নাই। বোধ হয়, স্বকার্য্যের ফলভোগ স্বয়ংই করিতেছেন। অভাগিনী হইতে কয়েকটী কবিতা তুলিয়া দিলাম। স্বামীর পত্র পাইয়া অভাগিনী যে রূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ দেখুন। যথা—

"ওরে পত্র, আমি তোর আগমনে
কত নিধি যেন পাইনু করে,
হরষে হাসিনু, লইনু যতনে,
থুইনু আদরে হৃদয় পরে।

স্মরেছেন আজি পতি গুণধাম,
অধিনীরে বুঝি পড়েছে মনে;
স্বপনে জানিনে হইবেন বাম,
জানকীরে রাম দিবেন বনে।

আহা সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী,
ধন্য ত্রিজগতী তোমার নামে;
নিরমি তোমার সোনার মূরতি,
বসালেন পতি আপন বামে।

উষসীর কোলে কুসুম কলিকা
প্রফুল্ল হইয়ে বাতাসে দোলে,
যবে শিশুমতি ছিলেম বালিকা,
দুলিতেম বসি মায়ের কোলে।

* * *

আ রে রে নিয়তি দুরন্ত ঝটিকা,
বহিয়ে চলেছ আপন মনে ;
দলি দলি সব কোমল কলিকা,
মানবের আশা কুসুম বনে।

* * *

রবি শশী তারা, জগতের বাতি,
সেখানে সকলে নিবিয়ে যাক,
গাঢ় তমোরাশি আসি দিবা রাতি,
একেবারে মোরে গ্রাসিয়ে থাক।

হুহু হুহু কোরে প্রলয় বাতাস
সদাই আমার বাজুক কাণে,
ভোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস
লইয়ে চলুক পাতাল পানে।

ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক মন থেকে সব,
ভাবনা, বাসনা, প্রণয়, স্নেহ ;
জীবনের বীণা, হউক নীরব,
মাটিতে মিসুক মাটির দেহ।

* * *

থাক বুকে থাক, বাপিরে আমার,
তাপিত হৃদয় জুড়ান ধন, !
তোমারি লাগিয়ে গলেছে এবার,
তোমার পিতার কঠিন মন।

* * *

বাঁচি যদি দেখা হবে পুনরায়,
নহিলে এ দেখা জনম শোধ ;
কেন হে নয়ন জলে ভেসে যায়,
আঁচল ধরিয়ে করিছ রোধ !

* * *

তুই রে আমায় করিলি পাগল !
যা যা চিঠি দূরে ছুটিয়ে পালা !
না, না, তুমি মম জীবন সম্বল,
নাথের গাঁথন রতন মালা।

আহা এস, আজি অবধি তোমায়
থুইব হৃদয় রাজীব রাজে !
পতি নামাঙ্কিত মাণিক মালায়,
সতী সীমন্তিনী সরেস সাজে !

মাণিক রতন নিরেট জহর !
জীবন সংশয় সেবিলে তাকে ;
আমার মতন যে রোগী কাতর,
জহরে তাহাকে বাঁচায়ে রাখে।

* * *

কে রে আমাদের সুখের কাননে
এ ঘোর আগুন জ্বালিয়ে দিল !
হা বিধি তোমার এই ছিল মনে !
এই কি আমার কপালে ছিল !

উপসংহার কালে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। যদিও এই কাব্য মধ্যে দুই এক স্থানে কিছু দোষ আছে বটে, কিন্তু তাহা সামান্য। দোষৈকদর্শী না হইলে সে দোষকে দোষ বলা যায় না। কোন কোন

স্থানে গ্রাম্য ভাষার ব্যবহারও আছে। উহা গ্রাম্যতা দোষের অপকর্ষক না হইয়া বরং উৎকর্ষক হইয়াছে। প্রযুক্ত গ্রাম্য শব্দ গুলি প্রযোক্তব্য স্থলে কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অপর এই কাব্যের আদ্যন্ত ভাষার বৈশদ্য একান্ত প্রীতিকর। শব্দ-কাঠিন্য, শ্লিষ্টতা, অপ্রযুক্ততা, অস্বাভাবিক বর্ণনা কাব্যকে আদৌ স্পর্শ করে নাই। এই জন্যই ইহা আরও উৎকৃষ্ট। রাশীকৃত সদ্ভাবের সহিত ললিত ভাষার সংযোগ বিধান হইলে মণি কাঞ্চন যোগের ন্যায় সুখদর্শন হইয়া উঠে। বঙ্গ ভাষা এই রূপ কাব্য যত পরিমাণে প্রসব করিবে, ততই বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি এবং আনুষঙ্গিক জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধীয় উন্নতিও অনি-বার্য্য হইয়া উঠিবে। বিহারী বাবুর কীর্ত্তি বঙ্গ দেশের গৌরব বলিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

সুলেখক ও সদ্বক্তা।

লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, যে, যাঁহারা ভাল লিখিতে পারেন, তাঁহারা সদ্বক্তা নহেন। একথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক নয়, আমাদিগের সমাজমণ্ডলীতে প্রায়ই এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। লিখিবার ও বলিবার দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা, সুতরাং একেবারে দুইটী ক্ষমতাকেই উন্নত করা যে সুদূরপরাহত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, কোন সুলেখকই ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন না, বা সদ্বক্তা কখনই ভাল লিখিতে পারেন না, তবে এ পর্য্যন্ত স্থির যে ইহাঁদের সংখ্যা এরূপ বিরল, যে, সুলেখক সদ্বক্তা নহেন, এ কথা সহজেই স্বীকার করিতে পারি। আমরা ইতিহাসে শত শত উদাহরণ প্রাপ্ত হই, যে, কত ব্যক্তি—যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখক হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কখন সদ্বক্তা উপাধি লইয়া যাইতে পারেন নাই; অন্য দিকে আবার কোন সদ্বক্তা আজি পর্য্যন্ত সুলেখক বলিয়া অভিহিত হইতে পারিলেন না।

লেখা এবং বলা, ইহাদিগের মধ্যে একটী প্রধান ভেদ এই, যে, প্রথমটীতে যত সময়ের আবশ্যক, অপরটীতে তত নহে। প্রথমটীতে যে ক্ষমতার পরিচালনা আব-শ্যক, দ্বিতীয়টীতে সে ক্ষমতার পরিচালনা প্রয়োজন নাই। যিনি অল্প সময় মধ্যে রাশি রাশি কথা, রাশি রাশি চিন্তা, রাশি রাশি বিষয় একত্র সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই আমরা সদ্বক্তা বলি। যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী বাক্যের পর আর একটী বাক্য সংযোজনা করিতে পারেন, তিনিই সদ্বক্তা। অন্য দিকে আবার যিনি জীবন-কাল মধ্যে বহুসংখ্যক বহুমূল্য ও প্রয়ো-জনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহা-কেই আমরা সুলেখক বলি। সদ্বক্তাকে

দ্রুতপদে পদ অতিক্রম করিতে হয়, সুলেখক ধীরে ধীরে সকল বিপদ্ ও ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া আপনার পদদ্বয়কে চালনা করেন। সদ্বক্তা বজ্র বা প্রবল বায়ুবৎ সম্মুখে যাহাই পায়, তাহাই ধ্বংস করিয়া যায়, বৃক্ষ নাই, তৃণ নাই এক আঘাতেই সকল ভস্মসাৎ হইয়া যায়, কিন্তু সুলেখক তাহা করেন না, তাঁহাকে মৃদু মৃদু গতিতে সহস্র কুঠারাঘাতে একটী তরুচ্ছেদ করিতে হয়, কি হইলে মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, কি হইলে কাননের শোভা বৃদ্ধি হয়, ইহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার কর্ম্ম করা আবশ্যক। বক্তৃতায় আমরা অধিক আশা করি না, কিন্তু লেখনী হইতে অধিকতর প্রার্থনা করিয়া থাকি। সদ্বক্তা ক্ষণকাল মধ্যে আমাদিগকে উত্তেজিত করেন, চারিদিক্ শূন্য দেখি, কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করে না, হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠে, আমরা অন্ধ হইয়া উচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গ ধরিতে লাফাইয়া উঠি। কিন্তু সুলেখক সেরূপ নহেন, তিনি একটী শৃঙ্গ হইতে আর একটী শৃঙ্গে, একটা গুহা হইতে আর একটী গুহায় লইয়া যান, ধীরে ধীরে মৃদুগতিতে পর্ব্বতের চূড়া আমরা স্পর্শ করি। সদ্বক্তৃতায় উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আমাদিগের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু সুলেখকের লেখায় আমরা একটী একটী করিয়া যে চূড়ায় আরোহণ করি, তাহা হইতে কখন পদ স্খলিত হয় না, কখন পড়িয়া যাইবার ভয় হয় না। দৃঢ়পদে স্থিরমনে আমরা অগ্রসর হই, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে আমরা সুলেখারই অধিক পক্ষপাতী।

জগতে এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সহসা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হইলে কত কথা বলিতে পারিবেন, কিন্তু সে উত্তেজনা-বহ্নি নিবিয়া যাইলে আজন্ম চিন্তা করিয়াও কিছুই বলিতে পারেন না। অন্য দিকে আবার এরূপ লোক অপ্রাপ্য নহে, যাঁহারা সহসা কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিবেন না, কিন্তু ভাবিলে কত কথা বলিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীকে আমরা সদ্বক্তা বলিয়া থাকি, দ্বিতীয় শ্রেণীকে আমরা সুলেখক বলি। প্রথমশ্রেণী কামানের বারুদবৎ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিলেই ভীষণ রবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু সুলেখকেরা সেরূপ নহেন, তাঁহারা স্বর্ণাদি ধাতুবৎ, অগ্নি নিবিয়া না যাইলে তাহাদের বিশুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় না। সদ্বক্তারা যাহা বলিবার সহসাই বলিবেন, চিন্তা করিয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হয়েন না, সুতরাং তাঁহারা চিন্তাশক্তি-বিহীন—এতৎসম্বন্ধেও আমরা সুলেখকের পক্ষপাতী।

সদ্বক্তারা চলিত বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, করিলেও সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা শত বার শুনিয়া থাকি, সহস্র বার বলিয়া থাকি, সুবক্তা তাহাই বলেন। বাল্যকাল হইতে যে ভাব যে বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়া আসিতেছি, ভালই হউক বা মন্দই হউক

যে বিশ্বাস এতদিন পালন করিলাম, সদ্বক্তা তাহারই সমর্থনার্থ কত কথা বলিবেন, তাহার বিপক্ষে কোন আপত্তি উঠিবে না। সুলেখক তাহা করেন না, তিনি চিরন্তন অলীক বিশ্বাস-তরুকে ছেদন করিতে অগ্রসর হন; বিজ্ঞান-অসি সহায়-মাত্র। সে ছেদন একেবারে নহে, সহসা তরুমূলে ভীষণ আঘাত নয়, একটী একটী শাখা করিয়া অবশেষ বৃক্ষটীকে ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবসিত করেন।

পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, আমরা সকল বিষয়ের সুলেখকের পক্ষপাতী।

এতৎসম্বন্ধে একটী মাত্র আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, সদ্বক্তা আমাদিগকে সহসা উত্তেজিত করেন —সে উত্তেজনা অগ্নির ন্যায়—সুতরাং তাহাতে যে ফল ফলে, সুলেখার গুণে তাহা হইতে পারে না। বক্তৃতা আমাদিগের মনে যে বিশ্বাসটী জন্মাইয়া দেয়, সেটী যে সত্য বলিয়া জ্ঞান হয় কেবল তাহা নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বাসনা জন্মে। সুলেখায় যে বিশ্বাস উৎপাদিত হয়, তাহা বিশ্বাসেই পরিণত হয়, কার্য্যে তাহা দেখাইতে আর ইচ্ছা হয় না। তাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু কোন উপকারে আইসে না। ফল কথা, বক্তৃতার গুণে আমরা সকল বিশ্বাসকেই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সুলেখার গুণে তাহা করিতে প্রস্তুত হই না। এ কথাটী আমাদিগের মতে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সদ্বক্তৃতার গুণে সকল বিশ্বাসই কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সে ইচ্ছা ক্ষণিক বায়ুসঞ্চালিত মেঘের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে আর নাই। কার্য্যে পরিণত করিতে যে সময় আবশ্যক, সে সময়ে বক্তৃতার উত্তেজনা-বহ্নি নিবিয়া যায় এবং আমরা কিছুই উপকার লাভ করি না।

সদ্বক্তা হইতে হইলে অঙ্গচালনাদি আরও অনেকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। ইহাদিগেরই অভাবে সুপ্রসিদ্ধ বর্ক সদ্বক্তা হইয়াও শ্রোতাদিগকে অধিক পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারেন নাই। আমরা এ প্রস্তাব আর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। সার কথা, আমাদিগের মতে সুলেখকেরা অধিকতর প্রশংসনীয়। তাঁহারা

"Dull as the lake that slumbers
in the storm."

কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি।

১

এই যে খানিক আগে শ্রবণ বিবরে সখে,
মধুর মুরলী. বীণা, সেতার নিক্কণ
স্বর্গীয় সুধার পারা
ঢালিয়া মধুর ধারা,
তিরপিতেছিল চির পিপাসিত মন।
ক্ষণ পরে অকস্মাৎ কেন্ তে এমন ?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে সখে,
এ হ'তে সুধার আস্বাদন
কি পুন শ্রবণে মোর
পশিয়া করিল ভোর
হৃদয়, মানস, জিনি সঙ্গীত স্বপন ?
সঙ্গীতো গানিল হা'র !—অপূর্ব্ব ঘটন !

৩

বুঝেছি—কেন যে মোর মানস মাতিল,সখে,
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ;—
তব নব পরিণয়
(অতুল অমৃত ময় !)
বিরসি সঙ্গীত-রসে. নব আস্বাদনে
মাতাইল চিত মোর, কব তা কেমনে ?

৪

নূতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, সখে,
কি যে সুখী, কহিব কেমনে ?
সে সুখ বিশেষি কই
এক্ষণ ক্ষমতা কই ?
রসনা অবশ আজি বচন রচনে ;
জিহ্বাও সুখের ভারে সুখী মোর সনে।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার বাহিরে, সখে,
যথা বন ধারে তরুবর
একাকী দাঁড়ায়ে রয়,
কেহ তার সঙ্গী নয় ;
বনজ পাদপ লতা সবাই অপর,
কেহ তার কেহ নয়, অন্তরে অন্তর !

৬

কিন্তু যবে ভাগ্য তায় ফিরিয়া দাঁড়ায়,সখে,
নিশাগতে প্রভাত মতন !
বন-লতা ধীরে ধীরে
অবলম্বি ধরণীরে,
জড়ায়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন,
সোনার লতিকা আজি তোমাতে তেমন !

৭

সাদরে যুগল ভুজ করিয়া প্রচার. সখে,
ধর ধর এ নব রতন ;
হৃদয় আসন পরি
সযতনে রাখ ধরি,
নতু অযতনে ভুমে করিবে লুণ্ঠন
প্রেমের প্রতিমা তব হেমের বরণ !

৮

এ দেশ—এ বঙ্গ দেশ অতিভয়ময়, সখে,
অভাগিনী হেথায় রমণী !
পুরুষ অবশ চিত,
সে হেতু সদাই ভীত
অবলা সরলা নারী দিবস রজনি ;
পাষাণ উরসে লতা নীরস যেমনি !

৯

সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে সুধাই,সখে,
এ দেশীয় পুরুষ মতন,—
ভুলেও ক্ষণেক তরে,
প্রেমের পুতলী পরে
হয়ো না হয়ো না, সখে, কঠিন কখন,
কঠিন উপলময় ভূধর যেমন !

১০

তা হ'লে তোমার ওই কমল-বদনী, সখে,
কোমলতাময় সুমূরতি
পাইবে কেলেশ ভারি,
হৃদি বিদারণকারী
বাজিবে যাতনা-শেল ; বসি দিবারাতি
কাঁদিবে নীরবে, যেন নিদাঘে ব্রততী !

১১

নূতন যৌবনে তুমি সুখে কালিপদ, সখে,
বাড়ায়েছ, আজি তেকারণ,
বিধাতা সদয় হয়ে,
প্রেমের আধার লয়ে
সযতনে তব করে করিল অর্পণ ;
স্বর্গীয় এ মহাদান ! কি আছে এমন ?—

১২

অযুত মুকুতা মনি কনক রজত, সখে,
এর সহ তুলনা কি হয় ?
বসন্ত কুসুম রাশি,
শরতের পূর্ণ শশী,
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;
যা কিছু সুন্দর ; কিন্তু এর সম নয় !

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি, সখে,
গড়েছেন জগত মাঝার ;
সেই বিধি নিরজনে
বসিয়া অনন্য মনে
মনের মতন করি—রচনার সার !—
গঠিলা রমণী-নিধি, রাখিতে সংসার।

১৪

বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে সময়ে, সখে,
এবে তুমি সুভাগ্য-অধীন !
ফুটিল সুখের ফুল,
দাম্পত্য-প্রণয় মূল
অক্ষয় হইয়া দৃঢ় হ'ক দিন দিন ;
নবীন প্রণয় হ'কু অবাধে প্রবীণ।

১৫

নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুঁত হৃদয়ে, সখে,
অবিরল সুরসিত হও !
প্রেমের পুতলী সনে
প্রেম-ভাষ-সম্ভাষণে,
বিশ্বজয়ী প্রেম-গুণ শত গুণে গাও !
প্রেমের অমর ভাব আঁকিয়া দেখাও।

১৬

শর্করা মিশালে যথা পয়সের সনে, সখে,
কিবে মধুরতা ধরে তায় !
পুরুষের সনে তথা
পরিণয়-সূত্রে গাঁথা
হইলে রমণী, তাহে উথলি বেড়ায়
প্রণয়-মাধুরী ! সুধা কে আর সুধায় ?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা দুই জনে, সখে,
সূত্রপাত হল উঠিবার ;
হৃদয় খুলিয়া দিয়ে,
নব প্রণয়িনী লয়ে,
নব প্রেম সুধা-হ্রদে দাও হে সাঁতার,
প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার।

১৮

আরো দুটো কথা বলি, অভিন্ন হৃদয়, সখে,
প্রেম-শিক্ষা শিখ হে যতনে ;—
প্রবেশিয়া উপবনে,
সহকার তরু সনে
আনন্দিত লতিকায় নেহার নয়নে,
দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে।

১৯

প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,
দে'খ তুমি চাহিয়া তখন
একবার দিনকরে,
আরবার সরোবরে
নব বিকসিত চারু নলিনী বদন,
দাম্পত্য প্রেমের তাহে আছে দরপণ।

২০

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়া সরতীরে, সখে,
ভাল ক'রে বারেক দেখিও ;—
শশী পেয়ে কুমুদিনী
কত দূর আমোদিনী !
দাম্পত্য-প্রণয় তার যতনে শিখিও ;
ভোল পাছে, তেকারণে হৃদয়ে লিখিও।

২১

এরূপে প্রণয়-শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী সখে,
সে কি প্রেম জানিবে বিশেষ ;
চিরকাল সুখে রবে,
প্রকৃত প্রণয়ী হবে,
দুখের সংসারে সুখী হইবে অশেষ ;
পঙ্কেও কমলা ফুল দেখায় সরেস।

২২

আরো দুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণের সখে
যে পুরুষ বিমুখ জায়ায়,
চিরজীবনের প্রিয়া,
তারে দূরে তেয়াগিয়া,—
(মণিরে ফণীর সম) লাম্পট্য আশায়
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ভ্রমে ; কখনো তাহার

২৩

দিও না এখন আর নিকটে আসিতে, সখে,
বিষ সম ভাব হে তাহায়,
তোমার নবীন প্রেম
কষিত অমল হেম,—
লম্পট পুরুষ তাহে কলসের প্রায় !
গোরসে গোচনা,—বিষ মিশিবে সুধায়।

২৪

ভাল কথা মনে হ'ল ; মনে যেন রয়, সখে,
'বিচ্ছেদ' অরাতি নিরদয়
প্রণয়ের পাছে পাছে
অলক্ষ্যে নিয়ত আছে,
ঘেঁসিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয়।
প্রণয়িনী ছাড়া হলে ঘটিবে সে ভয়।

২৫

যা কিছু বলিনু আমি, ভুল না ভুল না, সখে,
সখা তুমি, তাই হে তোমায়
বলিনু এ কটি কথা ;
নতুবা কি মাথা ব্যথা
পর জনে বলিবারে ? কি লাভ তাহায় ?
অপরে পরের কথা কে রাখে কোথায় ?

২৬

শেষ কথা এই বার বলি কায় মনে, সখে,
আজি তুমি যাঁহার কৃপায়
লভিলে অমূল্য নিধি ;
নিরবধি সেই বিধি
রাখুন নীরোগে সুখে তোমা দুজনায় ;
বিবাহের মুখ্যফল ফলুক ত্বরায় !

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

হিন্দু বিবাহ সমালোচন।
প্রথম কাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত, এবং কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত।

আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া একান্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম ; অন্তরাত্মা বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় আমরা সাশ্চর্য্য ভাব মনে না করি, কিন্তু কিয়দংশে গুরু-আনন্দ হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। এই পুস্তক খানি কেবল মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মত সমষ্টির জ্ঞাপক নহে ; শরীরতত্ত্বশাস্ত্রানুসারে ইহাতে গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার চিন্তাশক্তি সম্ভূত বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং বাল্যবিবাহ ও অসমবিবাহ বিষয়ে যেরূপ মীমাংসা তর্ক সহকারে গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা হৃদ্যতম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। আমরা সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, প্রত্যেক আর্য্যই ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করেন। তাহা হইলে গ্রন্থকর্ত্তার যথার্থ শ্রম সফল হয়, এবং উপযুক্ত উৎসাহও প্রদত্ত হয়। এরূপ গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বিবাহ বিষয়ে হিন্দু সমাজের উন্নতি অবনতির সমালোচন জানিতে যাঁহারা উৎসুক, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে সেই ঔৎসুক্য আশানুরূপ চরিতার্থ করিতে পারিবেন। ইহাতে অযৌক্তিক মতের আদৌ অবতারণা নাই। অফল কথা বা বাগাড়ম্বর প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার অন্তর্নিবিষ্ট যুক্তি একান্ত সাধীয়সী ও ফলোপধায়িনী। যে

মহাত্মা হিন্দু সমাজের বিবাহ বিধির সংশোধক ও নূতনমতপ্রবর্ত্তয়িতা, তিনি সাধারণ হইতে এই পুস্তক পাঠ করিয়া যে নিরতিশয় তৃপ্তি লাভ করিবেন, বলা বাহুল্য। তাঁহার প্রদর্শিত মত সকল সমাজের কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, এই গ্রন্থই তাহার অমোঘ প্রমাণস্বরূপ।

চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমালোচনা যতদূর উপকারিণী হয়, এমত অন্য কোন ব্যক্তির হস্তার্পণে না হইতে পারে। কারণ বিবাহের দ্বারা শরীর ও মনের কিরূপ গুরুতর সম্বন্ধ বদ্ধমূল হয়, তাহা শরীরবিদ্যাবিৎ চিকিৎসকেরাই অধিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহা হউক আমরা শীঘ্র ইহার ২য় খণ্ড দেখিতে উৎসুক থাকিলাম, এবং তজ্জন্যই এ খণ্ডের সম্যক্ সমালোচন করিলাম না।

বঙ্গভূষণ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত এবং কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গদেশে যে সমস্ত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ সদ্গুণে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সদ্গুণের সংক্ষেপ পরিচয় চতুর্দ্দশপদী কবিতায় রচিত হইয়া ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজকৃষ্ণ বাবু প্রতিজ্ঞা স্বরূপ মিল্টন (Milton.) নামা প্রসিদ্ধ ইংরাজী মহাকবির এই কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"———I will tell you now
What never yet was heard in tale or
song,
From old or modern bard, in hall
or bower."
"———it pursues
Things unattemped yet in * *
rhyme."

কার্য্যে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে সফলীকৃত হইয়াছে। এরূপ বিষয়ে প্রথম হস্তার্পণ কেবল তাঁহারই; তিনি কাহারও দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হয়েন নাই। কবিতাগুলির নিম্নে বর্ণিত মহাত্মাগণের সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত টীকা করিয়া দিয়া তিনি আরও গুণের ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। কবির বর্ণনাশক্তি ও কবিত্বের পরিচয় প্রদর্শন জন্য নিম্নে একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
পর্ব্বত-শেখর হ'তে বরষা সময়ে
গভীর গর্জ্জনে নদী ভাসাইয়া কূল
বহে যথা, সেইরূপ বেগবান্ হয়ে
লেখনী-প্রবাহ তব বহিল তুমুল,
ঘোর রবে বিজাতীয় অত্যাচার তীর
আক্রমণ করি; যথা কাটি শত্রু-শির
অসিপত্র ঝক্‌মকে! বাঙ্গলা মাঝারে
শুভক্ষণে জন্মেছিলে, নরোচিত কাজ

করিয়া ভিজিলে তুমি প্রশংসা-সুধারে।
আনন্দিত তব গুণে বঙ্গীয় সমাজ।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ ভেবেছিল চিতে,—
তোমা হ'তে হবে আরো মঙ্গল সাধন,
কিন্তু নিরদয় কাল (ভীম দরশন !)
হরিল তোমারে আশা পূর্ণ না হইতে।"

সমালোচিত পুস্তকে কেবল মাত্র যে মৃত মহাত্মাদের বিষয়ই কবিতাতে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কবি কাব্যের পরিশিষ্টে জীবিত বদান্য ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত মহাত্মাগণেরও নামোল্লেখ করিয়া পুস্তক খানির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকমাত্রেরই যে সমাদরের বস্তু, বলা বাহুল্য। অতএব সকলেই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া কবির উৎসাহ বর্দ্ধন এবং তদানুষঙ্গিক বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদান্যতা প্রদর্শন করেন, একান্ত প্রার্থয়িতব্য।

পুস্তকখানি মহামান্যা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। উপযুক্ত বস্তু যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইলে আনন্দের সীমা থাকে না।

কবিতা-কৌমুদী।

১ম ও ২য় ভাগ।

এই পুস্তকদ্বয়ের রচয়িতাও রাজকৃষ্ণ বাবু। রাজকৃষ্ণ বাবু যে নবীন বয়সে এক জন সুকবি হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী পাঠকদিগকে বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার রচিত কতিপয় কাব্যগ্রন্থ এবং বিবিধ সাময়িক পত্রে তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী-বিনিঃসৃতা উৎকৃষ্ট রচনাবলী পাঠে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। তথাচ প্রস্তাবিত দুইখানি পুস্তকের সমালোচন স্থলে বলিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ের বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই পুস্তকদ্বয় সংরচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বঙ্গভাষা-শিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট কাব্য পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব জন্য বিদ্যালয় মাত্রে তৎশিক্ষার সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রদর্শিত হইত। কিছুদিন হইল ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠের সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা সাধারণের উপলব্ধি হইলে তদুপযুক্ত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে কতিপয় মহাত্মা আয়াস স্বীকার করিয়া কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের পাঠের সম্যক্ উপযোগী কাব্যগ্রন্থের যে এখনও অভাব রহিয়াছে, ইহা সঠিক সিদ্ধান্ত। যাহা হউক প্রস্তাবিত পুস্তক দুইখানি যে তদুপযোগী হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইব না। আমরা পুস্তকের নানা স্থান হইতে কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক মহাশয়গণ পাঠান্তে আপনারাই তাঁহার গুণের বিচার করিয়া লইতে পারিবেন।

এক স্থলে দেখুন, ছোট ছোট বালক-

দিগকে কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কেমন সুনীতির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ;—

" তপন উদয় আগে, মানসিক অনুরাগে
বিভু স্মরি শয্যা তেয়াগিবে ;
ওহে শিশু, তার পর! যোড় করি ত্বই কর,
ঈশপাশে কুশল মাগিবে।
মুখ হাত ধুয়ে পরে, বসিয়ে পাঠের ঘরে,
নব পাঠ করিবে অভ্যাস ;
অভ্যাস করিবে হেন, কখন ভুলনা যেন,
মনে ক'রে রেখ বার মাস।
নবপাঠ করি শেষ, মন দিয়ে সবিশেষ,
পুরাতন পড়া দেখো পরে ;
এক দিবসেরো তরে, কখন আলস্য করে,
পুস্তক রেখো না ফেলে ঘরে।
স্নানাহার করি শেষ, পরি পরিষ্কৃত বেশ,
বিদ্যালয়ে করিবে গমন ;
মন্দ বালকের মত, পথে পথে অবিরত,
করিও না কখন ভ্রমণ।
প্রতিদিন সুসময়ে, উপনীত বিদ্যালয়ে,
হয়ো, শিশু, দেরি না করিবে ;
তথা শিক্ষকের পাশে, পরিষ্কার মিষ্ট ভাষে,
নবপাঠ ক্রমে শুনাইবে।—"

অন্যত্র,—

জেন মনে এ জগতে মানব নিচয়,
সঙ্গদোষে সঙ্গগুণে দোষী গুণী হয়।
সতের সঙ্গেতে চিত হয় সুবিমল,
মেঘে সুমধুর যথা সাগরের জল।
অসৎ সহিত যেই সততই রয়,
কলুষিত হয় তার বিমল হৃদয়,
অম্ল পরশনে যথা মধুর পয়স
বিকৃত হইয়া হয় অতীব বিরস।"

* * *

" উর্ব্বর ভূমির মত শিশুদের মন,
সুবীজ উচিত তায় করাই রোপণ।
জ্ঞান, বিদ্যা নীতিশিক্ষা শিশুদের মনে
উচিত প্রদান করা অতীব যতনে ;
নতুবা হইবে মন কুপ্রবৃত্তিময়,
কখন উর্ব্বর ভূমি পতিত না রয়।"

অপিচ হস্তিবিষয়ক কবিতায়—

" এখন গিয়াছে তব সে সুখের স্থল ;
নাহি আর সরোবর, তরুবর-তল ;
নাহি বহে সমীরণ, নাহি রবে পাখিগণ,
সুরভি বিতরে নাহি বনফুল ফল ;
এখন যা করে শুধু লোহার শিকল !

প্রকাণ্ড হইয়ে তুমি এই ধরাতলে,
বশীভূত হলে, হায়, মানুষের বলে !
শুন শুন গজরাজ, ভেবনা বিষাদ লাজ,
ত্বঃসহ নিগড়জালে বাঁধা আছ ব'লে !
যে বেঁধেছে সেও বাঁধা পাপের শিকলে।"

উপর্য্যুক্ত কবিতাতে হস্তীর ত্বঃখজনক অধীনতার কেমন সুন্দর বর্ণনা হইয়াছে, এবং পরিশেষে অত্যাচারীর অবস্থা সাদৃশ্য বর্ণন দ্বারা তাহাকে প্রবোধ দানচ্ছলে মনুষ্যের পাপাসক্তির কেমন সুন্দর পরিচয় হইয়াছে। ইহাকেই চাতুর্য্য সংশ্লিষ্ট শ্লেষোক্তি বলিলে দোষস্পর্শে না। কবিতায় ইহাও বুঝাইতেছে যে, অন্যের উপর যিনি যতই কেন অত্যাচারী ও প্রভুত্ব

স্থাপনে ব্যগ্র হউন, তাঁহাকে সর্ব্বসুখবিনাশী পাপের দাসত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার সমুচিত শাস্তি; ইহাই তাঁহার পর-পীড়ন প্রবৃত্তির দারুণ ক্লেশকর নিরয় যন্ত্রণা। স্থানান্তরে—

"ওই দেখ, তেজোময় দীপ্ত দিবাকর
পরিধান করি দেহে লোহিত অম্বর,
পশ্চিম সাগরে স্নান করিবার তরে,
ক্রমশঃ নামিল তেজোহীন কলেবরে।
বাঁধিল পদ্মিনী সতী জুড়াল হৃদয়,
ভানুর পীড়ন এবে হইল বিলয়;
সুস্থির হইয়ে সুখে মুদিয়ে নয়ন,
শীতল সলিল পরে করিছে শয়ন।
পশ্চিম আকাশ এবে লোহিত বরণে
রঞ্জিত হইল, যেন লোহিত বসনে
সাজাইল নভস্তল প্রকৃতি সুন্দরী,
হরষে বসিবে বলি সন্ধ্যা সহচরী।
গগনের লাল রঙ্ মন্দাকিনী-নীরে,
এপার ওপার যুড়ে পড়িল অচিরে।
মনে অনুমান হয় হেরি সেই নীর,
গোপীরা গুলেছে যেন সলিলে আবির;
কিম্বা হেন বোধ হয় কৃষ্ণ বুঝি ফের
কালীয় এখানে আছে মনে পেয়ে টের।
ডুব দিয়ে নদী-গর্ভে চড়ি তার মাতে,
দমিছেন ভুজঙ্গেরে ভীম-পদাঘাতে;
পীড়নে বিচূর্ণ হয়ে কালীয়-শরীর,
সবিষ শোণিতে লাল করিয়াছে নীর।"—

এই কবিতা মধ্যে কবি স্বভাব বর্ণন উদ্দেশে কেমন সুরুচির ও ভাবের নবীনত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দিবাকর দেহে লোহিত অম্বর পরিধান করিয়া পশ্চিম সাগরে স্নানার্থ অবগাহন করিলেন। পদ্মিনী সতী তাঁহার খর কর পীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ বিবেচনা করিয়া শীতল হৃদয়ে, শীতল জলে নয়ন মুদিত করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন। ইহা একটী নবীন ভাব, সন্দেহ নাই। কবির গিলিত চর্ব্বণে যে বিশেষ ঘৃণা এবং নবীন ভাব প্রকটনে যে ক্ষমতা আছে, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়। উদ্ধৃত কবিতায় শেষ দশ পংক্তির ভাবও সম্পূর্ণ নবীনত্ব পরিচায়ক কি না, পাঠকগণই তাহার বিচার করুন।

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশও কবির স্বভাব বর্ণন শক্তির বিশেষ প্রমাণ দিতেছি।—

"অসিত পাষাণময় সোপান শোভিছে,
বেণী বিনাইয়ে যেন মেদিনী হাসিছে।
পথের দুপাশে শোভে বকুলের বন,
গায়ে গায়ে ঠৈকাঠেকি নয়ন-রঞ্জন!
স্বভাবের সেনাদল যেন দাঁড়াইয়ে
শাখারূপ শায়কাদি সবে বাড়াইয়ে।
সে সব গাছের ছায়া পড়েছে ভূতলে,
মাঝে মাঝে ভানু-ভাতি ঝিকিমিকি জ্বলে।
প্রতি কিসলয়-শিরে ফুটেছে বহুল
সুরভি-কণিকা-মাখা বকুলের ফুল;
নাসায় সে বাস পশি নাচায় পরাণ
আমরি, বকুল তোর কি অতুল ঘ্রাণ!
ধীরে ধীরে গন্ধবহ সেইখানে এসে,
চুপি চুপি গন্ধ হরে তস্করের বেশে;
দমকা মারিয়ে ফের চারিধারে ধায়,
শাখাবাসী পাখিগুলি উড়িয়ে চেঁচায়।

যেন একতানে তারা করে এই স্বর ;—
"পলায় পবন চোর ধর ধর ধর !"

তরুতলস্থিত সমাধি সন্দর্শনে কবি বৈরাগ্য-বিমুগ্ধ-চিত্তে যে কয়েকটী কবিতা প্রকটন করিয়াছেন, তাহা অতিশয় মধুর ও সদুপদেশব্যঞ্জক। যথা—

"শোভে ঐ তরুতলে অতি পুরাতন
সমাধি, উপরে তার শিলা আবরণ।
নশ্বর নরেরে তত্ত্ব শিখাবার তরে,
লিখিত এ কথাগুলি শিলার উপরে ;—
কি ধনী অতুল ধন, প্রাসাদ যাহার ;
কি দীন—দিনান্তে যার যোটেনা আহার ;
কি বিদ্বান্—যিনি বিদ্যা-আলোক-প্রবাহে
সবার সহিত কাল যাপেন সুভাবে ;
কি মূর্খ সতত যার থাকিতে নয়ন
দেখিতে না পায় বিশ্ব-মাধুরী কেমন ;
"কি বড় কি ছোট দেখি সকলি সমান,
করাল শমন যবে কাড়ি লয় প্রাণ।"

রসিকতাতেও কবির কম নিপুণতার পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। অপিচ সেই রসিকতা যে কুরুচি সম্ভূত নহে, ইহাও সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়।

প্রস্তাবিত কাব্য খানিকে নানাবিষয়ক সাধুভাবে পরিপূর্ণ করিতে কবি যত্নের ক্রুটী করেন নাই। কোন স্থলে স্বভাব বর্ণন, কোনও স্থলে সুরুচি সমুদ্ভবা রসিকতা, কোনও স্থলে বৈরাগ্য, ভক্তি, বীররসের কবিতা প্রণয়ন করিয়া 'নানাফুলে সাজি' পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বর ভক্তি সূচিত কবিতাটী আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ। পড়িয়া দেখুন, কেমন লিপি-চাতুর্য্য, ভাবভক্তি ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।—

ঈশ হে, তোমার সম, শিল্পকর অনুপম,
কে আছে জগতে আর ? দেখিনে কাহায়।
অদ্ভুত ক্ষমতা তব, কল্পনায় অনুভব,
নাহি হয়, কবির লেখনী হারি যায়।

এই যে কঠিন গিরি, অনায়াসে তারে চিরি,
ফটিক জিনিয়ে জল করিছ বাহির ;
তাই বলি তোমা ছাড়া, কার সাধ্য গিরি ফাড়া;
কে পারে শিলারে ভেদি ঝরাইতে নীর ?

নির্ঝরিণী অবিরল, ঝর ঝর ঢালে জল ;
অস্ফুট মধুর নাদ উপজিয়ে তায়,।
মোহিছে গিরির চিত, মম মনে ততোঽধিক
আনন্দ সলিল ঢালে, জানাইব কায় ?

তেজি জন-কোলাহলে, নিথর ভূধর তলে,
আমরি. কি সুখরাশি রেখেছে ঢালিয়ে !
কৃত্রিম শোভার গুণ, গাইতে যারা নিপুণ,
এখানে কি শোভা তারা দেখুক আসিয়ে।"

কবিতাকৌমুদী ১ম ও ২য় ভাগ যে কি রূপ প্রসংশার যোগ্য, তাহা সহৃদয় পাঠক-বৃন্দের হৃদয়ঙ্গম জন্য আমরা যে সামান্য সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বোধ করি এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারের প্রতি সম্যক্ অবিচার করা হইল। গ্রন্থ দ্বয় সমুদায় পাঠ না করিলে কদাচই রচয়িতার গুণের বিশেষ পরিচয় হইতে পারে না। ভরসা করি,

তজ্জন্য কবি এবং পাঠকবর্গের নিকট অবশ্যই মার্জ্জনীয় হইতে পারিব। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ বিশেষে কেবল মাত্র প্রশংসায় গ্রন্থকারের চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি, বা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। যদি উপযুক্ত গ্রন্থকারের প্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সাদরে সমাজ পরিগ্রহণ করেন, তবেই উভয়ই সংসাধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য-পুস্তক নির্দ্ধারিকা সভা এইরূপ উপযুক্ত পুস্তক সমূহের প্রতি কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকারবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং বিদ্যালয়ের পাঠার্থিবৃন্দের জ্ঞানলাভের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন। সময়োচিত পুস্তকদ্বয় বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের পাঠের যে বিশেষ উপযোগী, তাহা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

স্বপ্ন প্রয়াণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

এ খানি এক খানি কাব্যগ্রন্থ। ইহা সাতসর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথমসর্গ বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে সেই সর্গ বিশেষ সংশোধিত হইয়াছে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। কবির রচনা ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় সাধারণ্যে সুবিদিত। সংক্ষেপে ইহাতে কবিত্বের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কবিতা কুসুম।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত।

এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে অধিকাংশ লোকেই কবি হইবার বাসনায় গ্রন্থ প্রচারে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারা "First deserve and then desire" এই বহু মূল্য উপদেশ বাক্যটীর প্রতি মনোযোগ না দিয়া প্রায়ই অকৃত মনোরথ হইয়া থাকেন। রাসমোহন বাবুও যে সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা করি, ভবিষ্যতে কোন গ্রন্থ প্রচারে ইচ্ছা থাকিলে তিনি যেন উল্লিখিত উপদেশ বাক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।